সাইমুম-২৬

ক্যারিবিয়ানের দ্বীপদেশে

আবুল আসাদ

ইবুক সম্পর্কে কিছু কথা

সম্মানিত পাঠক,

আসসালামু আলাইকুম

সাইমুম সিরিজকে অনলাইনে টেক্সট আকারে আনার লক্ষ্য নিয়ে ২০১২ সালের ১৭ই আগস্ট গঠন করা হয় সাইমুম সিরিজ-ইউনিকোড প্রোজেক্ট (SSUP) গ্রুপ। তারপর বিভিন্ন ব্লগে ও ফেসবুকে প্রোজেক্টের জন্য স্বেচ্ছাসেবক আহ্বান করা হয়। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন একঝাক স্বেচ্ছাসেবক এবং এই স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে গঠিত হয় সাইমুম সিরিজ-ইউনিকোড প্রোজেক্ট টীম। টীম মেম্বারদের কঠোর পরিশ্রমে প্রায় ৮ মাসে সবগুলো সাইমুম অনলাইনে আসে। মহান আল্লাহ সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

ওয়েবসাইটঃ www.saimumseries.blogspot.com

ফেসবুক পেজঃ www.facebook.com/SaimumSeriesPDF

ফেসবুক গ্রুপঃ www.facebook.com/groups/saimumseries

১

আহমদ মুসা ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি সাগরে যাবার সময় ঘাটে যাদের দেখেছিলে, ফিরে এসেও আবার তাদেরই দেখলে?’

‘জ্বি হ্যাঁ।’ বলল আলী ওরমা।

আলী ওরমা ওকারী গ্রামের জেলে।

আহমদ মুসা তাকে নিয়োগ করেছিল দক্ষিণের মৎস্য ঘাটের উপর নজর রাখার জন্যে।

‘তুমি কটায় নৌকা নিয়ে সাগরে নেমেছিলে?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘তিনটায়।’

‘তখন ঐ দু’জনকে কি অবস্থায় দেখেছিলে?’

‘ওরা জেটিতে একটা নৌকায় বসে শশা চিবুচ্ছিল।’

‘নৌকাটা কার?’

‘আমার।’

‘তোমার নৌকায় ওরা বসেছিল?’

‘জ্বি হ্যাঁ।’

'তারপর?'

'আমি যখন নৌকার কাছে গেলাম। ওরা যখন বুঝল নৌকা আমার, তখন ওরা নেমে এল। বলল, সাগরে নামবেন বুঝি? ঠিক আছে। আমরা এখানে বসে একটা বোটের অপেক্ষা করছিলাম। আপনাদের বাড়ি কোথায়? আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। কেন, নরফোকে। বলে ওদের একজন।'

নরফোক টার্কো দ্বীপের মধ্যাঞ্চলের একটি গ্রাম। উত্তর প্রান্তের টার্কো বন্দর থেকে যে সড়কটি দক্ষিণে চলে এসেছে, গ্রামটি তার পাশেই।

গ্রামটি চেনে আলী ওরমা। গ্রামের সবাই কৃষ্ণাংগ। গ্রামের অধিকাংশ লোক আফ্রিকী ধরনের স্থানীয় ধর্মের অনুসারী। অবশিষ্টদের কিছু খৃষ্টান, কিছু মুসলমান। গ্রামে শ্বেতাংগ খৃষ্টান মিশনারীরা একটি গীর্জা ও একটি ক্লিনিক তৈরি করছে।

'ঘাটে আসা লোক দু'টি কৃষ্ণাংগ। কার বোট? কে আসবে? আমি ওদের জিজ্ঞেস করি। মাছ আসবে। আমাদের একটা আয়োজন আছে। জবাব দেয় ওদের একজন।'

'তারপর?' জিজ্ঞেস করল আলী ওরমাকে আহমদ মুসা।

'আমি নৌকা নিয়ে চলে যাই সাগরে। একটু আড়ালে গিয়ে আমি নজর রাখি কোন নৌকা বা বোট ঘাটের দিকে যায় কিনা। কিন্তু সন্ধ্যার আগে আমি ফেরা পর্যন্ত কোন বোট ঘাটের দিকে আসেনি।' থামল আলী।

'বলে যাও।' বলল আহমদ মুসা।

'আমি ঘাটে ফিরে দেখলাম লোক দু'টি নেই। ভাবলাম অপেক্ষা করে চলে গেছে। ঘাটের আশপাশ ভালো করে দেখে নিয়ে চিন্তা করলাম নিকটের কোন গ্রামে মাগরিবের নামায আদায় করে আবার চলে আসব। এই উদ্দেশ্যে ঘাট থেকে উঠে অল্প কিছু দূর আসতেই দেখলাম, নরফোক গ্রামের ঐ দু'জন ঘাটের দিকে আসছে। অবাক হলাম তারা আমাকে দেখে যেন চমকে উঠল। কিছুটা বিব্রত কণ্ঠে কৈফিয়তের সুরে বলল, এদিকটা একটু ঘুরে এলাম। দেখি বোটটা এসেছে কিনা। আমি কিছু বললাম না। ওরা চলে গেল। তবে আমি একটা গাছের আড়ালে এসে একটু দাঁড়ালাম। দেখলাম, আড়াল হবার পর ওরা আর এগুলো না। রাস্তার

পাশেই একটু উঁচু টিলা ছিল। তারা ওখানে উঠে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হলো। আমি আর অপেক্ষা না করে চলে এসেছি।'

আলী থামলেও আহমদ মুসা কোন কথা বলল না।

ভাবছিল আহমদ মুসা।

বলল একটু পর, 'এ ধরনের ঘটনা আর তো ঘটেনি?'

'জ্বি তাই।' বলল আলী।

'মাছের নৌকার জন্যে এত দূর আসবে, এইভাবে অপেক্ষা করবে এটাও বাস্তব নয়।'

'জ্বি।'

'ওদের আচরণ ও কথার মধ্যে সঙ্গতি নেই।' আহমদ মুসা বলল।

'আমারও তাই মনে হয়েছে স্যার।'

আবার ভাবনায় ডুবে গেল আহমদ মুসা।

অল্প পরে মুখ তুলে জর্জের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চল, আমরা ক'জন সেখানে যাই। লোক দু'জন যদি এখনও থাকে, তাহলে ওদের ধরলেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

মিটিং মুলতুবি করে উঠল সবাই।

জর্জ, ইসহাক আব্দুল্লাহ ও আবু বকরকে নিয়ে আহমদ মুসা এগুলো ঘাটের দিকে। পায়ে হেঁটে। সাথে থাকল আলী।

কিন্তু সেই উঁচু টিলায়, যেখানে আলী নরফোকের দু'জন লোককে দেখে গিয়েছিল, কাউকে পাওয়া গেল না।

অন্ধকারে চুপি চুপি তারা ঘাট পর্যন্ত গেল, এদিক ওদিক খুঁজল। কিন্তু কাউকে পেল না। ফিরল তারা।

সেই টিলা পার হয়ে কিছুটা পথ এসে আহমদ মুসা থমকে দাঁড়াল। সবাউ দাঁড়াল আহমদ মুসাকে ঘিরে।

আহমদ মুসা কাছে টেনে নিল আলীকে। ফিসফিস করে তাকে বলল, 'তোমাকে এখানে থেকে যেতে হবে। তুমি এখানে যে কোন স্থানে আত্মগোপন করে থেকে চারদিকে নজর রাখবে। সেই দু'জন কিংবা অন্য কাউকে পাও কিনা,

সেটা খোঁজ করতে হবে। রাস্তা নয়, রাস্তার বাইরে দুর থেকে সব দিকে নজর রাখবে।'

বলে পকেট থেকে একটা গগলস বের করে আলীর হাতে দিল। বলল, 'এটা বিশেষ ধরনের গগলস। এ দিয়ে অন্ধকারেও বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। সত্যিই তুমি যদি কাউকে দেখতে পাও, তাহলে তার পিছে পিছে থাকবে, চোখের বাইরে যেতে দেবে না। রাত দশটা পর্যন্ত তুমি যদি মসজিদে না ফের, তাহলে বুঝা যাবে তুমি কারো সন্ধান পেয়েছ। রাত সাড়ে দশটার দিকে আবু বকর সবাইকে খবর দিয়ে তোমার সন্ধানে আসবে। প্রশ্ন হলো তোমাকে তারা পাবে কি করে?

আহমদ মুসা একটু থেমে বলল, 'রাত সাড়ে দশটায় আবু বকর এই গাছ তলায় গাছের আড়ালে বসবে, তোমাকেও গোপনে এখানে আসতে হবে।'

কথা শেষ করে আহমদ মুসারা চলে না যাওয়া পর্যন্ত আলীকে গাছ তলার অন্ধকারে অপেক্ষা করতে বলে সবাই হাঁটা শুরু করল।

আহমদমুসাকে বাম, ডান ও পেছন থেকে বেষ্টন করে অগ্রসল হচ্ছিল অন্যরা।

পাশে হাঁটতে হাঁটতে জর্জ বলল, 'আলীকে রেখে যাওয়ার কি দরকার ছিল?'

'হ্যাঁ জর্জ, একবার সন্দেহের সৃষ্টি হলে তার শেষ পর্যন্ত দেখা উচিত।' বলল আহমদ মুসা।

'কাউকেই তো পাওয়া গেল না।'

'হতে পারে ঘটনা কিছুই না। সত্যিই হয়তো মাছের নৌকার জন্যে অপেক্ষা করে তারা চলে গেছে। কিন্তু এমনও হতে পারে, তারা যায়নি। আমরা তাদের দেখতে পাইনি।'

'কি হতে পারে ব্যাপারটা তাহলে?' বলল জর্জ।

'বলা মুস্কিল। তবে এই ছোট্ট ঘাটটা এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুনছো তো, অপরিচিত লোকজন গত সপ্তাহ দেড়-দুই ধরে সাউথ টার্কো দ্বীপে, বিশেষ করে এই অঞ্চলে বেশ দেখা গেছে। হতে পারে শত্রুর কেউ ওরা। উদ্দেশ্য পরিষ্কার, ঐ ৩০ জন মানুষের কিভাবে কি হলো এবং কারা ঘটাল এই ঘটনা ইত্যাদি জানতে

চায় তারা। এই মাছের ঘাটকে শত্রুরা আগেও ব্যবহার করেছে, আবারও করতে পারে।'

বলে আহমদ মুসা ইসহাক আব্দুল্লাহর দিকে তাকাল। বলল, আমি ও জর্জ এখন সিডি কাকেম যাচ্ছি। আবু বকর এখানে থাকল। তোমরা সাবধান থাকবে। রাত দশটার দিকে তোমরা একত্রিত হবে মসজিদ চত্বরে। তারপর আবু বকর এগুবে আলীর খোঁজে। তোমরা পেছনে থাকবে গোপনে।'

'আমরা কতজন একত্র হবো?' বলল ইসহাক আব্দুল্লাহ।

'রাত দশটার মধ্যে যদি আলীর খবর না পাও, তাহলে সব শক্তি একত্র করবে। আমাকেও জানাবে টেলিফোনে।'

মসজিদ চত্বরে তখন পৌছে গেছে তারা। ওখানে একটা অটো হুইলার অপেক্ষা করছিল। সেই অটো হুইলারে উঠল আহমদ মুসা ও জর্জ। অটো হুইলার চলতে শুরু করল সিডি কাকেম গ্রামের উদ্দেশ্যে।

গাড়ি চলতে শুরু করলে আহমদ মুসার হঠাৎ যেন মনে হতে লাগল, কি কাজ যেন অসম্পূর্ণ থাকল। তার মনে হলো, আলীর সাথে দেখা হবার পর আবু বকর ও ইসহাক আব্দুল্লাহরা কি করবে সে বিষয়ে তো কিছু বলা হয়নি।

পরক্ষণেই আবার তার মনে হলো, কিছু বলারও তো ছিল না। তারপর আহমদ মুসা মনের এলোমেলো চিন্তা বিদায় করে সামনের আলো অন্ধকারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

চলছে অটো হুইলার।

লায়লা জেনিফার সবার হাতে চায়ের পেয়ালা তুলে দিয়ে নিজের পেয়ালা নিয়ে সোফায় তার আসনে এসে বসেছিল।

গল্প চলছিল।

সুরাইয়া মাকোনি এবং সারা উইলিয়ামও আজই এসেছে জেনিফারদের বাড়িতে। মার্গারেট এসে পৌছেছে রাত আটটার দিকে। সারা উইলিয়াম ও

সুরাইয়া মাকোনি এসেছে তার এক ঘণ্টা আগে। সুরাইয়া মাকোনী চায়ের পিয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে বলল, ‘আমি ভাবতে পারছি না জেনিফার, সেই এশিয়ানটা পরিস্থিতি এমন ওলাট-পালট করে দিল কি করে? আমি তো ভেবেছিলাম, সে ওদের হাতে মারা পড়েছে।’

‘না, মাকোনি। মারা যাওয়ার কথা অমন করে মুখে এনো না।’ বলল জেনিফার ত্বড়িৎ গতিতে।

বলে একটা দম নিয়ে জেনিফার বলল, ‘আল্লাহ ওঁকে বাঁচিয়েছেন। আর বাঁচাবার জন্যে কাজ করেছেন জর্জ এবং মার্গারেট আপা। জর্জ তাঁকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়েছিল।’

লায়লা জেনিফারের কথা শেষ হতেই সারা উইলিয়াম বলল, ‘কিরে জেনিফার। এশীয় সম্পর্কে ‘মরার’ কথা শুনে অমন আঁৎকে উঠলি কেন? হৃদয় ঘটিত কোন ঘটনা সংঘটিত হয়েছে নাকি?’

এ কথার পর সারা উইলিয়াম ও সুরাইয়া মাকোনি দু’জনেই হেসে উঠল। ডাঃ মার্গারেটের মুখ একটু ম্লান হলো। আর গম্ভীর হয়ে উঠল লায়লা জেনিফারের মুখ।

কথা বলে উঠল লায়লা জেনিফার। বলল, ‘সারা তুমি ওঁকে দেখনি, ওঁকে জাননা, তাই এ কথা বলতে পারলে।’ গম্ভীর কণ্ঠ জেনিফারের।

ডাঃ মার্গারেট তাকাল জেনিফারের দিকে। তার চোখে একটা সন্ধানী দৃষ্টি। পরে ধীরে ধীরে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ‘আমি জেনিফারের সাথে একমত। তিনি ভিন্ন এক মানুষ। যতই তাঁকে দেখা যায় আনন্দ ও বিস্ময় শুধু বাড়েই।’

‘ঠিক বলেছেন ডাঃ মার্গারেট আপা। তিনি মাত্র অল্পক্ষণ আমার সামনে কথা বলেছেন। আমার মনে হয়েছিল, আমি নতুন এক পরিবেশে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষের সাথে কথা বলছি। আমি যেন সাম্মোহিত হয়ে পড়েছিলাম। উনি উঠে গেলে আমি যেন বাধ্য হয়েছিলাম ওঁর সন্ধানে উঠে যেতে।’

বাইরের দরজায় নক হলো এ সময়।

‘উনি এসেছেন।’ বলে উৎকর্ণ হলো জেনিফার।

সংগে সংগে সবাই সচকিত হয়ে উঠল।

বলল সারাহ উইলিয়াম, 'তুমি বুঝলে কি করে, জেনিফার? ওঁর গন্ধও চিনে ফেলেছ নাকি?' হাসল সারা উইলিয়াম।

'বলেছি, এভাবে কথা বলো না সারা। ওঁকে তুমি জান না। জান না তুমি, ওঁর সব কাজে শৃঙ্খলা আছে। দরজায় উনি নকও করেন একই নিয়মে।

বলে জেনিফার উঠে দাঁড়াল।

সবাই উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল। জেনিফার বলল, 'না উনি বৈঠকখানায় আসবেন না। সোজা উনি ওঁনার ঘরেই যাবেন।'

জেনিফার পা বাড়াল ড্রইং রুমের ভেতরের দরজার দিকে।

দরজার কাছে যেতেই দরজায় এসে দাঁড়াল পরিচারিকা। বলল, 'স্যার তাঁর রুমে গেছেন। আরেকজন এসেছেন। ড্রইং রুমে আসতে চাচ্ছেন।'

জেনিফার 'কে' বলে মুখ বাড়াল দরজায়। দেখল, জর্জ দাঁড়িয়ে।

একটা রক্তিম আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল জেনিফারের মুখ। বলল, 'এসো।'

সালাম দিয়ে ড্রইং রুমে প্রবেশ করল জর্জ। তার পেছনে পেছনে লায়লা জেনিফার।

সারা ও মাকোনি উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানাল জর্জকে।

ডাঃ মার্গারেট উঠেনি।

'কেমন আছ আপা?' ডাঃ মার্গারেটকে লক্ষ্য করে বলল জর্জ।

'ভাল। তুমি কেমন আছ?'

'আলহামদুলিল্লাহ!' বলল জর্জ।

'তোমার চিঠি পেেিয় সব জেনে আমি থাকতে পারলাম না। চলে এলাম। অসুবিধা হলো না তো জর্জ? উনি কিছু মনে করবেন না তো?' ডাঃ মার্গারেট বলল।

'না আপা। তোমরা সবাই এসেছ জেনে খুশীই হবেন।' জর্জ বলল।

'কোথায় উঠব? জেনিফারদের এখানেই উঠলাম। জেনিফার নিশ্চয় বেজার হয়নি।' বলল ডাঃ মার্গারেট ঠোঁটে হাসি টেনে।

সলাজ হাসি ফুটে উঠেছিল জেনিফারের মুখে।

সেদিকে তাকিয়ে জর্জ হেসে বলল, 'আপা তুমি জেনিফারকে নতুন মানুষ দেখবে।'

কৃত্রিম ক্ষোভে ফুসে উঠল লায়লা জেনিফার। বলল, 'দেখ জর্জ, এতে তোমার কোন কৃতিত্ব নেই। তোমার ভাগ্য, আহমদ মুসার মত ব্যক্তি তোমার উকিল হয়েছেন।'

আহমদ মুসার নাম উচ্চারণ করে কথা শেষ করার পরেই জিহ্বায় কামড় দিল জেনিফার। সংগে সংগে ভয় ও অপরাধের চিহ্ ফুটে উঠল তার মুখে। সংকুচিত হয়ে পড়ল সে।

আহমদ মুসা নাম শুনে সবাই চমকে উঠেছিল। জর্জ তার চোখ দু'টি বিস্ফোরিত করে বলল, 'আহমদ মুসা? কে আহমদ মুসা?'

বিমূঢ় লায়লা জেনিফার কিছুক্ষণের জন্যে পাথরের মত শক্ত হয়ে গিয়েছিল।

জর্জের সরব প্রশ্ন উত্থিত হবার পর লায়লা জেনিফার যন্ত্রচালিতের মত ড্রইং রুমের ভেতরের দরজার দিকে এগিয়ে দরজা লক করে ফিরে এল তার সোফায়।

চারদিক থেকে সবাই ছেঁকে ধরল লায়লা জেনিফারকে। বিব্রত জেনিফার।

'জেনিফার, আহমদ আব্দুল্লাহই কি আহমদ মুসা?' গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ডাঃ মার্গারেট।

কথা বলল না। হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল জেনিফার।

ডাঃ মার্গারেট, জর্জ, মাকোনী, সারা উইলিয়াম সকলের মধ্যেই একটা স্তব্ধতা নেমে এল।

বিস্ময়, আনন্দ ও অভাবিত পাওয়ার এক প্রবল বন্যায় সকলের মধ্যেই আত্মহারা ভাব।

নীরবতা ভাঙল ডাঃ মার্গারেট। বলল, 'তিনি আহমদ মুসা হলেই শুধু তিনি যা তার সাথে মানায়।'

‘এখন মনে হচ্ছে, তিনি আহমদ মুসা না হওয়াই অবিশ্বাস্য। কিন্তু বিশ্বাস হতে চাইছে না তিনি আমাদের মাঝে।’ বলল সারা উইলিয়াম।

‘তাঁকে প্রথম দেখেই মনে করেছিলাম তাঁর আহমদ মুসা হওয়া উচিত।’ মাকোনী বলল।

‘জেনিফার পরিচয়টা না দিলেই ভাল ছিল। এখন ভয় ও সংকোচে মনটা যে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। আর লজ্জা রাখব কোথায়, তার সাথে কত কি বেয়াদবি এ কয়দিনে হয়ে গেছে!’ বলল জর্জ।

জেনিফার উঠে দাঁড়ালো। কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল, ‘সত্যি আমার একটা অপরাধ হয়ে গেছে। ওঁর পরিচয় কাউকে যখন উনি বলেননি, এমনকি আম্মা ও দাদিকেও নয়, তখন আমার এভাবে বলে ফেলাটা অন্যায় হয়েছে। আমার ভয় হচ্ছে, উনি একে কি চোখে দেখবেন।’ থামল একটু।

তারপর সবার দিকে চেয়ে ফিসফিস করে আবার বলল, ‘সবাইকে অনুরোধ সকলে দয়া করে বিষয়টা গোপন রাখবেন। পরিচয় দিতে চাইলে উনিই দেবেন। আমাদের কাছ থেকে তাঁর পরিচয় আর কেউ না জানুক।’

‘ঠিক বলেছ জেনিফার। কিন্তু বল, তোমার সাথে পরিচয় হলো কি করে? উনি কি তোমাকে বলেছেন তার পরিচয়?’ বলল ডাঃ মার্গারেট।

‘না বলেননি। উনি ওকারী গ্রামে আমাকে উদ্ধার করা থেকে শুরু করে তার কাজ, কথাবার্তা, সিডি কাকেমে আসার পথে চারটি লাশ গোপন করাসহ ঘটনাবলী দেখে আমিই তাঁকে গাড়িতে বলেছিলাম তিনি আহমদ মুসা। তিনি স্বীকার করেছিলেন মাত্র।’ লায়লা জেনিফার বলল।

জেনিফার থামলে আবার নেমে এল নীরবতা।

কিছুক্ষণ পর নীরবতা ভাঙল ডাঃ মার্গারেট। অনেকটা স্বগত কণ্ঠের মত বলল, ‘এখন পরিবেশ, পরিস্থিতি সবকিছুই নতুন মনে হচ্ছে। মুহূর্তেই যেন পাল্টে গেল সব। মনে হচ্ছে, আমাদের এই ক্ষুদ্র দেশটা হঠাৎ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।’

‘এই পরিবর্তন কেন? ব্যক্তি আহমদ মুসা তো আজকের আগেও আমাদের মাঝে ছিলেন।’ বলল সারা উইলিয়াম।

‘এটা বোধ হয় তাঁর নামের সাথে আল্লাহর দেয়া একটা শক্তি।’ বলল ডাঃ মার্গারেট।

‘কিন্তু ব্যক্তির প্রভাব ও নামের শক্তি কি আলাদা হতে পারে?’

‘পারে না। নাম যে গুণগুলো বহন করে, ব্যক্তি সে কাজগুলোই করবে। কিন্তু নামের যে প্রভাব ব্যক্তি তা হঠাৎ করে সৃষ্টি করতে পারে না।’ বলল ডাঃ মার্গারেট।

থামল একটু ডাঃ মার্গারেট। পরক্ষণেই আবার শুরু করল, ‘এই কারণেই আহমদ মুসার নাম আমাদের সামনে একটা নতুন অবস্থার সৃষ্টি করেছে।’

‘ধন্যবাদ ডাঃ মার্গারেট, আমি অন্য একটা কথা বলতে চাচ্ছি। জেনিফারের কথা। জনাব আহমদ মুসা জর্জের উকিল হলো কি করে?’ বলল মাকোনী।

জেনিফারের মুখ লাল হয়ে উঠল।

ডাঃ মার্গারেট মুখ টিপে হাসল। কিছু বলতে যাচ্ছিল সে। এই সময় পাশে রাখা তার মোবাইল টেলিফোন বেজে উঠল। ডাঃ মার্গারেট টেলিফোন তুলে নিল। কথা বলল।

গ্র্যান্ড টার্কস থেকে তার বান্ধবীর টেলিফোন। কথা বলতে বলতে মুখ ম্লান হয়ে গেল মার্গারেটের। মুখে ফুটে উঠল ভয়ের চিহ্ন।

টেলিফোন রেখেই সে শুকনো কণ্ঠে বলল, ‘খুব খারাপ খবর মনে হয়। হোয়াইট ঈগলের বিরাট বাহিনী নাকি এই সাউথ টার্কো দ্বীপে আসছে।’

জর্জ চমকে উঠল ডাঃ মার্গারেটের কথা শুনে। জিজ্ঞেস করল, ‘কে দিল এই খবর?’

‘মেরী।’

‘তাহলে বিষয়টা তো এখনই জনাব আহমদ মুসাকে জানাতে হয়।’

বলেই জর্জ ছুটল ড্রইং রুম থেকে বেরিয়ে আহমদ মুসার রুমের দিকে।

মিনিট খানেকের মধ্যে জর্জ ফিরে এল আহমদ মুসাকে নিয়ে।

আহমদ মুসা ড্রইং রুমে ঢুকতে গিয়ে দরজায় থমকে দাঁড়াল। বলল, ‘স্যরি, আপনারা অনেকে দেখছি এখানে আছেন। আমি বরং....।

ডাঃ মার্গারেটসহ সবাই উঠে দাঁড়িয়েছিল। মুহূর্তে সবার মাথায় উঠে গেছে ওড়না। পোশাকের আবরণের ভেতর সবাই সবাইকে যেন সংকুচিত করে নিয়েছে। দ্রুত ড্রইং রুমের একদিকে তারা সরে এসেছে দু'টি সিংগল সোফা খালি করে।

আহমদ মুসাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে লায়লা জেনিফার বলল, 'না ভাইয়া আপনি বসুন। অপরিচিত দু'জন অন্য কেউ নয়। মাকোনীকে তো আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখেছেন। আর এ আমার মামাতো বোন সারা উইলিয়াম।' মাকোনী ও সারা উইলিয়ামকে দেখিয়ে বলল জেনিফার।

আহমদ মুসা সকলকে সালাম দিয়ে মাকোনীর দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'আপনি কেন সেদিন আমাকে সহযোগিতা করতে পারেননি, সেটা আমি হাসপাতালে জ্ঞান ফেরার পরেই বুঝেছিলাম। আরও বুঝেছিলাম, ঐভাবে খোলামেলা জিজ্ঞেস করা আমার ঠিক হয়নি।'

সংকুচিত, লজ্জিত মাকোনী বলল, 'আমি সেদিনের ঘটনার জন্যে দুঃখিত।'

'না বোন মাকোনী, দুঃখিত আমার হওয়া উচিত।' বলল আহমদ মুসা।

'কেন?' বলল মাকোনি মুখ নিচু রেখেই।

'সেদিন বিবেচনায় আমার বিরাট ভুল হয়েছিল। আমি এখানকার শত্রুর শক্তিকে ছোট করে দেখেছিলাম। তাই একবারও ভাবিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের উপর শত্রুরা চোখ রাখতে পারে। অন্য কারো সামনে জেনিফারের কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করা ছিল একটা ভুল সিদ্ধান্ত। এ ভুল সিদ্ধান্তের শাস্তি আমি পেয়েছি।'

'ধন্যবাদ জনাব। এভাবে আপনি নিজেকে ছোট করতে পারে বলেই হয়তো আপনি এত বড়।' বলল মাকোনি আবেগ জড়িত কণ্ঠে।

'বোন মাকোনি। কখনও প্রশংসা করলে শুধু আল্লাহরই করবেন।' গম্ভীর কণ্ঠ আহমদ মুসার।

আহমদ মুসার এ কণ্ঠে সবাই তার দিকে চোখ তুলে তাকাল। একটা বিব্রত ভাব সকলের চোখে।

‘স্যরি।’ বলল মাকোনি।

‘ধন্যবাদ।’ আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসা গিয়ে সোফায় বসল।

বসল সবাই।

আহমদ মুসা বসেই বলল, ‘ডাঃ মার্গারেট আপনাকে যে খবর দিয়েছে সে কে?’ আহমদ মুসার চোখ নিচু। মুখে ভাবনার চিহ্ন।

ডাঃ মার্গারেট পাশের সোফায় বসে ছিল। সে মুহূর্তের জন্যে চোখ তুলে একবার আহমদ মুসার দিকে তাকাল। বলল, ‘জানিয়েছে আমার এক বান্ধবী।’

‘কি করে জানতে পারল সে?’

‘বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের বিপরীত দিকে রাস্তার ওপাশে স্বাস্থ্য দফতর পরিচালিত সেন্ট্রাল মেডিকেল ষ্টোর। সে ষ্টোরেরই সেলস ম্যানেজার আমার সেই বান্ধবী। কিছুক্ষণ আগে দু’জন লোক, যার একজন সানসালভাদরের, ঐ দোকানে ঔষধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম কিনতে গিয়েছিল। তাদের তাড়াহুড়া দেখে আমার বান্ধবী কারণ জিজ্ঞেস করেছিল। উত্তরে তারা জানায়, আমাদের খুব তাড়াতাড়ি সাউথ টার্কো দ্বীপে পৌছতে হবে। কেন সেখানে কোন দূর্ঘটনা.......? জিজ্ঞেস করেছিল আমার বান্ধবী। আমার বান্ধবীকে কথা শেষ করতে না দিয়েই তারা বলে, না দুর্ঘটনা ঘটেনি। তবে সুর্ঘটনা ঘটবে সেখানে। তাহলে ঔষধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামের প্রয়োজন কেন? বলেছিল আমার বান্ধবী। সুলক্ষ্যের জন্যে যুদ্ধ কি সুঘটনার মধ্যে পড়ে না? বলেছিল তাদের একজন। তা পড়ে। কিন্তু তার জন্যে এত তাড়াহুড়া কেন? জিজ্ঞেস করে আমার বান্ধবী। আমরা অনেক লোক যাচ্ছি তো। প্রস্তুত হয়ে বের হতেও তো সময় লাগবে। তারা বলেছিল।

এসব কথা থেকেই আমার বান্ধবীর মনে হয়েছে সাউথ টার্কো দ্বীপে বড় কিছু ঘটতে যাচ্ছে। সাউথ টার্কো দ্বীপে আমি এসেছি এবং সাউথ টার্কোতে এ পর্যন্ত কি ঘটেছে সে জানে। সুতরাং তার মনে সন্দেহ উদয় হবার সাথে সাথে সে টেলিফোন করেছে আমার কাছে।’ বলল মার্গারেট।

আহমদ মুসা গভীরভাবে ভাবছিল। ডাঃ মার্গারেট কথা শেষ করলেও আহমদ মুসা তৎক্ষণাৎ কিছু বলল না।

একটু পরেই চকিতে একবার মুখ তুলে ডাঃ মার্গারেটের দিকে চেয়ে বলল, 'তাদের তাড়াহুড়া কেন ছিল বলুন তো?'

'অনেক কিছু অনুমান করা যায়, কিন্তু ঠিক করে বলা মুস্কিল।' বলল ডাঃ মার্গারেট।

'অনুমান একটা এই হতে পারে যে, সাউথ টার্কো দ্বীপে তাদের মূল লোকেরা এসেছে সানসালভাদর থেকে। তারা চিকিৎসা সরঞ্জাম সম্ভবত সাথে আনতে পারেনি ভুলের কারণে। তাই তাড়াহুড়া করে সংগ্রহ।'

ডাঃ মার্গারেট হাসল। বলল, 'আমার মনে হয় এই অনুমানটা সত্যের সবচেয়ে কাছাকাছি।'

আবার ভাবনায় ডুব দিয়েছে আহমদ মুসা।

এবার মুখ তুলে তাকাল জর্জের দিকে। বলল, 'জর্জ, আমরা ওকারী গ্রামে মৎস বন্দরের দু'জন সন্দেহজনক লোক সম্পর্কে যা শুনে এলাম, তার সাথে ডাঃ মার্গারেটের দেয়া তথ্য মেলালে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, সাউথ টার্কো দ্বীপে একটা বড় ধরনের অভিযান আসছে এবং তা আসছে ঐ মৎস বন্দরের পথেই।'

'বড় ধরনের অভিযান?' শুকনো কণ্ঠে বলল জর্জ।

শুধু জর্জ নয় আহমদ মুসার শেষ কথাটা মুহূর্তেই সকলের চেহারা পাল্টে দিয়েছে। উদ্বেগ ফুটে উঠেছে সবার চোখে-মুখে।

জর্জের সভয় প্রশ্নের জবাবে আহমদ মুসা বলল, 'হ্যাঁ অভিযানটা বড় ধরনেরই হবে। সুদূর সানসালভাদর থেকে ছোট-খাট অভিযানের জন্যে তারা আসছে না নিশ্চয়। ঔষধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম সংগ্রহ থেকে বুঝা যায়, বেপরোয়া ধরনের কোন অভিযান নিয়ে তারা আসছে।'

'সুদূর সানসালভাদর থেকে কেন কাছে কোথাও থেকে কেন নয়? বলল জর্জ।

'এর উত্তর জানি না। পরে খোঁজ নেয়া যাবে। আমার মনে হয় তাদের একটা বড় কেন্দ্র হতে পারে সানসালভাদর। স্থানীয় উদ্যোগ বড় ধরনের মার খাওয়ার পর ওরা আসছে যুদ্ধে জেতার জন্যে।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকাল। তারপর সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'আমি এখন উঠব। এখনি যেতে হবে ওকারী গ্রামে।'

জর্জসহ মেয়েদের সকলের মুখ ভয় ও উদ্বেগে আচ্ছন্ন। কিন্তু আহমদ মুসার ঠোঁটের স্বাভাবিক হাসিটি তখনও মিলায়নি।

আহমদ মুসা থামতেই লায়লা জেনিফার বলল, 'তাহলে সাউথ টার্কো দ্বীপের উপর ভয়ানক বিপদ ঘনিয়ে আসছে?'

'ভয়ানক কিনা জানিনা, তবে একটা বিপদ তো আসছেই।'

'আপনি ওকারী গ্রামে চলে গেলে আমাদের এখানে কি করণীয় হবে?' লায়লা জেনিফার বলল উদ্বিগ্ন কণ্ঠে।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'আমি জর্জকে রেখে যাচ্ছি। সে এখানকার আলী রুফাই, ওমর লাওয়াল ও রমযান ইরোহাকে নিয়ে প্রতিরক্ষার একটা ব্যবস্থা গড়ে তুলবে।'

বলে তাকাল আহমদ মুসা জর্জের দিকে। তারপর বলল, 'ঠিক আছে জর্জ?'

'ঠিক আছে ভাইয়া। আপনার আদেশ সর্বশক্তি দিয়ে পালন করব।' শুকনো, উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল জর্জ।

আহমদ মুসা হেসে উঠল।

'হাসছেন যে ভাইয়া?' ম্লান কণ্ঠে বলল জর্জ।

'হাসছি তোমার ভীত, উদ্বিগ্ন কণ্ঠ শুনে।'

'কিন্তু ভাইয়া, আপনার হাসি দেখে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা কিছুই নয়। অথচ সাংঘাতিক কিছু ঘটতে যাচ্ছে।' বলল জেনিফার।

'জর্জের পক্ষ নেবার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ জেনিফার। তুমি ঠিকই বলেছ, হয়তো সাংঘাতিক কিছু ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু একে ভয় পাবার কিছু নেই।'

'সাংঘাতিক কিছু তো অবশ্যই ভয় পাবার মত।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'ভয় পেলে সাংঘাতিক বহুগুণ সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়ায়। যার ফলে যুদ্ধের আগেই পরাজয় নির্ধারিত হয়ে যায়।'

‘আপনার একটুও ভয় করছে না?’ লায়লা জেনিফার বলল।

একটা গাম্ভীর্যের ছায়া নেমে এল আহমদ মুসার মুখে। তাকাল জেনিফারের দিকে। বলল, ‘ভয় কাকে করব বলত? আমি যে আল্লাহকে ভয় করি, যে আল্লাহকে আমি আমার অভিভাবক, রক্ষাকর্তা বলে মনে করি, সেই আল্লাহ তো অন্য কাউকে ভয় করতে নিষেধ করেছেন। আর ভয় আমি কেন করব বলত? সর্ব শক্তিমান আল্লাহ আমার সাথে আছেন, আমি আমাকে শত্রুর চেয়ে দুর্বল ভেবে ভীত হবো কেন?’

আহমদ মুসা কথা শেষ করলেও কেউ কোন কথা বলল না। সবার চোখে একটা বিস্ময় ও আনন্দের ঔজ্জ্বল্য।

নীরবতা ভাঙল ডাঃ মার্গারেট। বলল, ‘আমি অহেতুক ভয় করার কথা বলছি না। কিন্তু শত্রুর চেয়ে আসলেই দুর্বল হলে সে বাস্তবতা চাপা দেয়া কি ঠিক?’

‘দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত থাকা এবং ভয় করা, দু’টি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত থাকলে তবেই তো মোকাবিলার উপযুক্ত ষ্ট্রাটেজি গ্রহণ করা যাবে। কিন্তু ভয় করলে মোকাবিলার আগেই অর্ধেক পরাজয় হয়ে যায়।’

‘বুঝতে পেরেছি। ধন্যবাদ।’ বলল ডাঃ মার্গারেট মুগ্ধ চোখে।

মার্গারেটের কথা শেষ হতেই সারা উইলিয়াম বলল, ‘আপনি বহুবার বন্দী হয়েছেন, বহুবার মৃত্যুর মুখে পড়েছেন, সে সময়গুলোতে আপনার কেমন মনে হতো, কি ভাবতেন আপনি?’

‘সারা?’ তীব্র কণ্ঠে বলল লায়লা জেনিফার।

সারা উইলিয়াম জিহ্বায় কামড় দিয়ে বলল, ‘স্যরি।’

সারা উইলিয়াম ও লায়লা জেনিফার দু’জনের দিকেই তাকাল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসাকে তাকাতে দেখে লায়লা জেনিফার লজ্জা পেল সারাকে ঐভাবে ধমকে উঠার জন্যে। বলল সেও, ‘স্যরি।’ বিব্রত চেহারা লায়লা জেনিফারের।

বুঝল আহমদ মুসা। হাসল সে। বলল, 'বিব্রত হওয়ার কি আছে জেনিফার। যা গোপন নেই, আমার কাছে গোপন করার প্রয়োজন কি?'

'ভাইয়া.........।' জেনিফার কথা বলতে পারলো না। কেঁদে ফেলল জেনিফার ক্ষোভে, লজ্জায়।

আহমদ মুসা গম্ভীর হলো। বলল, 'তোমাদের কাছে আমার পরিচয় গোপন রাখার প্রয়োজন নেই। এখানকার শত্রু বা প্রতিপক্ষের কাছে আমার পরিচয় গোপন রাখা প্রয়োজন এ জন্যে যে, আমার পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়লে প্রতিপক্ষরা একদিকে সাবধান হবে, অন্যদিকে ওদেরকে সাহায্য করার জন্যে আমার পুরনো শত্রুদের অনেকেই ছুটে আসবে।'

লায়লা জেনিফার চোখ মুছে বলল, 'তাহলে আমি অন্যায় করিনি ভাইয়া?'

'অবশ্যই না।' বলে আহমদ মুসা আবার ঘড়ির দিকে তাকাল।

'আমরা সৌভাগ্যবান, আপনাকে আমার অভিনন্দন।' বলল ডাঃ মার্গারেট আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

'ডাঃ মার্গারেট, অভিনন্দনটা আগামী হয়ে গেল। দোয়া করুন।'

বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল জর্জকে, 'চল, দেখ গাড়িতে তেল আছে কিনা। এখনি যেতে হবে।'

জর্জ উঠে দাঁড়াল।

'একটা কথা বলতে পারি?' বলল ডাঃ মার্গারেট আহমদ মুসাকে।

'আহমদ মুসা চলতে শুরু করেছিল। থমকে দাঁড়াল। বলল, 'বলুন।'

'ওরা তো অনেক ঔষধ, অনেক চিকিৎসা সরঞ্জাম নিয়ে আসছে। আমি একজন ডাক্তার। আমি কি আপনাদের সাথী হতে পারি?'

আহমদ মুসার চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'ধন্যবাদ ডাঃ মার্গারেট। অবশ্যই সাথী হতে পারেন, এক সময় সাথী হতে হবে। কিন্তু আজ আপনি গেলে, জর্জকেও যেতে হবে। কিন্তু আমি চাই, জর্জ এখানে থাকুক। সুতরাং আপনিও এখানেই থাকুন।'

'আরেকটা কথা।' বলল ডাঃ মার্গারেট।

‘বলুন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘সারা উইলিয়াম একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিল, তার জবাব দেননি।’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘এ প্রশ্নের কি জবাব দেব? এই যে আজ বেরুচ্ছি, জীবন এবং মৃত্যু দুই-ই আমার সাথে। আমি এ নিয়ে কিছুই ভাবছি না। জীবন মৃত্যুর মালিক যিনি, ভাবনা তাঁর, সিদ্ধান্তও তাঁরই।’

বলে আহমদ মুসা সালাম দিয়ে পা বাড়াল বাইরে বেরুবার জন্যে।

বেরিয়ে গেল ড্রইংরুমের থেকে। তার পিছে পিছে জর্জও।

আহমদ মুসার যাত্রাপথের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে ছিল ওরা চারজন।

আহমদ মুসা বেরিয়ে গেছে, কিন্তু ওদের চোখের পলক পড়েনি, দৃষ্টি তাদের ফিরে আসেনি।

এক সময় ঠোঁট ফুঁড়েই যেন কথা বেরুল ডাঃ মার্গারেটের। বলল, ‘জেনিফার, মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষের কথা শুনেছিলাম। আজ দেখলাম এক অপরূপ মৃত্যুঞ্জয়ীকে।’ ধীর এবং ভারী কণ্ঠ ডাঃ মার্গারেটের।

মার্গারেটের কণ্ঠস্বরে ওরা তিনজন ফিরে তাকাল মার্গারেটের দিকে।

ধপ করে বসে পড়ল মার্গারেট সোফায়। বসল ওরা তিনজনও।

কথা বলল মার্গারেটই আবার। বলল, ‘কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত যে ভয় আমাকে পেয়ে বসেছিল, সে ভয় এখন আর নেই আমার।’

‘সত্য বলেছেন আপা। মনের অজানা একটা দুয়ার যেন খুলে গেছে। নিজেকে অনেক সাহসী ও শক্তিশালী মনে হচ্ছে।’ বলল লায়লা জেনিফার।

‘এ জন্যেই আহমদ মুসা অমন জগৎজয়ী আহমদ মুসা হতে পেরেছে। সে ব্যক্তি মাত্র নয়, সে যেন সাধনার সেই পরশমণি। লোহাও ওঁর সান্নিধ্যে সোনা হয়ে যায়।’

কিছু বলতে যাচ্ছিল মাকোনি। কিন্তু মুখ হা করেই থেমে গেল।

ড্রইং রুমে প্রবেশ করল জেনিফারের মা ও দাদী। বলল জেনিফারের মা, ‘কি ব্যাপার? কি ঘটেছে ওকারী গ্রামে? কয়েক টুকরো রুটি মুখে দিয়েই আমাদের আহমদ আব্দুল্লাহ (আহমদ মুসা) আবার ছুটে গেল ওকারী গ্রামে?’

'আম্মা, আজ রাতেই শত্রুদের একটা বড় অভিযান আসছে আমাদের সাউথ টার্কো দ্বীপে।' বলল লায়লা জেনিফার।

শুনে জেনিফারের মা ও দাদী দু'জনেই হতাশ ভাবে বসে পড়ল সোফায়। বলল জেনিফারের দাদী, 'তাহলে কি টার্কো দ্বীপপুঞ্জ থেকেও আমাদের ভাত উঠল? এরপর কোথায় যাব আমরা? কে আমাদের জায়গা দেবে?'

উদ্বেগ, আতংকে ছেয়ে গেছে জেনিফারের মা ও দাদীর মুখ।

'দোয়া করুন দাদী। বড় বিপদ ঠিকই। কিন্তু দাদী, বহু শতাব্দীর অব্যাহত পরাজয়ের পর আমরা প্রথমবার জিততে শুরু করেছি। এবার আমাদের বিজয়ের পালা।' বলল জেনিফার আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে।

'আল্লাহ আমাদের আহমদ আব্দুল্লাহকে সাহায্য করুন। তার হাতেই তো আমাদের বিজয় আসতে শুরু করেছে।' বলল জেনিফারের মা।

'আমিন।' সকলে একযোগে বলে উঠল।

আহমদ মুসা ওকারী গ্রামের মসজিদে এসেই শুনল, আলী ওরমা রাত দশটার মধ্যে ফেরেনি। তার পরেই আবু বকর ক'জনকে নিয়ে ওদিকে চলে গেছে।

আহমদ মুসার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। বুঝল, আলী নিশ্চয় সন্দেহজনক কারও দেখা পেয়েছে। তাহলে হোয়াইট ঈগল এই পথেই দ্বীপের মুসলিম অবস্থানের উপর আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওদের পথকে এত তাড়াতাড়ি চিহ্নিত করতে পারায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসাকে রাস্তায় কথা বলতে দেখে মসজিদ থেকে দ্রুত বেরিয়ে এল ইসহাক আব্দুল্লাহ, কলিন কামাল এবং ফরিদ নোয়ানকো।

আহমদ মুসার সামনে আসতে আসতে ইসহাক আব্দুল্লাহ বলল, 'আবু বকর দশ মিনিট আগে তিনজনকে সাথে নিয়ে আলীর সাথে দেখা করতে গেছে।'

আহমদ মুসা তার কথার দিকে কান না দিয়ে বলল, ‘তোমার আব্বা কোথায়?’

ইসহাক আব্দুল্লাহ মুখ খুলতে যাচ্ছিল। সেই সময় তার আব্বা আব্দুর রহমান ওকারীকে আহমদ মুসার দিকে আসতে দেখা গেল।

সে আসতেই আহমদ মুসা তাকে সালাম দিয়ে বলল, ‘জনাব হোয়াইট ঈগল বড় ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে এ দ্বীপে আসছে। আজ রাতেই কোন এক সময় আক্রমণ হবে এবং মনে হচ্ছে এ ঘাটেই তারা ল্যা- করবে।’

আব্দুর রহমান ওকারীর চোখে-মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠল। বলল, ‘আলী কিংবা আবু বকর কেউতো ফেরেনি। এটা জানা গেল কিভাবে?’

‘আজ সন্ধ্যায় জর্জের বোন এসেছে ‘গ্রান্ড টার্কস’ থেকে। তাকেই একজন টেলিফোন করে জানিয়েছে। তার উপর আলী দশটার মধ্যে না ফেরায় প্রমাণিত হচ্ছে সেও সন্দেহজনক কিছু দেখেছে।’ বলল আহমদ মুসা।

সকলের চোখে-মুখে চিন্তা ও উদ্বেগের ছায়া।

আহমদ মুসা সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলল, ‘কি ব্যাপার, তোমরা কি ভয় করছ?’

ম্লান হাসল ইসহাক আব্দুল্লাহ। তাড়াতাড়ি বলল, ‘না ভাইয়া, আমরা ভাবছি, আপনি পাশে থাকলে, যে কোন কিছুর মোকাবিলায় আমরা দাঁড়াতে পারি।’

‘অবশ্যই।’ বলে উঠল কলিন কামাল ও নোয়ানকো একযোগে।

‘আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের এখন দু’টি কাজ। এক, গ্রামের ট্রেনিং প্রাপ্ত সকলকে এই মসজিদ চত্বরে এনে জমা করা। দুই, কয়েকজনকে এখনি আবু বকরের সাথে যোগ দিতে হবে। ওদিকের সব অবস্থা জেনে এখানে এসে আমাদের কৌশল ঠিক করতে হবে। আমি, কলিন ও নোয়ানকো আবু বকরের ওদিকে যাই। ইসহাক আবদুল্লাহ এদিকটা দেখ।’

‘আমিও যাব।’ ইসহাক আবদুল্লাহ বলল।

‘অসুবিধা নেই। আমি অন্যদের নিয়ে এ দিকটা ম্যানেজ করবো। আমি গ্রামের দিকে বেরুচ্ছি।’ বলল ইসহাক আবদুল্লাহর আব্বা আবদুর রহমান ওকারী।

‘জর্জকে দায়িত্ব দিয়ে এসেছি সিডি কাকেম এলাকার।’

বলে একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর আবার শুরু করল, ‘আমি যতদূর জানতে পেরেছি, ওরা বড় ধরনের দল নিয়ে আসছে। এ বিষয়টা কারও কাছে লুকানো ঠিক হবে না। তবে কেউ যদি ওদের মোকাবিলার প্রশ্নে দ্বিধাগ্রস্ততা অনুভব করে, তাহলে তাকে আমাদের সাথে শামিল হতে বাধ্য করা ঠিক হবে না। নিজেদের বিশ্বাস, নিজেদের সমাজ স্বজাতি, নিজেদের মাটি রক্ষার জন্যে যারা জীবন দিতে প্রস্তুত, তাদের সংখ্যা কম হলে ক্ষতি নেই। এঁরা আল্লাহর সাহায্য পাবেন।’

আবদুর রহমান ওকারী আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে ছিল। তাঁর চোখে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল অবাক বিস্ময়।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, ‘এমন করে কেউ কোনদিন আমাদের বলেনি। এমন বিশ্বাসের কথা, এমন আবেগের কথা আমাদের জানাই ছিল না। আল্লাহর সাহায্য এভাবে পাওয়া যায়, ভাবনায়ও আসেনি কোনদিন আমাদের। এতকিছু তুমি জান, এমনভাবে তুমি বলতে পার, কে তুমি বাবা?’

আহমদ মুসা বলল, ‘আমি আপনাদের ভিনদেশী এক ভাই। আর কিছুর কি দরকার আছে?’

বলে আহমদ মুসা ইসহাক আবদুল্লাহর দিকে চেয়ে বলল, ‘তোমরা কি প্রস্তুত? আমরা এখনি যাত্রা করব।’

‘আমরা প্রস্তুত।’ বলল ইসহাক আবদুল্লাহ।

‘তোমাদের তিনজনের পকেটেই কি রিভলবার আছে? আহমদ মুসা বলল।

ইসহাক আবদুল্লাহ উত্তর দিল না। তারা তিনজন পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। একটু পর ইসহাক আবদুল্লাহ বলল, 'না ভাইয়া, আমাদের কারো পকেটেই রিভলবার নেই।'

'চাকু বা ছোরা আছে?'

ইসহাক আবদুল্লাহ আবার অন্য দু'জনের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করে বলল, 'না নেই।'

'তাহলে প্রস্তুত কেমন করে তোমরা?'

'আমরা মনে করছি, কি অবস্থা তার খোঁজ নিতে যাচ্ছি, লড়াইয়ে তো যাচ্ছি না। তাই....।'

কথা শেষ না করেই থেমে গেল ইসহাক আবদুল্লাহ।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'দেখ বর্তমান অবস্থায় একজন মুসলিমকে সব সময় পুলিশ ও সৈনিকের ভূমিকায় থাকতে হবে। আমরা যুদ্ধাবস্থায় আছি। রিভলবার ও চাকুর মত অস্ত্র সব সময় সাথে থাকতে হবে। যাও তৈরি হয়ে এসো।'

ওরা তিনজনই ছুটে চলে গেল।

আবদুর রহমান ওকারীও আহমদ মুসাকে সালাম দিয়ে 'যাই ওদিকের ব্যবস্থা করি' বলে হাঁটাতে শুরু করল।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ওরা তিনজনই ফিরে এল।

আহমদ মুসা হাঁটতে শুরু করল। তার পেছনে পেছনে ওরা তিনজন।

হাঁটতে হাঁটতে ইসহাক আবদুল্লাহ, 'আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?'

'সেটাই ভাবছি।' বলল আহমদ মুসা।

'কেন সেই গাছতলায়, যেখানে আলীর সাথে আবু বকরদের দেখা করার কথা, সেখানেই কি প্রথমে যাব না?' বলল ইসহাক আবদুল্লাহ।

'সেখানেই তো যাওয়ার কথা। ভাবছি, আলী আর আবু বকরের দেখা হলো কিনা? দেখা হলে তারা সেখানে এখনও আছে কিনা। যা পরিস্থিতি, তাতে আমার মনে হচ্ছে আলীর দেখা পাওয়ার পর আবু বকর প্রস্তুতির জন্যে বা খবর দেয়ার জন্যে এতক্ষণ ফেরার কথা। কিন্তু ফিরল না কেন?'

'তাহলে?' বলল ইসহাক আবদুল্লাহ।

‘তবু ওখানেই প্রথম যেতে হবে আমাদের।’ আহমদ মুসা বলল।

সেই গাছতলা ঘাটের খুব কাছাকাছি। এখান থেকে গন্তব্যস্থল এখনও বেশ দূরে। আহমদ মুসা আগে চলছিল। পেছনে ওরা তিনজন। আহমদ মুসা চারদিকে সাবধানী দৃষ্টি রেখে সামনে এগিয়ে চলছিল।

আহমদ মুসার দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ ছিল সামনে বেশ দূরে। ক্ষুদ্র একটি আলোক শিখাকে সে জ্বলে উঠেই আবার নিভে যেতে দেখেছে। সেটা দিয়াশলাই-এর কাঠি বা সিগারেট লাইটারের আলো, না দৃষ্টি বিভ্রম! এ নিয়ে আহমদ মুসা মুহূর্তের জন্যে আনমনা হয়ে পড়েছিল।

কোন কিছুর সাথে হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে গেল আহমদ মুসা।

নিচের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল আহমদ মুসা। মানুষের দেহ। ঘুমন্ত না মৃত।

পেন্সিল টর্চ জ্বেলে পরীক্ষা করতেই আরেক দফা চমকে উঠল আহমদ মুসা। এতো ওকারী গ্রামের! একি আবু বকরের সাথী ছিল?

কথাটা মনে আসতেই উদ্বেগের একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল আহমদ মুসার গোটা দেহে।

সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসা চাপা কণ্ঠে বলল, ‘ইসহাক তাড়াতাড়ি এদিকে এস। সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে।’

বলে আহমদ মুসা সামনে ও আশেপাশে চোখ বুলাল। রাস্তার উপর পড়ে থাকা আরও তিনটি দেহ দেখতে পেল সে।

এই সময় একটা কণ্ঠ ভেসে এল সামনে মাটিতে পড়ে থাকা দেহ তিনটির দিক থেকে, ‘আহমদ আবদুল্লাহ ভাই, আমি পারিনি। সব শেষ হয়ে গেছে।’

আবু বকরের গলা! সে জীবিত কথাটা ভাবতেই আহমদ মুসা ছুটল দেহটির দিকে। ততক্ষণে আবু বকর তার ডান হাতটা বাম হাত দিয়ে চেপে ধরে উঠে বসেছে।

আহমদ মুসা ছুটে গিয়ে বসল তার পাশে।

বসেই বলল, ‘তুমি কেমন আছ, আর কোথাও গুলী লেগেছে?’

একে একে সবাই এসে ঘিরে দাঁড়াল আবু বকরকে।

'ভাইয়া, আবু বকরের সাথের ওরা তিনজনই মারা গেছে।' আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল ইসহাক আবদুল্লাহ।

কেঁদে উঠল আবু বকর। বলল, 'পারিনি ওদের সাথে। ওরা ছিল তিনজন। প্রথম গুলীতে ওদের একজনকে মেরেছিলাম। দ্বিতীয় গুলী ছুড়বার আগেই গুলী খেলাম আমি। রিভলবার হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল। তারপরেই এল ওদের ব্রাশ ফায়ার। আমি মাটিতে পড়েছিলাম। ওরা মনে করেছিল গুলীতে আমিও ঝাঁঝরা হয়ে গেছি। চলে যায় ওরা।'

'ওদের মৃত লোকটিকে তো দেখছি না। কোথায় সে?' বলল আহমদ মুসা।

রাস্তার পাশে একটা জায়গার দিকে অংগুলি সংকেত করে বলল, 'ঐখানে পড়েছিল। ওরা যাবার সময় লাশ নিয়ে গেছে।'

আহমদ মুসা উঠে গিয়ে জায়গাটা পরীক্ষা করল। অনেক জায়গা জুড়ে জমাট রক্ত।

আহমদ মুসা আঙুলের ডগা দিয়ে কিঞ্চিত রক্ত তুলে নিয়ে পরখ করে দেখল, কমপক্ষে ১৫ মিনিট আগে এ লোকটি নিহত হয়েছে। তার মানে ওরা তের চৌদ্দ মিনিট আগে এখান থেকে চলে গেছে।

আহমদ মুসা ফিরে এল আবু বকরের কাছে। বলল, 'সংক্ষেপে বল কি ঘটেছিল?'

'আকাশ থেকে বাজ পড়ার মত ওরা উদ্যত রিভলবার ও ষ্টেনগান হাতে আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়। শুধু একটা গুলী করারই সুযোগ পেয়েছিলাম। তারপরেই সবশেষ। ' বলল কান্না ভরা কণ্ঠে আবু বকর।

ভাবছিল আহমদ মুসা। বলল, 'আমার মনে হচ্ছে তোমাদের অপেক্ষায় ওরা ওঁৎপেতে বসেছিল।'

'কিন্তু জানল কি করে?' বলল ইসহাক আবদুল্লাহ।

'আমি নিশ্চিত আমাদের আলী হয় ওদের হাতে নিহত, নয়তো বন্দী।'

সকলেই চমকে উঠল আহমদ মুসার কথায়। আবু বকর বলল, ‘তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন, বন্দী বা নিহত আলীর কাছ থেকে খবর পেয়ে বা সন্দেহ করেই তারা এখানে এসে ওঁৎপেতে বসেছিল?’

‘আমি তাই মনে করি।’ আহমদ মুসা বলল।

বলেই আহমদ মুসা কলিন কামালের দিকে চেয়ে বলে উঠল, ‘তুমি তো বলা যায় ডাক্তার। তুমি আবু বকরকে নিয়ে যাও। আমি এদিকে দেখছি।’

‘তিনটি লাশের আমরা কি করব?’ বলল কলিন কামাল।

‘ওগুলেঅ এখানেই থাকবে। গাড়ি এনে ওদের নিয়ে যেতে গেলে আমরা শত্রুর নজরে পড়ে যাব।’

বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। হাঁটতে শুরু করল আহমদ মুসা সড়ক ধরে ঘাট লক্ষ্যে। তার পেছনে ইসহাক ও নোয়ানকে।

ভাবছিল আহমদ মুসা, শত্রু দু’জন এখন কোথায় থাকতে পারে, কি করছে এখন তারা। এভাবে বিকেল থেকে ঘাটে থাকার তাদের উদ্দেশ্য কি? হঠাৎ আহমদ মুসার মনে হলো, তারা কি হোয়াইট ঈগলের আজকের অভিযানের অগ্রবাহিনী? হতে পারে। তারা এ এলাকায় খোঁজ-খবর রাখছে যা হোয়াইট ঈগলের অভিযানের সাহায্যে আসবে।

সুতরাং তারা শত্রুর গুপ্তচর। তাদের হত্যা করলে ওদের অভিযান অনেক মূল্যবান তথ্য থেকে বঞ্চিত হবে। আর যদি ওদের ধরতে পারা যায়, তাহলে অনেক মূল্যবান তথ্য আমরা পাব, ভাবল আহমদ মুসা।

ওরা এই মুহূর্তে কোথায় কি কাজ করতে পারে? আলী এবং এদেরকে হত্যা করার পর নিশ্চয় এদের খোঁজে আরও কেউ আসবে, এ নিশ্চিত আশংকা তারা করবে। সুতরাং তারা সড়কের উপর অবশ্যই চোখ রাখবে।

এ বিষয়টা চিন্তা করার সাথে সাথেই আহমদ মুসা থমকে দাঁড়াল। তার সাথে সাথে ইসহাকরাও।

‘কিছু ঘটেছে?’ ফিস ফিস করে বলল ইসহাক আবদুল্লাহ।

‘ঘটেনি। ঘটতে পারে, সে বিষয়েই চিন্তা করছি।’

চলা শেষ করেই আহমদ মুসা আবার বলল, ‘সড়ক দিয়ে এভাবে যাওয়া আর নয়। ইসহাক তুমি আর নোয়ানকো রাস্তার পশ্চিম পাশে নেমে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে থাকো। আমি পুব পাশে নামছি।

যে গাছ তলায় আলী ও আবু বকরদের দেখা করার কথা, সে গাছ তলা আহমদ মুসারা পার হয়ে এসেছে। সে গাছ তলায় গিয়ে আহমদ মুসা চকিতে চোখ বুলিয়েও এসেছে। না সেখানে কিছু নেই। সেখানে আসার আগেই আলীর কিছু হয়েছে নিশ্চয়।

ঘাট খুব বেশি দূরে নয়।

একটা টিলার গোড়া দিয়ে যাচ্ছিল আহমদ মুসা। টিলার একাংশ কেটে রাস্তাটা তৈরি হয়েছে।

টিলা এবং রাস্তার মাঝখান দিয়ে নালা। সম্ভবত বৃষ্টির পানি সরানোর জন্যেই এ নালার সৃষ্টি।

এই নালা ধরেই দক্ষিণে ঘাটের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল আহমদ মুসা।

টিলাটির গোড়ায় পৌছতেই হঠাৎ আক্রান্ত হলো আহমদ মুসা। তার মনে হলো গোটা টিলাটাই যেন তার মাথায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

হাত থেকে ষ্টেনগানটা ছিটকে পড়ল আহমদ মুসার। সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল নালায়।

পড়ে যাবার পরক্ষণেই আহমদ মুসা বুঝতে পারল টিলা ভেঙে তার মাথায় পড়েনি। দু’জন লোক তার উপর লাফিয়ে পড়েছে টিলার উপর থেকে। নিশ্চয় এরা সেই দু’জন। এরা ওঁৎপেতে ছিল টিলার উপর। ভাবল আহমদ মুসা।

এরা দু’জন আহমদ মুসার উপর লাফিয়ে পড়েই জাঁপটে ধরেছিল আহমদ মুসাকে।

একজন টিপে ধরেছিল আহমদ মুসার গলা। অন্যজন মুখ, নাক চেপে ধরে তার শ্বাস বন্ধ করার চেষ্টা করছিল।

নালাটা খুব প্রশস্ত ছিল না।

আহমদ মুসার হাত দু’টি পড়ে গিয়েছিল তার দেহের নিচে। উপর থেকে দু’জন চেপে ধরে থাকায় হাত দু’টি বের করার উপায় ছিল না।

গলা, মুখ ও নাকে ওদের হাতের চাপ বাড়ছে। মুখ এদিক ওদিক সরিয়ে মুখ ও নাক বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল আহমদ মুসা। কিন্তু কতক্ষণ?

শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে আহমদ মুসার।

প্রদীপও নেভার আগে জ্বলে। অনেকটা যেন সে ধরনেরই ঘটনা ঘটল।

আহমদ মুসা দু'পা জোড়া করে যতটা পারা যায় ওপরে তুলে দ্রুত নিচে নামিয়ে দেহে একটা ঢেউ এর সৃষ্টি করে কটিদেশটা প্রবল বেগে উপরে তুলল। তার ফলে দেহের মধ্য অঞ্চলে একটা প্রবল ঝাঁকুনির সৃষ্টি হলো। মাথা আকস্মিক সক্রিয় হয়ে মাটির সাথে সেঁটে গেল এবং পিঠ ও কটিদেশটা বেশ তীব্র গতিতে অনেকখানি উপরে উঠল।

আকস্মিক এই প্রবল ঝাঁকুনিতে ওদের দু'জনের হাতই আহমদ মুসার গলা, মুখ ও নাক থেকে কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ল এবং আহমদ মুসার উপর চেপে বসা তাদের দেহ পাশে সরে গেল।

মুক্ত বাতাসে বুক ভরে গেল আহমদ মুসার এবং সংগে সংগেই হাত দু'টি সক্রিয় হলো তার।

আহমদ মুসা দুই হাতে ভর দিয়ে দেহের সামনের অংশকে উপর দিকে ছুঁড়ে দিল।

আগের ঝাঁকুনিতেই ওদের হাত কিছুটা ঢিলা হয়ে পড়েছিল। আহমদ মুসার পিঠ থেকে এবার দু'জন দু'পাশে ঝুলে পড়ল। তারা আহমদ মুসার গলা ও মাথা তাদের হাতের মুঠোয় রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছিল।

আহমদ মুসা তার দুই কনুই চালাল ওদের দু'জনের পাঁজরে। গুলী খাওয়ার মতই ওরা কেঁপে উঠল। টলে উঠল তাদের দেহ। আহমদ মুসাকে ছেড়ে দিয়ে ওরা নিজেদের সামলে নেবার চেষ্টা করল। কিন্তু তারা সময় নষ্ট করল না। এক হাত দিয়ে তারা পাঁজরটা চেপে ধরে অন্য হাত দিয়ে দ্রুত রিভলবার বের করল।

ওদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে আহমদ মুসাও রিভলবার বের করেছে। কিন্তু আঘাত সামলে ওরা এতটা ক্ষিপ্রতা দেখাবে, তা সে ভাবেনি। আহমদ মুসা

যখন ওদের দিকে চাইল, দেখল ওদের রিভলবারের দু'টি নলই তাকে লক্ষ্য করে উঠে এসেছে। তখন আহমদ মুসা তার রিভলবার সবে হাতে নিয়েছে মাত্র।

দ্বিতীয়বার বেকায়দায় পড়ল আহমদ মুসা। ওরা দু'জনেই দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। তবে বেশ দূরত্ব ওদের মধ্যে। একজন দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, অন্যজন দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। দু'জনকে গুলী করতে হলে রিভলবার বেশ ঘুরিয়ে নিতে হবে। এই অবস্থায় একজনকে গুলী করার পর আরেকজনকে গুলী করার সুযোগ সে কি পাবে?

বিকল্প হিসেবে তার পুরনো কৌশলের কথা চিন্তা করল। আহমদ মুসা তার চোখ ওদের দিক থেকে সরিয়ে আরও পেছনে তাকিয়ে দ্রুত মাথা নাড়ল যেন ওদের পেছনে দাঁড়ানো কাউকে কিছু বলছে সে। কাজ হলো।

ওরা দু'জনেই চমকে উঠে চকিতের জন্যে পেছন দিকে তাকাল।

সংগে সংগেই আহমদ মুসার রিভলবার বিদ্যুত বেগে উঠে এল এবং পর পর দু'বার গর্জন করে উঠল।

ওদের দু'জনেরই মাথায় গুলী লাগল। ওদিকে ফিরে তাকানো অবস্থাতেই মাটির উপর ছিটকে পড়ল ওদের দেহ।

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে গিয়ে ওদের পকেট সার্চ করল। পেয়ে গেল একজনের পকেটে বাঞ্ছিত বস্তু, ইনফ্রারেড গগলস। এই গগলসটি আহমদ মুসা দিয়েছিল আলীকে। কিন্তু অন্ধকারে দেখার এই গগলস দিয়ে আলী শত্রুদের খুঁজে পায়নি, বরং শত্রুরাই সম্ভবত তাকে প্রথম চিহ্নিত করে। নিশ্চয় এই গগলস দিয়েই এরা আহমদ মুসাকে দূরে থাকতেই চিহ্নিত করেছিল এবং ওঁৎপেতে ছিল। তবু ভাল, ওরা প্রথমেই গুলী করেনি।

গুলীর শব্দ পেয়ে ইসহাক আবদুল্লাহ এবং নোয়ানকো রাস্তার উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে দ্রুত চলে এসেছে রাস্তার এ প্রান্তে। উদ্বেগ, আতংক ফেটে পড়ছে তাদের চোখ-মুখ থেকে।

রাস্তার প্রান্ত দিয়ে ছোট ছোট গাছ-গাছড়া। ইসহাক আবদুল্লাহ ও নোয়ানকো গাছ-গাছড়ার পাশ দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে পেল আহমদ মুসাকে।

উঠে দাঁড়িয়ে তারা ছুটে এল আহমদ মুসার কাছে। বলল ইসহাক আবদুল্লাহ আনন্দের সাথে, আলহামদুলিল্লাহ, অবশিষ্ট দু'একজনকে আপনি শেষ করেছেন। এখন নিশ্চয় আমাদের লুকিয়ে এগুতে হবে না?'

আহমদ মুসা ওদিকে কান দিয়ে বলল, 'ইসহাক, আমাদের আরেক ভাই আলী নিহত হয়েছে।' গম্ভীর কণ্ঠ আহমদ মুসার।

'পাওয়া গেছে তার লাশ? কোথায়?' বলল ইসহাক আবদুল্লাহ।

'লাশ দেখিনি। তবে সে নিহতই হয়েছে।'

বলে আহমদ মুসা হাতের গগলসটা তাদের দেখিয়ে বলল, 'এটা আলীর কাছে ছিল। হত্যার পর নিশ্চয় আলীর কাছ থেকে এটা ওরা পেয়েছে।'

'তাই হবে ভাইয়া।' বলল ইসহাক আবদুল্লাহ।

আহমদ মুসার মুখমন্ডল আরও গম্ভীর হয়ে উঠেছে। বলল, 'আজ যাত্রার শুরুতেই চারজন শহীদের রক্তে স্নাত হলো আমাদের ভুখন্ড।'

'কিন্তু ওদের মারা গেছে তো আমাদের সংখ্যার চেয়ে এগার গুণ বেশী।' বলল ইসহাক আবদুল্লাহ সান্ত্বনার সুরে।

'হ্যাঁ। শত্রুর তুলনায় অংকটা আনন্দিত হবার মত। কিন্তু এই চারজন তাদের পরিবারেই শুধু নয় আমাদের এখানকার এই ছোট্ট সমাজেও ছিল অমূল্য।'

'আল্লাহর ইচ্ছা ভাইয়া। আপনার পরিকল্পনায় কোন ত্রুটি ছিল না।' বলল ইসহাক আবদুল্লাহ।

আহমদ মুসা কোন উত্তর দিল না। সে তাকাল পাশের টিলার মাথার দিকে। বলল, 'চল টিলার উপরটা দেখি। ওখানেই ওরা দু'জন ওঁৎপেতে ছিল।'

বলেই আহমদ মুসা টিলায় উঠতে শুরু করল। ওরাও দু'জন আহমদ মুসার পেছনে পেছনে চলল।

টিলার উপরে জায়গাটা খুব প্রশস্ত নয়। ৪ বর্গগজের বেশি হবে না। শীর্ষটাও ছোট ছোট গাছ-গাছড়ায় ঢাকা।

টিলার মাথার মাঝামাঝি জায়গাটার গাছ-গাছড়াগুলো ছেটে ফেলা। সেখানে একটা তোয়ালে বিছানো।

আহমদ মুসা সেদিকে এগিয়ে গেল। দেখল, তোয়ালের ওপর একটা হ্যাট, একটা টর্চ। তার পাশে একটা সাইড ব্যাগ।

ব্যাগ হাতে তুলে নিল আহমদ মুসা।

ব্যাগ খালি, মাত্র দু'ই শিট পাতলা কাগজ পেল। একটা শীট নীল, অন্যটি লাল।

আহমদ মুসা বুঝতে পারল ষ্টেনগান বহনের জন্যেই ওরা এই ব্যাগ ব্যবহার করেছিল।

কাগজের একটা শিট হাতে তুলে নিল আহমদ মুসা।

শিটটি হাতে তুলে নিতেই কাগজের ভাঁজ থেকে একটা ছোট্ট ইনভেলপ বেরিয়ে পড়ল।

ইনভেলপটি কুড়িয়ে নিল আহমদ মুসা। ইনভেলপটি খুলে ভাঁজ করা ছোট একটা শিট কাগজ পেল। আহমদ মুসা ভাঁজ খুলে চোখের সামনে মেলে ধরল কাগজটি।

পর পর চারটি লাইনের মাত্র ছয়টি শব্দ।

প্রথম লাইনে 'পর্যবেক্ষণ ও খবর সংগ্রহ', দ্বিতীয় লাইনে 'সংকেত', তৃতীয় লাইনে 'ব্রিফিং' এবং চতুর্থ লাইনে 'শুরু' লিখা।

আহমদ মুসার বুঝতে বাকি রইল না যে, যারা এদের নিয়োগ করেছে, তাদের তরফ থেকেই এই চিরকুট। অর্থাৎ যারা অভিযানে আসছে তাদেরই এ ব্রিফিং। কিন্তু ব্রিফিং সবটা খুব স্পষ্ট নয়।

ভাবল আহমদ মুসা এ বিষয়ে।

প্রথম লাইনের বক্তব্য পরিষ্কার। টর্চ ও লাল নীল কাগজ দেখে দ্বিতীয় লাইনের 'সংকেত'-এর অর্থও মাথায় এল। বুঝতে পারল, যারা আসছে তাদেরকে সবুজ বা লাল সংকেত দিতে হবে। কখন, কোন অবস্থায় তা অবশ্য বলা হয়নি। চতুর্থ লাইনের 'শুরু'-এর অর্থ অপারেশন শুরু ধরা যায়, তৃতীয় লাইনের 'ব্রিফিং' দুর্বোধ্য। 'ব্রিফিং' কি অপারেশন শুরুর আগে আলোচনা? আহমদ মুসা এ বিষয়ে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছতে পারল না।

আহমদ মুসা টর্চ হাতে নিয়ে ইসহাক আবদুল্লাহদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যা বুঝলাম এই টর্চ দিয়ে সংকেত দিতে হবে যারা আসছে তাদেরকে। টর্চের মাথায় লাল কাগজ জড়িয়ে লাল সংকেত দেয়ার অর্থ হবে এদিকে বিপদ আছে। আসাটা বিপজ্জনক। আর নীল কাগজ জড়িয়ে নীল সংকেত দেয়ার অর্থ হবে সব ঠিক আছে, আসুন।'

কথাটা শেষ করেই আহমদ মুসা বলল, 'আমার মনে হচ্ছে, এই টিলার আশে-পাশেই কোথাও আলীর লাশ পাওয়া যাবে। ওরা তিনজন এখানেই বসেছিল। এখানে বসেই রাস্তার দিকে নজর রেখেছিল এবং এখান থেকেই তারা সংকেত দিত। উভয় উদ্দেশ্যেই ওরা এই টিলা বেছে নিয়েছিল। আলী এই টিলার আশে-পাশে আসার পর আমার মতই ওদের দ্বারা আক্রান্ত হয়।'

'তাহলে খুঁজে দেখতে হয়।' বলল ইসহাক আবদুল্লাহ।

'চল দেখি।'

আহমদ মুসারা তিনজনই নেমে এল টিলা থেকে।

নিচে নেমে আহমদ মুসা ইসহাক আবদুল্লাহ ও নোয়ানকোকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ইসহাক রাত ১২টা বাজতে যাচ্ছে। এক মূহূর্ত আর নষ্ট করা যাবে না। আমি আলীকে খুঁজছি। তুমি আর নোয়ানকো গ্রামে ফিরে যাও। সব অস্ত্র, সব গোলা-গুলী ও সব মানুষকে নিয়ে এস। তোমার আব্বা আসবেন না। তিনি গ্রামের নারী, শিশু ও অবশিষ্ট লোকদের নিয়ে সজাগ থাকবেন।'

'আমি একা যাই। নোয়ানকো আপনার সাথে থাকুক।' বলল ইসহাক আবদুল্লাহ।

'তোমার একা যাওয়া ঠিক মনে করছি না। আগাম সাবধানতা ভাল।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু আপনি তো একা থাকবেন।' ইসহাক আবদুল্লাহ বলল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'জীবনের অধিকাংশ সময় একাই আমাকে পথ চলতে হয়েছে।'

বলে আহমদ মুসা ইসহাক আবদুল্লাহদের সালাম দিয়ে টিলার পেছন দিক লক্ষ্যে হাঁটা শুরু করল।

ইসহাক আবদুল্লাহ ও নোয়ানকো আহমদ মুসার যাত্রা পথের দিকে মুহূর্ত কয়েক চেয়ে থেকে হাঁটতে শুরু করল গ্রাম লক্ষ্যে।

হাঁটতে হাঁটতে নোয়ানকো বলল, 'আহম আবদুল্লাহ ভাইকে যতই দেখছি, বিস্ময় আর প্রশ্ন বাড়ছে।'

'আমারও।' বলল ইসহাক আবদুল্লাহ।

'আহমদ আবদুল্লাহ নামের একজন মানুষ মাত্র তিনি নন। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় কি জান, কোন ফেরেশতাকে হয়তো আল্লাহ মানুষের রূপ দিয়ে পাঠিয়েছেন আমাদের প্রত্যক্ষ সাহায্যের জন্যে। তা না হলে এত সাহস, বহুমুখী এমন দক্ষতা এবং পরার্থে উৎসর্গীত এমন জীবন হঠাৎ একজন মানুষের মধ্যে কোত্থেকে এল। এমন লোক থাকলে তার নাম অবশ্যই শোনা যেত।' বলল নোয়ানকো।

'নোয়ানকো তুমি সত্যই বলেছ। এই মাত্র যা ঘটল তার কথাই ধরনা! উনি তাঁর নিরাপত্তার কথা ভাবলেন না, ভাবলেন আমাদের নিরাপত্তার কথা।' বলল ইসহাক।

'আর ফেরেশতাই বা তাঁকে বলা যাবে কেমন করে। জর্জের কাছে শুনেছি, মদীনায় তিনি স্ত্রী রেখে এসেছেন। তাই প্রশ্নটা তীব্রতর হচ্ছে, তিনি আসলে কে?' বলল নোয়ানকো।

'আমরা এর কিনারা করতে পারব না। থাক আলোচনা। চল দ্রুত হাঁটি। লোকজনকে নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

দু'জনেই দ্রুত পা চালাল গ্রামের উদ্দেশ্যে।

ঘাটের তিনদিক ঘিরে লোকজনদের বসিয়ে দিয়ে আহমদ মুসা ইসহাক আবদুল্লাহ, নোয়ানকো ও কলিন কামালকে সাথে নিয়ে উঠে এল সেই টিলায়।

আহমদ মুসার ব্যবস্থা অনুসারে ঘাটের পূর্ব দিকে থাকবে নোয়ানকো, মধ্য অঞ্চলে থাকবে কলিন কামাল এবং পশ্চিম ঘাট থেকে আসা যাওয়ার পথ অঞ্চলে থাকবে ইসহাক আবদুল্লাহ।

সম্ভাব্য ঘটনাবলী তাদের সামনে তুলে ধরে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছে সবাইকে আহমদ মুসা।

ইসহাক আবদুল্লাহ, নোয়ানকো ও কামাল প্রত্যেকের সাথে থাকবে ১০জন লোক। সকলেই তারা ষ্টেনগান সজ্জিত।

টিলার মাথায় সবে বসেছে আহমদ মুসা এবং ওরা দু'জন। এ সময় ঘাট থেকে কিছু দূরে অন্ধকার সাগর বক্ষে হঠাৎ জ্বলে উঠল সার্চ লাইটের আলো।

আহমদ মুসাদের তিনজনের চোখই আঠার মত লেগে গেল দৃশ্যটির প্রতি।

সার্চ লাইটের আলো উত্তরমুখী অর্থাৎ ঘাটের দিকে নয়।

আহমদ মুসা বুঝল এটা ক্যামোফ্লেজ। তারা বুঝতে দিতে চায়না যে আলোটা ঘাটে আসছে।

আলোটা তিনবার নিভল, তিনবার জ্বলল। আহমদ মুসার বুঝতে বাকি রইল না যে ওরা সিগন্যাল দিচ্ছে, এবার ওরা সিগন্যাল আশা করছে।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি নীল কাগজ নিয়ে টর্চের মাথা মুড়ে নিল।

ইসহাক আবদুল্লাহ বলে উঠল, 'ভাইয়া, লাল সংকেত দিয়ে ওদের বিদায় দেয়া যায় না?'

আহমদ মুসা ইসহাক আবদুল্লাহর দিকে তাকাল। হাসল। বলল, 'তোমার কি ভয় করছে?'

‘ভয় নয়। ওদের বোকা বানিয়ে বিদায় করা।’ বলল ইসহাক আবদুল্লাহ।

‘বোকা বানিয়ে বিদায় করলে চালাক হয়ে আবার ফিরে আসবে। সেই ফিরে আসাটা আমাদের জন্যে আরও মারাত্মক হতে পারে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ঠিক কথা।’ বলল ইসহাক আবদুল্লাহ।

আহমদ মুসা টর্চ জ্বালিয়ে তিনবার নীল আলোর সংকেত দিল।

আহমদ মুসা নীল সংকেত দেয়ার পর মুহূর্তেই একটা হেড লাইট জ্বলে উঠল। হেড লাইট এগিয়ে আসতে লাগল ঘাটের দিকে।

দশ মিনিটের মধ্যেই হেড লাইটটি ঘাটে এসে পৌছল। তার পাশে জ্বলে উঠল আরও চারটি হেড লাইট।

আহমদ মুসা বুঝল, পাঁচটি বোট এসে নোঙর করেছে ঘাটে।

পাঁচটি হেড লাইটের আলোতে গোটা ঘাট আলোকিত হয়ে উঠেছে। পরে এক সাথেই পাঁচটি হেড লাইট নিভে গেল।

প্রথমে ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢেকে গেল ঘাট। পরে অন্ধকার ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে গেল। চাঁদ না থাকলেও কুয়াশা ও মেঘহীন আকাশের তারার আলো গাছ-গাছড়ার ছায়াহীন ঘাটকে বেশ স্বচ্ছ করে তুলেছে। বোটে মানুষের চলাফেরা বেশ দেখা যাচ্ছে।

আহমদ মুসার চোখে ইনফ্রারেড গগলস। বেশ ক’মিনিট গেল। কোন বোট থেকেই কাউকে নামতে দেখলো না আহমদ মুসা।

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে হলো সংকেতের পর আছে ব্রিফিং। এর অর্থ কি তাহলে এই যে, ওরা ঘাটে আসার পর এদিকের অবস্থা সম্পর্কে ব্রিফিং নেবার পর তারা অভিযান শুরু করবে! তাহলে তাকে তো ঘাটে যেতে হবে।

ঠিক এই সময়েই ঘাট থেকে হ্যান্ড মাইকের অনুচ্চ শব্দ ভেসে এল। বলা হলো, ‘মিঃ ওবোটে মাইকেল, আপনি তাড়াতাড়ি আসুন। আমরা দেরী করতে চাই না।’

আহ্বান শোনার সাথে সাথে আহমদ মুসা বলল, ‘বুঝা গেছে, অভিযান শুরুর আগে ওরা ব্রিফিং এর অপেক্ষায় আছে। সুতরাং আমাকে ওখানে যেতে হবে।’

‘আপনি তো ওবোটে মাইকেল নন, আপনি যাবেন কি করে? বলল কলিন কামাল।

‘আমি তো ওবোটে মাইকেল এর জায়গায় অভিনয় করছি।’

‘সেটা তো অভিনয়। আপনি গেলেই ধরা পড়ে যাবেন।’ বলল নোয়ানকো।

‘কিন্তু সম্ভবত ওরা ওবোটে মাইকেলের ব্রিফিং না পেলে অভিযানেই নামবে না।’

‘তাতে আমাদের তো ক্ষতি নেই।’ বলল ইসহাক আবদুল্লাহ।

‘অভিযানে নামবে না অর্থ অভিযান করবে না, সেটা নয়। তারা আরও কোন একটা বিপজ্জনক পথ বেছে নিয়ে এগুতে পারে। সুযোগ তাদের না দিয়ে আমরা চাই আমাদের পরিকল্পনার আওতার মধ্যে এনে শত্রুদের বিনাশ করতে। ওদের চলে যাবার সুযোগ দিতে চাই না।’

‘সেটা অন্যভাবে হয় না? আমরা এখন ওদের আক্রমণ করতে পারি না?’ বলল ইসহাক আবদুল্লাহ।

‘আক্রমণের আগে ওদের সবাইকে পাঁচটি বোট থেকে মাটিতে নামাতে হবে। বোটে থাকলে বেশির ভাগ পালিয়ে যাবার সুযোগ পাবে। এ সুযোগ আমরা কাউকেই দিতে চাই না।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আপনি গেলেই কি ওরা নামবে? আপনাকে চিনে ফেললে তো উল্টো ঘটবে।’

‘তা ঘটতে পারে। ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই। আমার ধারণা, আমাকে যেতে দেখলেই ওরা ওদের বাহিনীকে ঘাটে নামাবে এবং অভিযানের প্রস্তুতি নেবে। ব্রিফিং পাওয়ার পর কিভাবে কোনদিকে যাত্রা শুরু করবে তা ঠিক করবে।’

‘বুঝলাম, কিন্তু আপনি ওখানে গেলেই তো ধরা পড়বেন।’ বলল নোয়ানকো উদ্বিগ্ন কণ্ঠে।

‘ধরা পড়ার ঝুঁকি অবশ্যই আছে। কিন্তু এমনও হতে পারে, আমি ব্রিফিং-এর জন্যে ওদের বোটে উঠার পর শত্রুদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলার সুযোগ আমাদের হবে।’

‘কিভাবে?’ বলল ইসহাক আবদুল্লাহ।

নোয়ানকো থাকছে পূর্ব দিকে। কলিন কামাল থাকছে মধ্য অঞ্চলে অর্থাৎ উত্তরে, ইসহাক আবদুল্লাহ থাকছে পশ্চিমে এবং দক্ষিণে।’

আহমদ মুসা থামতেই নোয়ানকো কিছু বলতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা তাকে বাধা দিয়ে বলল, ‘আর কোন কথা নয়। দেরী হয়ে যাচ্ছে। আমি উঠলাম।’

বলে আহমদ মুসা মাটিতে তোয়ালের উপর পড়ে থাকা হ্যাটটা তুলে মাথায় নিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, তোমরা যে যার জায়গায় চলে যাও। ঘাট থেকে যখন গুলী বর্ষণের শব্দ পাবে, তখন পরিকল্পনা অনুসারে তোমরা আক্রমণ শুরু করবে। আর আমি ঘাটে পৌছার পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যে যদি ওদিক থেকে গুলীর শব্দ না পাও, তাহলে তোমরাই পরিকল্পনা অনুসারে আক্রমণ শুরু করবে এবং নিজেদের বুদ্ধিবিবেক অনুসারে কাজ করবে।’

‘ওদিক থেকে গুলীর শব্দ না পাবার অর্থ?’ শুকনো কণ্ঠে প্রশ্ন করল ইসহাক আবদুল্লাহ।

‘আমি যদি বন্দী হয়ে যাই বিনা যুদ্ধে তাহলে গুলীর শব্দ পাবে কি করে/’

বলেই আহমদ মুসা ওদের আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সকলকে সালাম জানিয়ে টিলা থেকে ঘাটের উদ্দেশ্যে নামতে শুরু করল।

আর ইসহাক আবদুল্লাহ, কলিন কামাল ও নোয়ানকো হতবুদ্ধি হবার মত নির্বাক হয়ে আহমদ মুসার গমন পথের দিকে চেয়ে রইল।

এক সময় ঠোঁট ফেড়ে কথা বেরুল ইসহাক আবদুল্লাহ। বলল, ‘একজন মানুষ কত বড় হলে এভাবে পরার্থে নিজেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে।’ আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল ইসহাক আবদুল্লাহর।

‘না উনি মানুষ নন ইসহাক ভাই, আল্লাহ নিশ্চয় আমাদের সাহায্যের জন্যে ফেরেশতা পাঠিয়েছেন।’ কথা বলতে বলতে চোখ মুছল নোয়ানকো।

কলিন কামাল কিছু বলতে যাচ্ছিল। ইসহাক আবদুল্লাহ বাধা দিয়ে বলল, ভাইয়েরা, আর কোন কথা নয়। চলুন আমরা তাঁর আদেশ পালন করি। যে যার নির্দিষ্ট জায়গায় চলে যাই। আর যাবার আগে এসো আমাদের তিনজনের ৬ হাত একত্র করে আল্লাহর নামে শপথ করি, আমাদের ভাই আহমদ আবদুল্লাহ যেমন

মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়ে পেছনে ফিরে তাকাননি, তেমনি আমরা আমাদের একজন বেঁচে থাকা পর্যন্ত লড়াই করে যাব, পরাজয় নিয়ে কেউ ঘরে ফিরবো না।

তারা ছয় হাত একত্র করে শপথ গ্রহণ করল।

তাদের তিনজনের চোখ থেকেই অশ্রু গড়াচ্ছিল। তাদের চোখে মুখে অপার্থিক এক আলো। নতুন মানুষ যেন তারা।

'ঐ যে ওবোটে মাইকেল আসছে।' উচ্ছসিত কণ্ঠে বলল জন ব্ল্যাংক।

জন ব্ল্যাংক তার কমান্ড বোটের ডেক কেবিনে বসে উন্মুক্ত দরজা দিয়ে তাকিয়েছিল ঘাট থেকে যে পথটা চলে গেছে দ্বীপের অভ্যন্তরে সে পথের দিকে।

পাঁচ বোটের শতাধিকে লোক নিয়ে যে অপারেশন টিম সাউথ টার্কো দ্বীপে অভিযানে এসেছে জন ব্ল্যাংক তার অধিনায়ক।

জন ব্ল্যাংকের পাশেই আরেকটা চেয়ারে বসেছিল জিম টেইলর।

জন ব্ল্যাংকের কথা শেষ হতেই জিম টেইলর বলল, 'কি দেখে বুঝলেন ওবোটে মাইকেল আসছে, ঐ নীল টর্চের আলো?'

'হ্যাঁ তাই। ঐ নীল টর্চই আমাদের কূলে আসার সবুজ সংকেত দিয়েছে।'

'পাশের বোট থেকে রবার্ট ফুটকে ডাকলে ভালো হয় না। ওবোটে মাইকেলদেরকে তো তার মাধ্যমেই এই এ্যাসাইনমেন্ট দেয়া হয়েছিল।' বলল জিম টেইলর।

'হ্যাঁ তাকে ডাক। সেও তো এই টার্কস দ্বীপপুঞ্জের লোক। ব্রিফিং-এর সাথে সাথে আলোচনাও সেরে নেয়া যাবে।'

জিম টেইলর চেয়ার থেকে উঠে ডেক কেবিন থেকে ডেকে বেরিয়ে গেল।

কমান্ড বোটের গায়ের সাথে গা লাগিয়ে দু'পাশে দু'টি করে চারটি বোট নোঙর করা।

পাশের প্রথম বোটেই ছিল রবার্ট ফুট।

দু'মিনিটের মধ্যেই জিম টেইলর রবার্ট ফুটকে ডেকে নিয়ে কেবিনে প্রবেশ করল।

তারা কেবিনে ঢুকতেই জন ব্ল্যাংক জিমকে লক্ষ্য করে বলল, 'জিম তুমি আমাদের সকল বোটের সবাইকে নির্দেশ দাও আর্মস-এ্যমুনিশন নিয়ে এখনি ঘাটে নামতে। ওবোটে মাইকেলের সাথে কথা বলার পর আমরা আর এক মিনিটও অপেক্ষা করবো না। যাও, কুইক।'

জিম ডেকে বেরিয়ে দেখল, ওবোটে মাইকেল তখনও ঘাট থেকে বেশ খানিকটা দূরে।

সে বোটগুলোর ক্যাপ্টেনদের ডেকে নির্দেশ জারি করল, 'এখনি তোমরা তোমাদের লোক ও সকল আর্মস-এ্যামুনিশনসহ ঘাটে নেমে যাও এবং ফরমেশন নিয়ে দাঁড়াও।'

হুকুম জারির দু'মিনিটের মধ্যে পাঁচটি বোটের শতাধিক লোক অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ঘাটে নেমে ফরমেশন নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

জেটির পরেই ইট-পাথর বিছানো একটা ছোট্ট চত্বর। জেলেরা বোট থেকে মাছ ও মালপত্র নামিয়ে প্রথমে এখানেই জমা করে, অনেক সময় ভাগ-বাটোয়ারা করে। গাড়িও এসে এখানেই দাঁড়ায়। এই চত্বর থেকেই একটা রাস্ত বেরিয়ে গেছে দ্বীপের অভ্যন্তরে।

এই চত্বরের উপরে ঘাসে ঢাকা অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। বোট থেকে নেমে সবাই সেই ফাঁকা জায়গাতেই শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছে।

এই ফাঁকা জায়গার পর আগাছা ও ছোট ছোট গাছ-গাছালীতে পূর্ণ এবড়ো-থেবড়ো এলাকা শুরু হয়েছে।

নির্দেশ দিয়ে এসে জিম টেইলর জন ব্ল্যাংকের পাশে এসে বসল। জন ব্ল্যাংকের অন্যপাশে বসেছে রবার্ট ফুট।

'ওবোটে মাইকেল এসেছে।' বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল জন ব্ল্যাংক।

কথা শেষ করেই আবার বলল, 'জিম যাও তাকে এই কেবিনে নিয়ে এস।'

জিম কেবিন থেকে বেরিয়ে কেবিনের দরজায় একপাশে দাঁড়িয়ে জন ব্ল্যাংকের পারসোনাল গার্ড জনকে ঘাটের দিকে এগিয়ে ওবোটে মাইকেলকে দেখিয়ে বলল, 'ওঁকে এই বোটে নিয়ে এস।'

গার্ড বোট থেকে নেমে কিছুটা এগিয়ে ওবোটে মাইকেলের মুখোমুখি হয়ে বলল, 'মিঃ ওবোটে আসুন। মিঃ জন ব্ল্যাংক ঐ বোটে আছেন।'

মিঃ ওবোটের মাথার হ্যাটটা তার কপাল পর্যন্ত নেমে এসেছে। ফলে মুখের অবয়বটা স্পষ্ট নয়।

'সিওর।' মাত্র এই শব্দটা উচ্চারণ করে ওবোটে বোটের দিকে যাত্রা শুরু করল। পেছনে গার্ড।

বোটের ডেকে দাঁড়িয়ে ছিল জিম টেইলর।

ওবোটে বোটে উঠল। গার্ড বোটের নিচে জেটিতেই দাঁড়িয়ে থাকল। ডেক থেকে ওবোটেকে ভেতরে নিয়ে যাবার দায়িত্ব জিম টেইলরের।

জিম টেইলর ওবোটের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'ওয়েলকাম মিঃ ওবোটে। চলুন, মিঃ ব্ল্যাংক আপনার অপেক্ষা করছেন।

'ধন্যবাদ।' বলে ওবোটে কেবিনের দিকে পা বাড়াবার আগে পেছন ফিরে চারদিকটা একবার দেখল। দেখল সে বোটের গলুই-এর কাছে জেটিতে দাঁড়ানো গার্ডকেও।

ওবোটে কেবিনে প্রবেশ করল।

জিম টেইলর আগেই প্রবেশ করেছিল। সে গিয়ে বসেছিল তার চেয়ারে।

ওবোটে বেশধারী আহমদ মুসা কেবিনে প্রবেশ করে কপাল পর্যন্ত নেমে যাওয়া হ্যাট কপালের উপরে তুলে দিল।

জন ব্ল্যাংক, জিম টেইলর এবং রবার্ট ফুট আহমদ মুসার মুখের দিকে তাকিয়ে ভুত দেখার মত চমকে উঠেছিল। একজন কৃষ্ণাংগ টার্কসবাসীর বদলে দেখছে একজন কালার্ড এশিয়ানকে!

তারা তাদের বিমূঢ় ভাব কাটিয়ে উঠার আগেই আহমদ মুসা কাঁধের ষ্টেনগান হাতে নিয়ে তাদের দিকে তাক করে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন আমি আপনাদের ওবোটে নই।'

বলেই ষ্টেনগানের ট্রিগারে হাত চেপে ওদের দিকে চেয়ে কঠোর কণ্ঠে বলল, 'তোমাদের আজকের খেলাটা শেষ। বেঘোরে জীবন দিতে না চাইলে তোমরা অস্ত্র ফেলে দাও, তোমাদের লোকদের অস্ত্র ফেলে দিতে বল এবং আত্মসমর্পণ.......।'

আহমদ মুসার কথা শেষ হতে পারল না। একটা আঘাত এসে পড়ল মাথায়।

আহমদ মুসা টের পায়নি যে, গার্ড জনকে সে বোটের নিচে গলূই-এর কাছে দেখে এসেছিল, আহমদ মুসা ও জিম টেইলর কেবিনে ঢোকার পর সে বোটে উঠে এসে কেবিনের দরজার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। কেবিনের দরজা বন্ধ না থাকায় আহমদ মুসার সব কথাই সে শুনতে পেয়েছিল। সে বিপদটা আঁচ করতে পেরে বিড়ালের মত নিঃশব্দে আহমদ মুসার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল এবং ষ্টেনগানের বাঁট দিয়ে আঘাত করেছিল আহমদ মুসার মাথায়।

ষ্টেনগানের বাঁটের বাড়িটা আহমদ মুসার ঠিকই লাগল। তবে কেবিনের ছাদটা নিচু হওয়ায় ষ্টেনগানের বাঁট ছাদে একটা বাড়ি খেয়ে তারপর আহমদ মুসার মাথায় গিয়ে আঘাত করে।

সুতরাং আঘাতটা যতটা ভয়াবহ হবার কথা তা হলো না। কিন্তু দেখা গেল আহমদ মুসা মাথায় আঘাত খাওয়ার সংগে সংগেই টলে উঠে একটা পাক খেয়ে কাত হয়ে পড়ে গেল কেবিনের মেঝেয়। ডান হাত থেকে তার ষ্টেনগান খসে পড়েছিল।

ওরা তিনজনই চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

'ধন্যবাদ জন, তুমি ঠিক সময়ে এসে পড়েছিলে।' বলল জন ব্ল্যাংক।

একটু থেকে ক্রুদ্ধ চোখে আহমদ মুসার দিকে চেয়ে সে বলল, 'এই তাহলে সেই শয়তান এশিয়ান যার কথা তোমরা এত বলেছ। তাই না রবার্ট ফুট।'

রবার্ট ফুট কথা বলতে যাচ্ছিল। সে কথা বলার আগেই জন ব্ল্যাংক আবার বলল, 'জন তাড়াতাড়ি ওকে সার্চ কর। জ্ঞান ফেরার আগেই ওকে বেঁধে ফেল। ওর জ্ঞান ফেরা পর্যন্ত অভিযান শুরু করা যাচ্ছে না। তার কাছ থেকে কথা বের করতে হবে তারা কি জেনেছে, কতটা জেনেছে।'

আহমদ মুসার দেহটা পড়েছিল বোটের আড়াআড়ি এবং জনের বিপরীত দিকে অর্থাৎ জন ব্ল্যাংকের দিকে কাত হয়ে।

নির্দেশ পেয়ে জন ব্ল্যাংক আহমদ মুসার পেছন দিকটা ঘুরে আহমদ মুসার সামনের দিকে এগিয়ে সবে কোমর বরাবর পৌছেছে।

চোখের পলকে এই সময় আহমদ মুসার দু'টি পা বিদ্যুত বেগে উঠে এসে জনের গলা সাঁড়াশির মত চেপে ধরে তাকে আছড়ে ফেলল কেবিনের মেঝেতে। সেই সাথে কোটের পকেটের উপর পড়ে থাকা আহমদ মুসার বাম হাত পকেট থেকে রিভলবার বের করে তিনজনকে লক্ষ্য করে তিনটি গুলী ছুঁড়ল পর পর।

ওরা তিনজন কিছু বুঝে উঠার আগেই গুলী খেয়ে ঢলে পড়ে গেল মেঝের উপর।

ওদিকে জন আহমদ মুসার দু'পায়ের সাঁড়াশিতে বন্দী হয়ে মেঝেতে আছড়ে পড়েও তার ডান হাত দিয়ে যখন সঁড়াশির চাপ ঢিলা করার চেষ্টা করছে, বাম হাত দিয়ে তখন সে বেল্টে গুজে রাখা রিভলবার বের করে আহমদ মুসার বুক অথবা মাথা তাক করার চেষ্টা করছে।

তিনজনকে গুলী করেই আহমদ মুসা মনোযোগ দিয়েছিল জনের দিকে। সে দেখতে পেল জনের কসরত। আহমদ মুসা সময় নষ্ট করল না। চতুর্থ গুলী করল জনকে লক্ষ্য করে।

জন একেবারে বুকে গুলী বিদ্ধ হলো।

আহমদ মুসা উঠে বসল। ভাবছিল সে, নিশ্চয় ওদের লোকেরা বোটের কেবিনে গুলীর শব্দ শুনে এদিকে ছুটে আসছে।

আহমদ মুসা উঠে বসেই ছিটকে পড়া ষ্টেনগানটা টেনে নিল কাছে।

উঠে দাঁড়াচ্ছে আহমদ মুসা। এ সময়ই ঘাটের তিন দিক থেকে প্রায় এক সাথেই অনেকগুলো ষ্টেনগান গর্জে উঠল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়েছে। তার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। এদিকে গুলীর শব্দ শুনে এরা এদিকে আসার আগেই গুলীর শব্দ পাওয়ার সাথে সাথে আহমদ মুসার লোকেরা আক্রমণ শুরু করেছে।

এদিক থেকেও গুলী বর্ষণ শুরু হয়েছে। তখন গুলী বৃষ্টির পালা চলছিল।

আহমদ মুসা কেবির দরজায় উঁকি দিল। দেখল, ডজনখানেক লোক ছুটে আসছে কেবিনের দিকে। তাদের হাতে উদ্যত ষ্টেনগান। তারা মুখ দিয়ে চিৎকার করছে, 'স্যার, এখানে কি ঘটেছে? আপনারা আসুন। হুকুম দিন, তিনদিক থেকেই শত্রু আক্রমণ করেছে।'

আহমদ মুসা কেবিনের দরজায় এসে চিৎকার করে বলল, 'হুকুম দেবার মত তোমাদের নেতারা কেউ বেঁচে নেই। তোমরা অস্ত্র ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ কর।'

আহমদ মুসার কণ্ঠস্বর শোনার সাথে সাথে ওদের ডজনখানেক ষ্টেনগান নড়ে উঠল। আহমদ মুসা এর জন্যে তৈরিই ছিল। নিজের শেষ কণ্ঠস্বর বাতাসে মেলাবার আগেই তার ষ্টেনগান অগ্নি বৃষ্টি করল। এক ঝাঁক গুলী গিয়ে ওদের জড়িয়ে ধরল।

এদের পরিণতি দেখে বোটের দিকে আসার চেষ্টা আর কেউ করল না। তবু আহমদ মুসা তার গুলী অব্যাহত রাখল যাতে ওরা এদিকে আক্রমণে আসার বা পিছু হটে পালাবার কোন সুযোগ না পায়।

প্রায় পনের মিনিট গুলী চলার পর গুলী থেমে গেল। বোটের সামনে ঘাটের উপরে উন্মুক্ত জায়গা টুকুতে তখন লাশ আর লাশ। কেউ বাঁচেনি। চারদিক থেকে আক্রান্ত হওয়ায় কেউ পালাতেও পারেনি।

ইসহাক আবদুল্লাহর দল, কলিন কামালের দল এবং নোয়ানকোর দল প্রায় এক সাথেই ছুটে এল বোটের দিকে আহমদ মুসার কাছে।

ইসহাক, কলিন কামাল ও নোয়ানকো এসে আহমদ মুসাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। বলল, 'আল্লাহ আমাদের বিজয় দিয়েছেন। আপনি ভাল আছেন তো?'

আহমদ মুসা বলল, 'আমি ভাল আছি। তোমরা সবাই ভাল তো? আমাদের লোকদের কি অবস্থা?'

'মাত্র তিনজন আহত। তাছাড়া সবাই ভাল।' বলল ইসহাক আবদুল্লাহ।

'আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করেছেন।' আহমদ মুসা বলল।

‘প্রথমে এদিক থেকে চারটা গুলীর শব্দ পাওয়া গেছে। কি ঘটেছিল?’ বলল নোয়ানকো।

‘দেখবে ভেতরে এস।’

বলে আহমদ মুসা বোটের কেবিনের দিকে চলতে শুরু করল।

আহমদ মুসার সাথে ইসহাক আবদুল্লাহ, কলিন কামাল ও নোয়ানকো প্রবেশ করল কেবিনে।

কেবিনে পড়ে থাকা চারটি লাশের দিকে চোখ পড়তেই ইসহাক আবদুল্লাহ বলে উঠল, ‘তাহলে এই চারজনকে গুলী করার শব্দ আমরা পেয়েছিলাম?’

ইসহাক টর্চ জ্বেলে লাশগুলো দেখছিল।

‘হ্যাঁ। এই চারজনের ঐ তিনজন হলো নেতা। আর এ ছিল শীর্ষ নেতার ব্যক্তিগত গার্ড।’ লাশগুলোর দিকে ইংগিত করে বলল আহমদ মুসা।

‘তাহলে নেতা নেতাদের মেরেছেন কর্মীরা কর্মীদের মেরেছে।’ বলল নোয়ানকো।

‘না নোয়ানকো, তুমি খেয়াল করনি, কর্মীদের যারাই যখন বোটের দিকে আসার চেষ্টা করেছে, তারা মারা পড়েছে আহমদ আবদুল্লাহ ভাইয়ের হাতে। তিনি পেছন দিক থেকে এভাবে পাহারা না দিলে হয়তো শত্রুদের বেশির ভাগই পালিয়ে যেত। এখন সংবাদ পৌছাবার মত একজনও পালাতে পারেনি।’

‘আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি যে, আহমদ আবদুল্লাহ ভাই বোটে নেতাদের কাছে আসার দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন।’ বলল কলিন কামাল।

ইসহাক আবদুল্লাহ টর্চের আলো ঘুরাতে গিয়ে হঠাৎ চোখ পড়ল আহমদ মুসার মুখে। আহমদ মুসার মাথা ও মুখের ডান পাশ রক্তাক্ত দেখে আঁৎকে উঠল ইসহাক আবদুল্লাহ। বলল, ‘একি, আহমদ আবদুল্লাহ ভাই আপনি তো আহত!’

ইসহাক আবদুল্লাহর কথার সাথে সাথেই অন্য দু’জনও ঝুকে পড়ল আহমদ মুসার দিকে।

‘আপনার কি গুলী লেগেছে আহমদ আবদুল্লাহ ভাই?’

‘তোমরা ব্যস্ত হয়ো না। গুলী লাগেনি। পেছন থেকে ঐ গার্ড চুপি চুপি এসে ষ্টেনগানের বাঁট দিয়ে মাথায় আঘাত করেছিল। মাথার ডান পাশের কিছুটা থেঁথলে গেছে।’

বলে ঘুরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, ‘চল বাইরে, অনেক কাজ আছে।’

আহমদ মুসা বেরিয়ে এল। তার সাথে ওরা তিনজনও।

‘অন্তত ফাষ্ট এইড আপনার এখনি নেয়া দরকার।’ বলল কলিন কামাল।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘ঠিক আছে ডাঃ কলিন কামাল, প্রথম কাজটা সেরে নেই। তারপর তোমার ডাক্তারী বিদ্যা প্রদর্শনের সুযোগ দেব।’

বলে একটু থেমেই আহমদ মুসা ইসহাক আবদুল্লাহর দিকে চেয়ে বলল, ‘কয়েকটা জরুরী কাজ করতে হবে। এক. ওদের সমস্ত লাশ বোটে তুলে গভীর সাগরে ফেলে দিয়ে আসতে হবে। দুই. ঘাটের সব রক্ত ধুয়ে-মুছে সাফ করে ফেলতে হবে রাতের মধ্যেই। তিন. আগের তিনটি বোটের মত এ পাঁচটি বোটকেও আমাদের সেবু নদীতে ডুবিয়ে রাখতে হবে। চার. ভোর রাতেই থানায় গিয়ে ডায়েরী করতে হবে, কয়েকটি বোটে করে ডাকাত এসেছিল। আমাদের চারজন লোককে খুন ও তিনজনকে আহত করেছে। তারপর গ্রামবাসী জেগে উঠে একযোগে ধাওয়া করলে ওরা পালিয়ে গেছে। ইদানিং এই ধরনের ডাকাতের আনাগোন বেড়ে গেছে। ওকারী গ্রাম বা ওকারী ঘাট এলাকায় পুলিশ ফাঁড়ি বা রাত্রিকালীন পাহারা চাই। পাঁচ. কিছু পয়সা খরচ করে হলেও খবরের কাগজে ডাকাতের হানা, চারজন নিহত ও তিনজন আহত হওয়ার খবর ভালো করে প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এই নিউজে এই এলাকার জন্যে স্বতন্ত্র পুলিশ ফাঁড়ি ও সার্বক্ষণিক পুলিশ পাহারা দাবী করতে হবে। ছয়. এদের কাছ থেকে পাওয়অ শতখানেক ষ্টেনগান, শতখানেক রিভলবার, বিপুল গোলাবারুদ এই রাতেই লুকিয়ে ফেলতে হবে এবং ঔষধগুলো আমারে ষ্টোরে জমা করতে হবে। সাত. আজকের এই খবর সিডি কাকেম গ্রামে এখনি পৌছতে হবে এবং জর্জকে আসতে বলতে হবে সকালের মধ্যেই। আট. অবিলম্বে আরও দু’শ যুবককে যুদ্ধ ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য বিভিন্ন দ্বীপ থেকে আস্থাভাজন দু’শ যুবক সংগ্রহ করতে হবে। নয়. আরও কয়েকটি দ্বীপে অন্তত ভিজকায়া মামুন্ড

এবং গ্রান্ড টার্কস দ্বীপে আমাদের নতুন ঘাঁটি গড়ে তুলতে হবে। প্রধান ঘাঁটি এখানেই থাকবে। দশ. এ পর্যন্ত প্রাপ্ত ৮টি মোটর বোট সমন্বয়ে একটা নৌবহর আমাদের থাকবে। এগুলোর জন্যে তেল ও প্রয়োজনীয় সবকিছু প্রস্তুত রাখতে হবে। যে কোন জরুরী মুহূর্তে যাতে এগুলো কাজে লাগানো যায়। এগার. আমাদের এ দ্বীপের খৃষ্টান ও অন্যধর্মী অধ্যুসিত উত্তরাংশের উপর নজর রাখা এবং অন্যান্য দ্বীপ থেকে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহের জন্য একটা গোয়েন্দা ইউনিট গঠন করতে হবে।' দীর্ঘ বক্তব্যের পর থামল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা থামতেই আনন্দে চিৎকার করে উঠল ইসহাক আবদুল্লাহ ও কলিন কামাল। তারা বলল, 'আজকের এই ঘটনার পর মহাকিছু ঘটাতে পারে শত্রুরা, এ নিয়ে আমরা আনন্দের মধ্যেও উদ্বিগ্ন ছিলাম। আপনার এই পরিকল্পনা তার জবাব দিয়েছে, যা আমরা আশা করছিলাম, তার চেয়েও অনেক বেশি। জিন্দাবাদ, আহমদ আবদুল্লাহ ভাই জিন্দাবাদ। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আপনাকে এই জ্ঞান দিয়েছেন এবং আমাদের মধ্যে দয়া করে পাঠিয়েছেন।'

শেষের কথাগুলো তাদের আবেগে ভারি হয়ে উঠল।

আহমদ মুসা এসব কথার দিকে কান না দিয়ে বলল, 'নোয়ানকো তুমি একজন কাউকে সাথে নিয়ে গ্রামে যাও। লোকদেরকে এখানে পাঠিয়ে তুমি যাবে সিডি কাকেম গ্রামে। আর ইসহাক আবদুল্লাহ তুমি থানার জন্যে এফ আই আর লিখতে বস। আর ডাঃ কলিন তুমি দেখ আহতরা কি অবস্থায় আছে।'

কথা শেষ করে আহমদ মুসা বোটের সামনে চত্বরে দন্ডায়মান সাথীদের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। বলল, 'বিজয়ী সাথী ভাইরা, তোমাদের মোবারকবা। আল্লাহ তোমাদের একটা বড় বিজয় দিয়েছেন। বিজয়ের কৃতিত্ব তোমাদের। তোমাদের যা আছে তাই নিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে দাঁড়িয়েছ এবং যা সাধ্য তোমাদের, তা করেছ। এ জন্যেই আল্লাহ তোমাদের বিজয় দিয়েছেন। আমরা আনন্দিত হবো, কিন্তু গর্বিত হবো না, অলস হবো না। শত্রুদের পরাজয় শুরু হয়েছে বটে, কিন্তু অনেক দীর্ঘ পথ আমাদের পাড়ি দিতে হবে। তোমাদেরকে আরও সতর্ক, আরও দক্ষ, আরও কুশলী হতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে আরও বড় বিজয় দেবেন।' থামল আহমদ মুসা।

সামনের ওরা সমস্বরে ধ্বনি দিল, 'আল্লাহু আকবর।'

ওদের একজন দাঁড়িয়ে থাকা সারি থেকে দু'ধাপ এগিয়ে এল। বলল, 'নিপীড়ন, পরাজয়, আত্মসমর্পণ এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াকে যখন আমরা আমাদের ভাগ্য লেখা হিসেবে ধরে নিয়েছিলাম, তখন আপনার আগমন আমাদের নতুন জীবন দিয়েছে। আপনার উসিলায় আমরা পরাজয়ের জায়গায় বিজয় পেতে শুরু করেছি। আল্লাহর অসীম দয়া হিসেবে আপনাকে আমরা পেয়েছি। আপনি যে নির্দেশ আমাদের দেবেন, সে নির্দেশ আমরা পালন করব, জীবনের বিনিময়ে হলেও।'

'আলহামদুলিল্লাহ। ধন্যবাদ ভাইয়েরা। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।'

বলে আহমদ মুসা তাকাল ইসহাক আবদুল্লাহর দিকে। দেখল, নোয়ানকো গ্রামে যাবার জন্যে তৈরি হয়েছে। নেমে গেছে বোট থেকে।

'খসড়ার জন্যে কাগজ তো দরকার। আমার কাছে কাগজ তো নেই।' আহমদ মুসা তাদের দিকে মনোযোগ দিতেই বলে উঠল ইসহাক আবদুল্লাহ।

আহমদ মুসা তার পিঠে ঝুলানো ব্যাগের দিকে ইংগিত করে বলল, ব্যাগের পকেটে দেখ তোমার প্রয়োজন মত কাগজ পাবে।'

কাগজ নিয়ে নিল ইসহাক আবদুল্লাহ।

এবার এগিয়ে এল কলিন কামাল আহমদ মুসার দিকে।

'ডাঃ কলিন তুমি আগে অন্য আহতদের প্রয়োজনটা সেরে এসো।'

'ওদের ব্যবস্থা আগেই করেছি। ওদের আঘাতগুলেঅ অপারেশনের মত গুরুতর নয়।' বলল কলিন কামাল।

'ধন্যবাদ।' বলে আহমদ মুসা বসল ফাষ্ট এইড নেবার জন্যে।

বাহামার সানসালভাদর।

কলম্বাস বন্দরে হোয়াইট ঈগলের সেই অফিস সংলগ্ন একটা সুন্দর বাড়ি। বাড়ির ড্রইং রুম।

সোফায় বসে আছে মাঝ বয়সের রাশভারি একজন আমেরিকান।

চেহারায় কাঠিন্য। চোখ ঠান্ডা। বিরাট শরীর।

এই ব্যক্তিটিই আমেরিকান কন্টিনেন্ট হোয়াইট ঈগল-এর চীফ। নাম ডেভিড গোল্ড ওয়াটার।

তার চোখে-মুখে কিছুটা অস্থিরতা। কারও যেন অপেক্ষা করছে সে।

এই সময় অনেকটা ঝড়ের বেগেই প্রবেশ করল ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের হোয়াইট ঈগল-এর প্রধান জি,জে, ফার্ডিন্যান্ড।

ঢুকে সম্ভাষণ বিনিময়ের পর সোফায় বসতে বসতে দ্রুত কণ্ঠে বলল, 'আপনি এসেছেন শুনে প্রথমে আমার বিশ্বাস হয়নি। এভাবে তো আপনি আসেন না। কোত্থেকে, কিভাবে বলুন, কেমন আছেন আপনি?' এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে চুপ করল ফার্ডিন্যান্ড।

'সত্যিই আমিও ভাবিনি আসব। আমার ফ্লাইট সিডিউল ছিল সোজা প্রিটোরিয়া (দক্ষিণ আফ্রিকা) থেকে ওয়াশিংটন। বিমান বন্দরে এসে শুনলাম সানসালভাদরের নতুন আন্তর্জাতিক বিমান বন্দ 'কলম্বাস'-এ বিমানটি সৌজন্য অবতরণ করবে। সুযোগ পেয়ে আমি টিকিট চেঞ্জ করলাম। ঠিক করলাম কয়েক ঘণ্টা সানসালভাদরে কাটিয়ে পরে মিয়ামী হয়ে ওয়াশিংটন যাব।' একটু থামল।

একটা হ্যাভানা চুরুট ধরিয়ে মুখে পুরে বলল, 'তোমার সাথে বেশ অনেক দিন দেখা নেই। ভাবলাম তোমাদের কিছু খবর নিয়ে যাই। নতুন ডেমোগ্রাফিক রিষ্ট্রাকচার প্রোগ্রামে মুসলিম জনসংখ্যা বিলোপ কর্মসূচী এখানে কতদূর এগুলো সরেজমিন জানতে পারলে ভালই লাগবে।' থামল ডেভিড গোল্ড ওয়াটার।

'ধন্যবাদ। অগ্রগতি উৎসাহব্যঞ্জক। বলা যায় আশার চেয়ে বেশি। চলতি বছর মুসলিম পুরুষ শিশুর মৃত্যুর হার ২৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এই অগ্রগতি রাখতে পারলে, আগামী দশ বছরের মধ্যে ১৫ বছর পর্যন্ত মুসলিম বালকের সংখ্যা প্রায় শূন্যের কোঠায় চলে যাবে। পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের মুসলিম মেয়েরা বিয়ের জন্যে মুসলিম যুবক খুঁজে পাবে না। পরবর্তী

পাঁচ বছরের মধ্যে শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ মুসলিম মেয়ের বিয়ে হবে খৃষ্টান অথবা অন্য কোন ধর্মের ছেলের সাথে। এর বছর দুয়েকের মধ্যে কোন মুসলিম শিশু খুঁজে পাওয়া যাবে না ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে। তারপর দুই তিন দশকের মধ্যে এই দ্বীপপুঞ্জে মুসলিম জনসংখ্যা শূন্যের কোঠায় নেমে যাবে।'

'ব্রাভো! ব্রাভো! ফার্ডিন্যান্ড। যদি তা হয় তাহলে বলে দিচ্ছি, নোবল পিস প্রাইজ তুমি পেয়ে যাবে।' বলল গোল্ড ওয়াটার।

'নোবেল পিস প্রাইজ? কেমন করে?' বলল ফার্ডিন্যান্ড।

'ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জকে ধর্ম ও জাতিগত সংঘাত থেকে মুক্ত করে শান্তি স্থাপনের জন্যে।' বলল গোল্ড ওয়াটার।

'অশান্তির মাধ্যমে শান্তি!' বলে হো হো করে হেসে উঠল ফার্ডিন্যান্ড।

'কথাটা মনে হয় তুমি নতুন শুনলে! আমাদের পশ্চিমীদের রাজনীতি তো এটাই। এ রাজনীতির বিভিন্ন নাম আছে। কিন্তু লক্ষ্য একটাই পশ্চিমী আদর্শ নিয়ন্ত্রিত এক মতের, এক পথের, এক বিশ্ব।'

'নোবেল পুরষ্কার কথা পরে। একটা সংকটের কথা বলা হয়নি আপনাকে।'

'সংকট? কি সেটা?'

'বলেছিলাম আপনাকে যে, গ্রান্ড টার্কস-এর চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কয়েকজন ছাত্রের সমীক্ষায় মুসলিম পুরুষ শিশুদের সংখ্যা হ্রাস ধরা পড়েছিল, তাদেরসহ একজন সাংবাদিককে আমরা হত্যা করেছি। কিন্তু সমীক্ষার সাথে জড়িত এক মুসলিম ছাত্রী পলাতক ছিল। তাকে ধরতে গিয়ে আমাদের চারজন লোক রহস্যজনকভাবে খুন হয়। সেই............'

ফার্ডিন্যান্ডকে বাধা দিয়ে গোল্ড ওয়াটার বলল, 'রহস্যজনক বলছেন কেন?'

'রহস্যজনক এই কারণে যে, হত্যাকান্ডটি এলাকার গ্রামবাসীদের দ্বারা হয়নি। হয়েছে একজন এশিয়ানের হাতে।'

'এশিয়ান? কে সে?'

‘কে জানি না, কিন্তু লোকটি গ্রান্ড টার্কস দ্বীপে এসে প্রথমেই সেই মুসলিম মেয়েটির খোঁজ করে। আমাদের লোকেরা তাকে সন্দেহ করে তাকে মারপিট করে।’

‘তারপর?’

‘তার খোঁজ আমরা রাখিনি। খুব সাধারণ কেউ তাকে আমরা মনে করেছিলাম।’

‘আচ্ছা বল, কি বলছিলে।’

‘আমাদের চারজন লোক হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যে আমরা তিরিশজন লোকের একটা শক্তিশালী দল পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তারা হারিয়ে গেছে। তাদের জীবিত অথবা মৃত কোন চিহ্ন আমরা খুঁজে পাইনি।’

‘কি বলছ তুমি, এটা কি সত্য?’

‘সত্য। আমরা লোক পাঠিয়ে গোটা দ্বীপ তন্ন তন্ন করে দেখেছি। কোথাও সন্দেহ করার মত কিছু পাইনি।’

‘অসম্ভব ব্যাপার। দ্বীপের কেউ কিছু বলতে পারেনি?’

‘না, পারেনি।’

‘বোটগুলো?’

‘বোটগুলোও পাওয়া যায়নি!’

কিছু বলতে যাচ্ছিল গোল্ড ওয়াটার। এ সময় ঘরে প্রবেশ করল শিলা সুসান। ফার্ডিন্যান্ডের একমাত্র মেয়ে।

ঢুকেই বলল, ‘স্যরি ড্যাডি। তোমরা গল্প করছ তাই কেউ আসতে সাহস করছে না। গ্রান্ড টার্কস থেকে দু’জন লোক এসে আপনার অপেক্ষা করছে।’

শিলা সুসান-এর হাতে রঙের তুলি। পাশেই আর্ট রুমে বসে সে আর্ট করছিল। সেখান থেকে রিসেপশন রুমের কথাবার্তা শোনা যায়। শুনেই ওদের সাহায্য করতে এসেছে।

কথা শেষ করেই শিলা সুসান গোল্ড ওয়াটারকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘গুড মর্নিং স্যার।’

শিলা সুসানের কথা শেষ হতেই ফার্ডিন্যান্ড সুসানের দিকে ইংগিত করে বলল, ‘এ আমার মেয়ে শিলা সুসান, ওয়াশিংটনের জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। আর্ট ওর বিশেষ সখ।’

‘ওয়েলকাম বেটি। বস।’ বলল গোল্ড ওয়াটার।

‘ধন্যবাদ।’ বলে বসল সুসান।

ইন্টারকমে রিসেপশনে খবর পাঠিয়েছিল ফার্ডিন্যান্ড।

দু’জন লোক প্রবেশ করল ড্রইং রুমে।

তারা সম্ভাষণ বিনিময়ের পর বলল ফার্ডিন্যান্ডকে, ‘আমরা গ্রান্ড টার্কস থেকে এসেছি জরুরী খবর নিয়ে।’

ফার্ডিন্যান্ডের ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে উঠল। বলল, ‘জন ব্ল্যাংকরা কোথায়?’

ফার্ডিন্যান্ডের কথা শেষ হতেই শিলা সুসান বলে উঠল, ‘ড্যাডি আমি যাই। যেসব মারামারির কথা চলছিল, সে রকম মারামারির কথাই আবার শুরু হবে। আমি এসব শুনতে পারব না। বলে উঠে দাঁড়াল শিলা সুসান।

শিলা সুসানের কথা শুনে হেসে উঠেছিল গোল্ড ওয়াটার। বলল, ‘যে মারামারি জীবনের জন্যে, সে মারামারিতে বিতৃষ্ণা থাকলে চলবে কেন বেটি?’

‘মারামারিটা জীবনের জন্যে অর্থাৎ আত্মরক্ষার জন্যে হচ্ছে কি?’ বলল শিলা সুসান।

‘অবশ্যই বেটি।’ গোল্ড ওয়াটার।

সুসান কিছু বলতে যাচ্ছিল তার আগেই ফার্ডিন্যান্ড বলল সুসানকে, ‘তোমাকে আইন না পড়িয়ে ভুল করেছি মা। ভাল আইনজীবি হতে।’ হাসতে হাসতে কথা বলছিল ফার্ডিন্যান্ড।

সুসান উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, ‘ড্যাডি আজ নয়, আরেকদিন ঝগড়া করব। চলি।’

বলে সুসান ড্রইং রুম থেকে বেরিয়ে তার আর্ট রুম ঢুকল।

সুসান বেরিয়ে যেতেই প্রশ্নবোধক দৃষ্টি তুলে ধরল ফার্ডিন্যান্ড গ্রান্ড টার্কস থেকে আসা লোক দু’টির দিকে।

লোক দু'টির মুখ শুকনো এবং চোখে উদ্বেগ। চারদিকের কোন কথার দিকেই তাদের মনোযোগ নেই।

ফার্ডিন্যান্ড তাদের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি তুলে ধরতেই তাদের একজন বলল, 'সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে আমাদের ওখানে।'

'ভনিতা নয়, ঘটনা বল।' কিছুটা শক্ত কণ্ঠে বলল ফার্ডিন্যান্ড।

'সাউথ টার্কো দ্বীপে যারা অভিযানে গিয়েছিল, তাদের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।' বলল তাদের একজন কম্পিত কণ্ঠে।

'কি?' চিৎকার করে উঠল ফার্ডিন্যান্ডের কণ্ঠ। যেন বাজ পড়ল ঘরে।

চমকে উঠেছে ওরা দু'জনও। ভ্রু কুঁচকে উঠেছে গোল্ড ওয়াটারেরও।

অবিশ্বাস্য বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে ফার্ডিন্যান্ডের মুখ।

চিৎকারের শব্দ মিলিয়ে যাবার আগেই ফার্ডিন্যান্ড বলল, 'ওরা ফিরে আসেনি?'

'আসেনি।'

'কোন খবর দেয়নি?'

'না।'

'তারপর?'

'দুপুর পর্যন্ত আমরা মনে করেছি, অপারেশনের পর তারা পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। কিন্তু দুপুরেই টেলিফোন পেলাম সাউথ টার্কো দ্বীপের আমাদের অফিস থেকে। জানাল, অভিযানের আগে যে তিনজনকে পরিস্থিতি সম্পর্কে খবর সংগ্রহের জন্যে পাঠানো হয়েছিল, কেউ ফিরেনি, অভিযানে যাদের আসার কথা তাদেরও কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি।'

'অভিযানে আসার কথা' বলেছে কেন, অভিযানে ওরা যায়নি?'

'সে কথা তারা জানে না।'

'চিহ্ন খুঁজে পেল না কেন? ওরা কি ওখানে গিয়েছিল?

'সাউথ টার্কো পুলিশ ষ্টেশন থেকে বিষয়টা তারা জানতে পারে।'

'পুলিশ ষ্টেশন থেকে?'

‘হ্যাঁ। গ্রামবাসীদের তরফ থেকে খুব সকালে থানায় কেস হয় যে, ডাকাতরা তাদের গ্রাম আক্রমণ করতে এসেছিল। পথে তিনজনকে পেয়ে ডাকাতরা তাদের হত্যা করে। পরে গ্রামবাসীরা জেগে উঠলে ওরা পালিয়ে যায় তাদের বোটে চড়ে।’

লোকটি থামলেও ফার্ডিন্যান্ড কথা বলতে পারলো না। সে স্তম্ভিত চোখে তাকিয়ে আছে লোকটির দিকে। এ ধরনের অবিশ্বাস্য ঘটনা ঐ দ্বীপে এর আগেও একবার ঘটেছে। সে ঘটনায় হাওয়া হয়ে গিয়েছিল ৩০ জন লোক। কিন্তু আজকের ঘটনায় কথা বলার শক্তি যেন সে হারিয়ে ফেলেছে। একশ’ জনেরও বেশি সশস্ত্র লোক সেখানে নেই, ফিরেও আসেনি, তাদের নিহত হবার ঘটনাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তাহলে ওরা গেল কোথায়! এবারের ঘটনায় একটাই শুধু নতুন বিষয়, ওদের পক্ষের তিনজন লোক নিহত হয়েছে এ পক্ষের লোকদের হাতে।

‘ওদের পক্ষের যে তিনজন লোক নিহত হয়েছে, তারা কিভাবে নিহত হয়েছে?’ অনেকক্ষণ পর বলল ফার্ডিন্যান্ড।

‘ষ্টেনগানের ব্রাশ ফায়ারে নিহত হয়েছে।’

‘থানা তদন্তে গিয়েছিল?’

‘হ্যাঁ। আমাদেরও লোক গিয়েছিল পুলিশের সাথে। তারা গ্রাম, ঘাট এলাকা, ঘাট পর্যন্ত রাস্তা, আশপাশ এলাকা সবই তারা পুলিশের সাথে ঘুরে ঘুরে দেখেছে, কিন্তু সন্দেহজনক কোথাও কিছু দেখতে পায়নি।’

‘কি চিহ্ন তারা খুঁজেছে?’

‘কোন বড় সংঘাত-সংঘর্ষ ও রক্তারক্তি হলে তার একটা চিহ্ন থাকবেই। সে রকম কিছু তারা পায়নি।’

লোকটি কথা শেষ করলেও ফার্ডিন্যান্ড কথা বলল না। ভাবছিল সে। বলল এক সময়, ‘থানা কি বলেছে?’

‘পুলিশরা তিনটা খুনকেই বড় করে দেখছে। তারা মনে করছে, রাতে কোন জলদস্যু গ্রামগুলোর উপর চড়াও হতে এসেছিল। গ্রামবাসীদের আবেদনে দ্বীপের দক্ষিণাঞ্চলে দু’টি পুলিশ বক্স বসেছে এবং রাতে পুলিশ এলাকায় টহল দিচ্ছে।’

‘গ্রান্ড টার্কস-এর পুলিশকে কিংবা পুলিশে আমাদের যারা আছে তাদের কিছু বলা হয়নি?’

‘না বলা হয়নি। বললে তো সব কথাই বলতে হবে। এ সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারিনি।’

‘ঠিক করেছ। ওখানকার বৃটিশ পুলিশের মধ্যে বেয়াড়া পুলিশ অফিসার অনেক আছে যাদের কাছে ঘটনার প্রকাশ ঘটলে আমাদের ক্ষতি হবে।’ বলল গোল্ড ওয়াটার।

বলে গোল্ড ওয়াটার তাকাল ফার্ডিন্যান্ডের দিকে এবং বলল, ‘ওর কাছ থেকে আর কিছু জানার আছে?’

‘সামান্য দু’একটা কথা।’ বলে ফার্ডিন্যান্ড লোকটিকে আবার জিজ্ঞেস করল, ‘ওদের কাছে অনেকগুলো মোবাইল টেলিফোন ছিল। ওদের কোন টেলিফোন পাওয়া যায়নি?’

‘না স্যার।’

‘তোমরা কি সাগরে সন্ধান করেছ?’

‘জ্বি। আমাদের কয়েকটা বোট দ্বীপটির চারদিকের গোটা সমুদ্র এলাকা তন্ন তন্ন করে দেখেছে। সেখানেও কিছু পাওয়া যায়নি।

লোকটি কথা শেষ করতেই ফার্ডিন্যান্ড তাকে বলল, ‘তোমরা গিয়ে রেষ্ট নাও। দরকার হলেই ডাকব তোমাদের।’

লোক দু’জন বেরিয়ে গেলে ফার্ডিন্যান্ড বিমূঢ় দৃষ্টি তুলে তাকাল গোল্ড ওয়াটারের দিকে। বলল, ‘আপনি কিছু বুঝলেন?’

‘আমি মনে করি সেখানে অলৌকিক কিছু ঘটেনি। আমাদের লোকেরা হয় বন্দী হয়েছে, নয়তো সবাই নিহত হয়েছে।’ বলল গোল্ড ওয়াটার।

‘এটা কি সম্ভব? সর্বোধুনিক অস্ত্রসজ্জিত আমাদের ১০০ জন লোককে ওখানকার গ্রামবাসীরা হত্যা বা বন্দী করবে কেমন করে?’

‘তা আমি জানি না। কিন্তু বন্দী বা হত্যা ছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যা বাস্তব নয়।’

‘বন্দী বা নিহত হওয়ার ঘটনাই বা বাস্তব হয় কি করে?’

‘আমারও এটা প্রশ্ন। কিন্তু হত্যা বা বন্দী হওয়া ছাড়া অন্য কিছুর কথা আমি চিন্তাও করতে পারছি না।’

‘পাঁচটা বোট গেল কোথায়?’

‘ওরা ওগুলো সাগরে ডুবিয়ে দিতে পারে।’

‘কেন? এ ধরনের বোট তো তাদের জন্যে খুব লোভনীয়।’

‘শত্রুকে তুমি গেঁয়ো বললেও আমার মনে হচ্ছে ওরা খুব বুদ্ধিমান। আমাদের লোকদের ওরা হত্যা বা বন্দী করেছে এটা তারা কোনভাবেই প্রমাণ হতে দিতে চায় না। থানায় তারা ডাকাত পড়ার ইজাহার দিয়ে দারুণ বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। নিজেদের মজলুম প্রমাণ করে পুলিশকেও তারা তাদের পক্ষে নিতে চায়।’

‘কিন্তু হঠাত এ বুদ্ধি তাদের মাথায় এলো কি করে? এ গ্রামবাসীদের জানি আমরা। এরা প্রতিবাদ করা তো দূরে থাক প্রতিবাদের ভাষাও জানতো না। এদের এমন সাহস, শক্তি ও বুদ্ধি আসবে কোত্থেকে?’

‘এই উত্তর আমার কাছেও নেই।’

গোল্ড ওয়াটার থামলেও ফার্ডিন্যান্ড কিছুক্ষণ কথা বলল না।

বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর ফার্ডিন্যান্ড বলল, ‘আমাদের জিজ্ঞাসার জবাব পাওয়ার জন্যে এবং শত্রুকে আর বাড়িতে না দেবার জন্যে এখনই সর্বাত্মক অভিযান পরিচালনা করতে হবে বলে আমি মনে করছি।’

‘না ফার্ডিন্যান্ড এ ধরনের অভিযান করে আমরা যে সংকটে পড়েছি তাকে আরও বৃদ্ধি করবে। এ পর্যন্ত দুই ঘটনায় আমাদের লোকবলের ক্ষতি হয়েছে, আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু ইমেজের ক্ষতি হয়নি। আমাদের এই আক্রমণের ঘটনা প্রকাশিত হবার সাথে সাথে আমরা সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত হবো বিশ্বের সকলের কাছে।’ বলল গোল্ড ওয়াটার।

‘আমরা পুলিশের সহযোগিতা পাব। সুতরাং খুব অসুবিধা কি হবে?’

‘কিছু পুলিশের বা বেশিরভাগ পুলিশের পাবে, সব পুলিশের পাবে না। সুতরাং বিষয়টা প্রকাশ পাবে। এ নিয়ে হৈ চৈ হবে। হৈ চৈ করবে বৃটেনবাসীরাও। সুতরাং বৃটিশ পুলিশকে প্রকাশ্যে আমরা পক্ষে পাব না।’

‘ঠিক বলেছেন। প্রকাশ্য অভিযান ক্ষতিকর হবে। আগের মতই গোপনে পুনরায় একটা চেষ্টা করতে আমরা পারি।’

‘পারি। কিন্তু আগের চেয়ে তা কঠিন হবে। আগে পুলিশ পাহারা ছিল না, এখন পুলিশ আছে। তাছাড়া কিছু না জেনে অন্ধকারে ঝাঁপ দেয়াকে যুক্তিসঙ্গত মনে করি না।’

‘তাহলে?’

‘আমার মতে ব্যাপক হত্যাকান্ড চালিয়ে কোন জনগোষ্ঠীকে দমন করা এখন বিপজ্জনক। এ বিষয়টা খুব তাড়াতাড়ি জানাজানি হয়ে যায় এবং চারদিক থেকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ওঠে, এমনকি বিভিন্ন মানবাধিকার গ্রুপ ও জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন থেকে এর তদন্তও হয়। সুতরাং সামরিক অভিযানের পথে অগ্রসর হওয়া যাবে না। আমি মনে করি, আমরা যে পথে অর্থাৎ মুসলিম জনসংখ্যা হ্রাস করার যে পথে অগ্রসর হচ্ছি, সেটা দীর্ঘ মেয়াদী হলেও এটাই নিরাপদ। এ কার্যক্রমটাই আমাদের আরও জোরদার করা দরকার।’ বলল গোল্ড ওয়াটার।

‘তাহলে সাউথ টার্কো দ্বীপে আমরা এখন কিছুই করব না? এত বড় পরাজয় মেনে নেয়া খুবই কষ্টকর হবে।’ বলল ফার্ডিন্যান্ড।

‘কিছুই করব না, এ কথা ঠিক নয়। আমাদের গোয়েন্দা ইউনিটের লোকদের সেখানে ছড়িয়ে দাও। জানতে চেষ্টা কর, সেখানে কি ঘটেছে, কারা দায়ী। যারা দায়ী, তাদের এক এক করে কিডন্যাপ কর এবং শেষ করে দাও। আমাদের লোকেরা এক সাথে হারিয়ে গেছে, আর ওরা এক এক করে হারিয়ে যাবে।’

ফার্ডিন্যান্ডের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, ‘যিশুকে ধন্যবাদ, আমাদের লোকেরা খুশী হবে এ কর্মসূচী পেলে। আর মুসলিম পুরুষ শিশু জন্মের পরেই শেষ করে দেয়ার ব্যাপারটা আমরা জোরদার করব।‘

‘কিন্তু সাবধান, খুব গোপনে বুদ্ধিমত্তার সাথে এ কর্মসূচী এগিয়ে নিতে হবে। এটাও খুব বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে, যদি জানাজানি হয়ে যায়।’

‘আমরা খুব সাবধান এ ব্যাপারে। আমাদের বিশ্বস্ত লোকদের দিয়ে আমরা এ কাজ করাচ্ছি। চিন্তার কোন কারণ নেই।’

‘খুশী হলাম।’

‘কিন্তু মারাত্মক কিছু দু:সংবাদও শুনলেন’

‘এ রকম কিছু দু:সংবাদের জন্যে তৈরি থাকতে হয়, এক তরফা একটা কাজ হয়ে চলবে, এটা স্বাভাবিক নয় ফার্ডিন্যান্ড।’ চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিতে দিতে বলল গোল্ড ওয়াটার। থামল একটু।

তারপর চায়ের কাপটা পিরিচে রাখতে রাখতে বলল, ‘এখন উঠি ফার্ডিন্যান্ড। কলম্বাস গীর্জার ফাদারের সাথে একটু কাজ আছে। সেটা সেরে রেষ্ট হাউজে ফিরব।’

বলে উঠে দাঁড়াল গোল্ড ওয়াটার।

ফার্ডিন্যান্ড তার সাথে হ্যান্ডশেক করতে করতে বলল, ‘ঈশ্বরই আজ আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছিল। আপনার মূল্যবান পরামর্শ গোটা পরিস্থিতি পাল্টে দিয়েছে। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।’

গোল্ড ওয়াটার বলল, ‘কাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছ, এটা তোমার কাজ, আমার কাজ শুধু নয়, সকলের কাজ।’

ফার্ডিন্যান্ড গাড়ি বারান্দায় গোল্ড ওয়াটারকে গাড়িতে তুলে দিয়ে ফিরে এল। নিজের ষ্টাডি রুমে যাবার পথে ফার্ডিন্যান্ড তার মেয়ে শিলা সুসানের আর্ট রুমে উঁকি দিল। বলল, ‘স্কেচটা শেষ করতে পেরেছ সুসান?’

শিলা সুসান একটা স্কেচের দিকে তাকিয়ে গালে হাত দিয়ে বসেছিল। তার আব্বার কথা কানে যেতেই ফিরে তাকাল তার আব্বার দিকে। হাসল। বলল, ‘আর্টের একটা রঙ লাল বটে, ড্যাডি, কিন্তু মানুষের লাল রক্তের সাথে এর আকাশ-পাতাল পার্থক্য।’

‘তাতো বটেই। কিন্তু তারপর কি?’ বলল সুসানের আব্বা ঠোঁটে হাসি টেনে।

‘ওপাশে তোমাদের রক্তারক্তির গল্পে আমার রঙের কাজ আমি করতে পারিনি। আমার আর্ট রুম অনেকটা ড্রইং-এর অংশ। আমার এ রুম পাল্টে দাও।’

শিলা সুসানের আব্বা ফার্ডিন্যান্ড সুসানের শেষের কথাগুলো যেন শুনতেই পায়নি। বলল, ‘পাগল মেয়ে, রক্তারক্তির গল্প কোথায় শুনলে। খবর

এসেছে আমাদের একশ' লোককে ওরা সম্ভবত হত্যা করেছে। এ বিষয় নিয়েই আমরা আলোচনা করছিলাম।'

'একশ' লোক হত্যা হওয়া মানে রীতিমত একটা যুদ্ধ। এটা কি রক্তারক্তি নয়? 'ওরা' কারা ড্যাডি?'

'সাউথ টার্কো দ্বীপের মুসলমানরা।'

'কিন্তু ওদের সাথে তোমাদের বিরোধ কেন? কেন একশ' লোকের বাহিনী পাঠিয়েছিল ওদের বিরুদ্ধে?'

'এটা অস্তিত্বের রাজনীতি। তুমি এখন ছোট, পড়াশুনা করছ। আরও বড় হও বুঝবে মা। ধন্যবাদ।'

বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে তার ষ্ট্যাডি রুমের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

তার আব্বা চলে গেলেও শিলা সুসান দরজার দিকেই তাকিয়ে রইল। তার চোখের শূন্য দৃষ্টি বাইরে প্রসারিত। তার আব্বার শেষ কথাই তার মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। তার আব্বার শেষ কথা থেকে সুসান এটুকু বুঝেছে, বিষয়টা বড় রাজনীতির ব্যাপার। কিন্তু রাজনীতির সাথে এই হত্যাকান্ড কেন? বিভেদের এই হানাহানি ভাল লাগে না তার। তার বিশ্ববিদ্যালয়ে নিগ্রো ছাত্রদের ক্যান্টিন ও ক্লাসে বসার জায়গা আগে আলাদা ছিল। এখন এক হয়েছে। কিন্তু মন, সম্পর্ক ও সামাজিকতা তো হয়নি। সেই বিভেদের দেয়াল এখনও খাড়াই আছে। এ থেকে হানাহানি ও রক্তারক্তির ঘটনাও ঘটেছে। এই ক'দিন আগে একজন কৃষ্ণাংগ ছাত্রের সাথে শ্বেতাংগ ছাত্রীর প্রেম নিয়ে যে গন্ডগোল ও হানাহানি হয়েছে তা দেখে মনে হয়েছে কৃষ্ণাংগ ছাত্রটি যেন মানুষ নয়, পশু। শেষে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে হয়েছে। এটাকেও নিশ্চয় বলা হবে অস্তিত্বের রাজনীতি। তাহলে দেখা যাচ্ছে, স্বতন্ত্র অস্তিত্বই আসল সমস্যা। কিন্তু স্বতন্ত্র তো একটা বাস্তবতা। এই বাস্তবতা সমস্যা হয়ে দাঁড়ালে তো বিপদ! এর সমাধান কোথায়? সকল ধর্ম, জাতীয়তা, স্বত্তা-স্বাতন্ত্রের উর্ধে ওঠা? মাথা ব্যথা বলে কি মাথা কেটে ফেলতে হবে?

মাথা ঘুরে গেল শিলা সুসানের। আর চিন্তা করতে পারল না।

হাতের স্কেচ এবং তুলিটা টেবিলে ছুঁড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে।

ডা: মার্গারেটের চোখের সামনেই শিশুটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ার মতই মৃত্যুটিকে মনে হলো ডা: মার্গারেটের কাছে।

রাজধানী গ্রান্ড টার্কস-এর একজন মুসলিম ব্যবসায়ীর ছেলে এই শিশুটি।

ডা: মার্গারেট পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে শিশুটির দিকে। মৃত্যুটি তার কাছে অবিশ্বাস্য। সকালে ডিউটিতে এসেই সে পরীক্ষা করেছে শিশুটিকে। সব ঠিক আছে। তার শারীরিক অন্যান্য পরীক্ষার রিপোর্টও ভাল। কিন্তু কয়েক ঘণ্টায় কি ঘটে গেল। মরেই গেল শিশুটি।

চিন্তার মধ্যে ডুবে গিয়েছিল ডা: মার্গারেট।

ওয়ার্ডের ষ্টুয়ার্ড মেয়েটির কথায় সম্বিত ফিরে পেল ডা: মার্গারেট। সে বলছিল, 'ম্যাডাম, ছেলেটিকে সরিয়ে ফেলতে হয়।'

ডা: মার্গারেট তাকাল ষ্টুয়ার্ডের দিকে। ভাবল অল্পক্ষণ। তারপর বলল, 'ষ্টুয়ার্ড, আমি ছেলেটিকে মর্গে পরীক্ষা করাতে চাই।'

'কেন?' অস্বাভাবিক কিছু সন্দেহ করেন?'

'ঠিক তা নয়, কিন্তু সকালে পরীক্ষার সময় একে যেমন পেয়েছি, তাতে এভাবে মরার কথা নয়। তাই কারণ জানতে চাই।'

'ম্যাডাম, তাহলে আপনি নোট দিন। ওয়ার্ডের হেড স্যার এবং হাসপাতালের ডিজি নোট অনুমোদন করলে তবেই মর্গে এই পরীক্ষা সম্ভব।'

ডা: মার্গারেট ভাবল কিছুক্ষণ। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল আহমদ মুসার মনোহর অবয়বটি। আহমদ মুসার নির্দেশেই সে হাসপাতালের ইমারজেন্সী ওয়ার্ড থেকে অনেক তদবির করে বদলী নিয়ে প্রসূতি ও শিশু ওয়ার্ডে এসেছে। তাকে অনুরোধ করা হয়েছে, ওয়ার্ডের মুসলিম পুরুষ শিশুর উপর নজর রাখতে, তাদের কারো মৃত্যু হলে তার কারণ সন্ধান করতে। আহমদ মুসার এই

অনুরোধ তার কাছে এক অলজ্ঘনীয় নির্দেশ। সে এই নির্দেশ পালন থেকে পিছাতে পারে না।

ডা: মার্গারেট মুখ তুলল ষ্টুয়ার্ডের দিকে। বলল, 'আসুন আমি নোট দিচ্ছি।'

ডা: মার্গারেট ওয়ার্ডে তার অফিসে এসে তার প্যাডে অফিসিয়াল একটা নোট লিখে ষ্টুয়ার্ডের হাতে তুলে দিল।

নোট নিয়ে ষ্টুয়ার্ড চলে গেলে চেয়ারে গা এলিয়ে দিল ডা: মার্গারেট। তার এই পদক্ষেপ সাধারণ দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক। অস্বাভাবিক মৃত্যুর পক্ষে সুস্পষ্ট কারণ ঘটলেই শুধু এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়। একমাত্র প্রমাণহীন সন্দেহ ছাড়া তার দাবীর পক্ষে আর কিছু যুক্তি নেই। তাঁর উর্ধ্বতনরা তার সুপারিশকে কি দৃষ্টিতে দেখবেন?

ডা: মার্গারেট যখন এসব ভাবনায় ডুবে আছে, তখন হন্ত-দন্ত হয়ে তার ঘরে প্রবেশ করল ডা: ওয়াভেল। প্রবেশ করেই বলল, 'ডা: মার্গারেট আপনি কি নোট দিয়েছেন? এর কি প্রয়োজন?'

ডা: মার্গারেট উঠে দাঁড়াল চেয়ার থেকে। বলল, 'আমি যা মনে করেছি, সেটাই আমি নোটে লিখেছি স্যার।'

'ঠিক আছে। কিন্তু আপনার যুক্তি কি?'

'স্যার রোগীর রোগের ধরন, তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট কোন কিছুই শিশুটির মৃত্যু সমর্থন করে না। এটাই অস্বাভাবিকতা। এই অস্বাভাবিকতা কেন ডাক্তার হিসেবে আমাদের জানা কর্তব্য। এই কর্তব্যবোধ থেকেই আমি এই নোট দিয়েছি।' বলল ডা: মার্গারেট।

'হতে পারে রোগ নতুন কোন দিকে টার্ন নেয়ায় তার মৃত্যু ঘটেছে। যাই হোক রোগেই তার মৃত্যু ঘটেছে। এটা অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন নেই। নোট ফেরত নিন ডা: মার্গারেট।'

'ফেরত নেবার প্রয়োজন নেই স্যার। আপনি এবং ডিজি যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেটাই তো হবে।'

‘ডা: মার্গারেট, আমরা ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে বাড়াবাড়ি করছি বলে মনে হয়।’

‘দু:খিত স্যার, নোট আমার হাত থেকে চলে গেছে, এটা এখন আপনাদের এক্তিয়ারে। যা ভাল মনে করছেন, তাই করুন।’

‘একটা নোট আমার কাছে পৌছার পর তা আমি ডিজিকে না দিয়ে পারি না। তাই বলছিলাম আপনি নোটটা প্রত্যাহার করলে ঝামেলা চুকে যায়।’ নরম সুরে বলল ডা: ওয়াভেল।

‘আপনি নোটে প্রয়োজন নেই লিখে দিন, তাহলেই তো হল।’

‘আমি আপনার সাথে ঝগড়ায় নামতে চাচ্ছিলাম না ডা: মার্গারেট।’

‘ঝগড়ার তো কিছু নেই। এটা মত পার্থক্যের ব্যাপার এবং এ মত পার্থক্য খুবই স্বাভাবিক।’

‘এই মত পার্থক্যের প্রয়োজন কি? আমি এটা চাই না। আবার অনুরোধ করছি, নোটটা আপনি প্রত্যাহার করুন।’

স্তম্ভিত হলো ডা: মার্গারেট ডা: ওয়াভেলের এই অনুরোধে। তার চেয়ে বেশি আশ্চর্য হলো, ডা: ওয়াভেলের মধ্যে কাকুতি মিনতির ভাব দেখে। একটা সামান্য বিষয় নিয়ে ডা: ওয়াভেলের মত একজন অত্যন্ত সিনিয়র ডাক্তার তার মত নবীন ডাক্তারের কাছে কাকুতি মিনতির পর্যায়ে নামবে কেন? এ বিষয়টাও ডা: মার্গারেটের কাছে শিশুটির মৃত্যুর মতই অস্বাভাবিক মনে হলো। এই চিন্তার সাথেই তার মনে হলো অস্বাভাবিকতার গ্রন্থি মোচন অবশ্যই হওয়া প্রয়োজন।

অবশেষে বলল, ‘স্যার নোটের কথাই আবার বলছি, ডাক্তার হিসেবে আমাদের সকলেরই জানা দরকার কি কারণে বা কি রোগে তার মৃত্যু হলো। এতে আমরা জানতে পারবো আমাদের করণীয় কি।’

‘এটাই তাহলে আপনার শেষ কথা?’

‘আমি দু:খিত স্যার।’

‘আপনি ভাল করলেন না ডা: মার্গারেট। আমি যা বলেছি, সব আপনার ভালোর জন্যেই বলেছি।’

‘দু:খিত স্যার।’

‘দু:খিত আমি আপনার জন্যে।’ বলে উঠে দাঁড়াল ডা: ওয়াভেল।

ডা: ওয়াভেল চলে যাবার পর এলেমেলো চিন্তার মধ্যে আবার ডুবে গেল ডা: মার্গারেট। মন তার খারাপ হয়ে গেল একজন সিনিয়র ডাক্তারের অনুরোধ এভাবে প্রত্যাখ্যান করায়। ডা: ওয়াভেল এই ওয়ার্ডে আছেন ৫ বছরেরও বেশী কাল ধরে। পুরনো লোক উনি। কিন্তু ডা: মার্গারেট বুঝতে পারছে না, এমন পুরনো ও অভিজ্ঞ ডাক্তার অমন অযৌক্তিক অনুরোধ করতে পারলেন কেমন করে! তার চেয়ে বড় কথা হলো, তার অনুরোধের ধরন দেখে মনে হয়েছে আমি তার বিরুদ্ধে ক্ষতিকর যেন কিছু করেছি, যা থেকে আমিই তাকে উদ্ধার করতে পারি। আবার শেষের দিকে ‘আমি দু:খিত আপনার জন্যে’ বলে যে শক্ত কথা বললেন, সেটাও তাঁর ব্যক্তিগত অসন্তুষ্টি থেকে এসেছে। বিষয়টাকে এভাবে তিনি ব্যক্তিগত নিলেন কেন?

মাথার চিন্তাটাকে হাল্কা করার জন্যে ওয়ার্ডে বের হলো ডা: মার্গারেট। রোগীদের খোঁজ খবর নিতে শুরু করল।

এক সময় একজন এ্যাটেনডেন্ট ছুটে এল ডা: মার্গারেটের কাছে। বলল, ‘শীঘ্রী চলুন, ডি জি স্যারের টেলিফোন।’

নিজের অফিসে ফিরে এসে টেলিফোন ধরল ডা: মার্গারেট।

ওপার থেকে ডিজি বলল, ‘তুমি যে নোট দিয়েছ, তা ডা: ওয়াভেল সমর্থন করেননি। শিশুটির মৃত্যুর অস্বাভাবিকতা সম্পর্কে তুমি কতটা নিশ্চিত?’

‘আমার দাবীর ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। শুরু থেকেই আমি শিশুটির রোগের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করছি। এবং আজ সকালেও যা দেখেছি, তাতে ঐ রোগে মৃত্যুটা একেবারেই অস্বাভাবিক।’

‘তাহলে আমি সার্বিক পরীক্ষার অর্ডার দেব?’

‘স্যার যদি আমার উপর আস্থা রাখতে পারেন।’

‘তোমার রেকর্ড আমি জানি। সে জন্যেই টেলিফোন করলাম তোমাকে। আমি ওয়ার্ড-এর ইনচার্জের মতকেই তো ও,কে করতে পারতাম।’

‘ধন্যবাদ স্যার।’

‘ও.কে মাই ডটার। তোমার সাফল্য কামনা করি। ধন্যবাদ।’

টেলিফোন রেখে চেয়ারে গা এলিয়ে দিল ডা: মার্গারেট।

পরদিন বিকেল।

ওয়ার্ডে ঘুরতে গিয়ে দুটি শিশুর অবস্থার আকস্মিক পরিবর্তন দেখে চমকে উঠল ডা: মার্গারেট।

এ দু'টি শিশুর উপরও ডা: মার্গারেট ঘনিষ্ঠ দৃষ্টি রেখে আসছিল, শিশু দু'টি ভূমিষ্ঠ হয়ে বেড়ে আসার পর থেকে। শিশু দু'টি মুসলিম পুরুষ শিশু।

গতকাল রাতে ডিউটি থেকে যাবার সময় ডা: মার্গারেট শিশু দু'টিকে দেখে গেছে। সবদিক দিয়েই ভাল ছিল। কিন্তু আজ এসে দেখছে, শিশু দু'টির প্রাণশক্তি যেন দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। বাইরে রোগের তেমন কোন লক্ষণ নেই, ভেতরে থাকলেও তা বলার শক্তি শিশুর নেই। অবসাদগ্রস্থতা একমাত্র লক্ষণ। ধীরে ধীরে বাড়ছে শিশু দু'টির অবসাদগ্রস্থতা। আগের শিশুটির সাথে এর দু'টি শিশুর যেটুকু পার্থক্য তা হলো, ঐ শিশুটি নীরব ঘুমের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়ে গেছে, আর এ দু'টি শিশু ঘুম নয়, এমনিতেই নিশ্চল হয়ে পড়ছে, যেন ধীরে ধীরে মৃত্যু এসে গ্রাস করছে শিশু দু'টিকে।

ডা: মার্গারেট দ্রুত শিশু দু'টির ফাইলে তাদের প্যাথোলজিক্যাল টেষ্ট সুপারিশ করল এবং লাল কালিতে টপ প্রায়োরিটি লিখল।

ফাইলটি আয়ার হাতে তুলে দিয়ে ডা: মার্গারেট সহকারী ডাক্তারকে ওয়ার্ডের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে বলল, 'আমি একটু হাসপাতাল লাইব্রেরীতে যাচ্ছি। কেউ খোঁজ করলে বলো।'

আধ ঘণ্টা পর ওয়ার্ডে ফিরে এল ডা: মার্গারেট। ওয়ার্ডে ঢুকতেই তার সহকারী ডাক্তার মুখ শুকনো করে বলল, 'ডা: ওয়াভেল স্যার আপনার নোট গ্রহণ না করে নিউরো টেষ্ট রিকোসেন্ড করে শিশু দু'টিকে নিউরো বিভাগে স্থানান্তরিত করেছে।'

চমকে উঠল ডা: মার্গারেট। বলল, 'নিউরো প্রোব্লেম এখানে মূল ইস্যু নয়। নিউরো টেষ্ট দিয়ে কি হবে?'

বলে হতাশভাবে চেয়ারে বসে পড়ল ধপ করে।

আর কোন কথা না বলে ডা: মার্গারেট চেয়ারে গা এলিয়ে চোখ বুজল। চোখ বুজতেই শিশু দু'টির ছবি তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। শিশু দু'টির যা অবস্থা তাদের প্যাথোলজিক্যাল টেষ্ট দরকার। তাতে শিশু দু'টিকে বাঁচানো যেত কিনা বলা মুস্কিল, কিন্তু রোগটা জানা যাবে, রোগের কারণ জানা যাবে, জানা যাবে কেন কেমন করে দু'টি শিশু একই সময়ে একই রোগে আক্রান্ত হলো। কিন্তু কি করবে সে! এই ছোট ব্যাপার নিয়ে সে ওয়ার্ড প্রধানকে ডিঙিয়ে ডিজি'র কাছে যেতে পারে না।

ওয়ার্ডে সেদিনের শেষ রাউন্ডটা শেষ করে ডা: মার্গারেট অফিস কক্ষে ফিরে হাত ব্যাগ নিয়ে বেরুচ্ছিল এমন সময় তার টেবিলের টেলিফোন বেজে উঠল।

টেলিফোন ধরল ডা: মার্গারেট।

'আমি ডা: কনরাড। আমি ডা: ওয়াভেলকে না পেয়ে তোমার কাছে টেলিফোন করলাম।' ওপার থেকে কণ্ঠ ভেসে এল।

নাম শুনেই শশব্যস্ত হয়ে উঠল ডা: মার্গারেট। বলল, 'স্যার আমি ডা: মার্গারেট।'

ডা: কনরাড নিউরোলজীর প্রফেসর। নিউরো ওয়ার্ডের প্রধান তিনি।

'তোমাকেই চাচ্ছি আমি। যে শিশু দু'টিকে ডা: ওয়াভেল এ ওয়ার্ডে রেফার করেছিলেন, আমি ওদের দেখেছি। আমি ওদের ফেরত পাঠালাম। তোমার নোটই ঠিক। প্রোব্লেমটা আমার ধারণায় প্যাথোলজিক্যাল। তোমরা তাড়াতাড়ি দেখ ওদিকটা। খুবই সংকটাপন্ন ওদের অবস্থা।' বলল ডা: কনরাড।

ডা: মার্গারেট খুশী হলো, উদ্বিগ্নও হলো সেই সাথে শিশু দু'টির ভবিষ্যত নিয়ে।

টেলিফোন রেখে দ্রুত ওয়ার্ডে ফিরে এল ডা: মার্গারেট। ইতিমধ্যে শিশু দু'টিকে পৌছানো হয়েছে ওয়ার্ডে।

ডা: মার্গারেট তাড়াতাড়ি ডা: কনরাড-এর রেফারেন্স দিয়ে আরেকটা নোট লিখল শিশু দু'টির ফাইলে।

নোট লেখা শেষ করেই ডা: মার্গারেট সহকারী ডাক্তারকে বলল, 'নোট অনুসারে এদের টেষ্টের ব্যবস্থা কর। পরবর্তী ডাক্তার ডিউটিতে না আসা পর্যন্ত আমি আছি।'

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে বাড়ি আসার জন্যে যখন গাড়িতে উঠল ডা: মার্গারেট, তখন মনটা তার অনেক হালকা মনে হলো। শিশু দু'টির উপযুক্ত টেষ্টের ব্যবস্থা হয়েছে। মনে মনে ধন্যবাদ দিল ডা: কনরাডকে।

পরদিন হাসপাতালে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়েছে ডা: মার্গারেট।

হাসপাতালে ডিউটিতে যাচ্ছে বটে, কিন্তু তার মন খারাপ। ডা: মার্গারেট শিশু বিশেষজ্ঞ না হওয়ার অভিযোগ তুলে তাকে প্রসূতি ওয়ার্ড থেকে বদলীর জন্যে ডা: ওয়াভেল গতকালই এক সুপারিশ পাঠিয়েছে ডিজি ডাক্তার ক্লার্কের কাছে।

ডা: মার্গারেট শিশু বিশেষজ্ঞ নয়, এ কথা ঠিক। কিন্তু সে মেডিসিনের ডাক্তার। হাসপাতালের অর্গানোগ্রাম অনুসারে প্রত্যেক ওয়ার্ডেই অন্তত একজন করে মেডিসিনের ডাক্তার থাকবে। তাছাড়া প্রসূতি ও শিশু রোগের উপর ডাক্তার মার্গারেটের একটা বিশেষ ট্রেনিং আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ওয়াশিংটন মেডিকেল ইনষ্টিটিউট থেকে।

ডা: মার্গারেট কিছুতেই বুঝতে পারছে না ডা: ওয়াভেল কেন তার প্রতি বিরূপ। দু'তিন দিন আগে তিনটি শিশু নিয়ে যা ঘটেছে, তা প্রতিটি ওয়ার্ডে প্রতিদিনের সাধারণ দৃশ্য। একে তার অন্যভাবে নেবার কারণ নেই। তাহলে? এই তাহলের কোন উত্তর মার্গারেটের কাছে নেই।

প্রস্তুত হয়ে হাসপাতালে যাবার জন্যে হাতব্যাগটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল ডা: মার্গারেট।

টেলিফোন বেজে উঠল। যাবার জন্যে পা তুলেও আবার ফিরে দাঁড়াল ডা: মার্গারেট। টেলিফোন ধরল। টেলিফোন ধরেই সচকিত হলো ডা: মার্গারেট। ডিজি ডা: ক্লার্কের টেলিফোন।

'স্যার আপনি। কিছু ঘটেনি তো?' ডা: ক্লার্কের কণ্ঠ শুনেই শশব্যস্তে জিজ্ঞেস করল ডা: মার্গারেট।

'কিছু তো ঘটেছেই। তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি মার্গারেট। এখনই ল্যাবরেটরি থেকে ডা: বিশপ জানালেন, তিনটি শিশুর রক্তেই অস্বাভাবিক ও ভয়ংকর ধরনের উপাদান পাওয়া গেছে। তিনটি শিশুর কেউ বাঁচেনি বটে, কিন্তু তারা ভয়ংকর কোন রোগের বিষয়ে আমাদের চোখ খুলে দিয়ে গেল। তোমার সচেতনতার ফলেই তাড়াতাড়ি বিষয়টা জানা সম্ভব হয়েছে।' বলল ডা: ক্লার্ক।

'ধন্যবাদ স্যার। একজন ডাক্তারের যা করণীয় তার বেশি কিছু করিনি স্যার।'

'ধন্যবাদ, মার্গারেট। রাখি, বাই।'

'বাই, স্যার।'

টেলিফোন রাখল মার্গারেট।

চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মার্গারেটের। গত দু'তিন দিনের উদ্বেগ ও বিষণœতা, ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে গেল মন থেকে। তার একটা ভয় ছিল, প্যাথেলজিক্যাল টেস্টে যদি কিছু না পাওয়া যায়, তাহলে তার বিরুদ্ধে ডা: ওয়াভেলের অভিযোগ আরও মজবুত হবে এবং প্রসূতি ওয়ার্ড তাকে অবশ্যই ছাড়তে হবে। তা যদি হয়, তাহলে আহমদ সুসার কাছে তার মুখ দেখাবার মত থাকবে না। আহমদ মুসা হয়তো ভাববে, আমার নির্বুদ্ধিতার কারণেই আহমদ মুসার একটা পরিকল্পনা মাঠে মারা গেল।

এই দু:সহ অবস্থায় তাকে যে পড়তে হলো না এ জন্যে সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। শিশু তিনটির প্যাথোলজিক্যাল টেস্টের এই রেজাল্ট পেলে আহমদ মুসা দারুণ খুশি হবে। কিভাবে মুসলিম পুরুষ শিশুগুলো মরছে

তার কারণ সে চিহ্নিত করতে চায়। কারণ চিহ্নিত হলে কারণের উতস সে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করবে।

এটা ভাবেত গিয়ে আহমদ মুসার হাস্যোজ্জ্বল মুখ ডা:মার্গারেটের চোখে ভেসে উঠল। তার সাথে সাথে তার হৃদয় এল প্রশান্তির একটা পরশ। তার মনে হলো,হৃদয়ের ফ্রেমে এ মুখটা এভাবেই সব সময় বাঁধা থাকতো! এটা ভাবতে গিয়ে চমকে উঠল ডা:মার্গারেট। একটা অনধিকার চর্চার ভয় ও লজ্জা এসে তাকে ঘিরে ধরল।

মন থেকে এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে হাসপাতালে যাবার জন্যে পা বাড়াল সে।

কিন্তু সংগে সংগেই পা আবার থেমে গেল। ভাবল, আহমদ মুসাকে বিষয়টা সে তো টেলিফেনে জানাতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল হাসপাতারৈ গিয়ে রিপোর্ট দেখে বিস্তারিত জানানোই ঠিক হবে।

পা বাড়াল আবার সে হাসপাতালে যাবার জন্যে। নিজস্ব গাড়িতে করে যাচ্ছে সে হাসপাতালে।

ডা:মার্গারেটের আব্বা ছিল একজন বৃটিশ সেনা অফিসার। সুতরাং নিজেদের গাড়ি, বাড়ি নিয়ে তারা গ্রান্ড টার্কস দ্বীপের সচ্ছল পরিবারের একটি।

তাদের বাড়িকে সবাই কর্নেলের বাড়ি বলে জানে। তার আব্বা কর্নেল র‍্যাংক থেকে রিটায়ার করে। ডাক্তার মার্গারেট ও জর্জ দু'টি সন্তানই মাত্র তার।

চলছে মার্গারেটের গাড়ি। গাড়িটা সুন্দর নতুন একটা কার। রাস্তায় তেমন ভীড় নেই।

ডা:মার্গারেট তার গাড়ির রিয়ারভিউতে দেখল, পিছন থেকে একটা ট্রাক আসছে নির্ধারিত গতির চেয়ে অনেক বেশি তীব্র বেগে।

ডা: মার্গারেট সাবধানতা হিসাবে তার গাড়িটাকে রাস্তার পাশ বরাবর চাপিয়ে নিয়ে ট্রাককে বেশি জায়গা দিয়ে দিল।

পরবর্তী কয়েক সেকেন্ড কি ঘটল ডা:মার্গারেট কিছুই বুঝল না। শুধু তার মনে হলো, ট্রাকটি এসে তার গাড়ির উপর পড়েছে। তারপর কিছুই মনে নেই তার। রাস্তার পাশ বরাবর ছিল রেলিং-এর পর খাল।

খালটি প্রাকৃতিক নয়, তৈরি করা। রাজধানী শহরের মধ্য দিয়ে খালটি দ্বীপের বুক চিরে সাগরে গিয়ে পড়েছে।

ট্রাকের প্রচন্ড ধাক্কায় ডা: মার্গারেটের গাড়িটা রেলিং ভেঙে ছিটকে গড়িয়ে পড়ল খালে।

হাসপাতাল বেডে জ্ঞান ফিরে পেয়ে ডা: মার্গারেট দেখতে পেল জর্জকে।

জর্জের চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং ঠোঁটে ফুটে উঠল হাসি। মুখে ফুটে উঠল স্বস্তির চিহ্ন।

ডা: মার্গারেটের ঠোঁটেও ফুটে উঠল ম্লান হাসি। ধীর কণ্ঠে বলল, 'এখন সময় কতরে জর্জ?'

'বিকেল পাঁচটা।'

উত্তরটা দিয়েই জর্জ আবার শুরু করল, 'মাথার আঘাতটাই বড়, কিন্তু তাতে বড় ধরনের ক্ষতি হয়নি। খুব অল্পের জন্যে খুব বড় ক্ষতি থেকে আল্লাহ তোমাকে বাঁচিয়েছেন। সবাই খুশী হয়েছে। ডা: ক্লার্ক, ডা: কনরাড দু'জনেই অপারেশনের সময় হাজির ছিলেন।'

'ডা: ওয়াভেল ছিলেন না?'

'উনি এসেছিলেন, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকেননি। কি কাজ থাকায় চলে যান।'

'আর কেউ আসেনি?'

'কেন, হাসপাতালের সব ডাক্তারই এসেছিল।'

'আর কেউ?' মার্গারেটের ঠোঁটে ম্লান হাসি।

জর্জ ডা: মার্গারেটের মুখের দিকে চাইল, তারপর চিন্তা করল।

পরক্ষণেই হেসে উঠল। বলল, 'হ্যাঁ ভাইয়া এসেছিলেন। দু'জন এক সাথে এসেছিলাম। তোমাকে দেখে তো উনিই প্রথম বলেন, 'আল্লাহ মার্গারেটেকে বাঁচিয়েছেন।'

ম্লান হাসল মার্গারেট। বলল, 'উনি আছেন?'

‘না আপা। উনি তোমাকে দেখেই দুর্ঘটনার স্পটে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে আবার হাসপাতালে এসেছিলেন। এসে আমার সাথে কিছু কথা বলেই আবার চলে গেছেন।’

বলে জর্জ তার গলার স্বরটা আর একটু নামাল এবং ডা: মার্গারেটের দিকে আর একটু ঝুকে পড়ে বলল, ‘শুরু থেকেই পুলিশ বলছে তোমার ওটা এ্যাকসিডেন্ট, সবাই বিশ্বাসও করেছে। কিন্তু আহমদ মুসা ভাই এ্যাকসিডেন্টের স্পট দেখে এসে আমাকে বলে গেলেন, ‘ট্রাকটি রাস্তার যেখানে এসে মার্গারেটের গাড়ির যে জায়গায় আঘাত করেছে, তাতে এই আঘাত নি:সন্দেহে পরিকল্পিত। সুতরাং এ্যাকসিডেন্ট নয়।’

ডা: মার্গারেটের মুখের আলোটা হঠাৎ দপ করে নিভে গেল। তার ভ্রু কুঞ্চিত হলো। বলল উদ্বিগ্ন কণ্ঠে, ‘ঠিক, আমারও এখন তাই মনে হচ্ছে। ট্রাকটার তীব্র গতি দেখে আমি আমার গাড়ি রাস্তার কিনার বরাবর সরিয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে এসেই ট্রাকটি আঘাত করে আমার গাড়িকে। ট্রাকটি কি এ্যাকসিডেন্টে পড়েছে?’

‘না পালিয়েছে।’

‘একমাত্র ব্রেক ফেল হলেই ট্রাকটা ঐভাবে আমাকে পাগলের মত আঘাত করতে পারতো। সে ক্ষেত্রে ট্রাকটিও এ্যাকসিডেন্টে পড়ত। তা যখন হয়নি, তখন ঠিকই ওটা এ্যাকসিডেন্ট নয়।’

‘কিন্তু আপা ওটা যদি এ্যাকসিডেন্ট না হয়, তাহলে প্রশ্ন জাগে কে তোমাকে ওভাবে হত্যা করতে চেয়েছিল?’

‘জানি না জর্জ। আমার কোন শত্রু আছে বলে হয় না।’

বলে একটু থেমেই ডা: মার্গারেট আবার বলল, ‘উনি কোথায় গেলেন?’

‘ভাইয়া?’

‘হ্যাঁ।’

‘যে ট্রাকটা এ্যাকসিডেন্ট ঘটিয়েছে, তার খোঁজ পাওয়া যায় কিনা উনি বলেছিলেন। কিন্তু কোথায় কি কাজে গেছেন আমি জানি না।’

ডা: মার্গারেট কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বলা হলো না। ঘরে প্রবেশ করলেন ডা: ক্লার্ক। তার সাথে ছিল ওয়ার্ডের ডাক্তার।

'এই তো সেরে গেছ মার্গারেট। তুমি খুব লাকি। মাত্র দেড়-দু'ইঞ্চির জন্যে ভয়ানক পরিণতি থেকে বেঁচে গেছ।'

বলতে বলতে ডা: ক্লার্ক ডা: মার্গারেটের সামনে এসে দাঁড়াল।

জর্জ উঠে আগেই পাশে সরে গেছে।

ডা: ক্লার্ক মার্গারেটের একটা হাত তুলে নিয়ে নাড়ী দেখে বলল, 'বাঃ সবকিছুই নরমাল।'

'ধন্যবাদ স্যার।' বলল মার্গারেট।

'শুনলাম, এ্যাকসিডেন্ট খুব মারাত্মক ছিল। অবশ্য তোমার কোন দোষ ছিল না। ট্রাকটাই হঠাৎ নাকি নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল।' ডা: ক্লার্ক থামল।

ডা: মার্গারেট একটু দ্বিধা করল। তারপর বলল, 'স্যার মাফ করবেন, ঐ রিপোর্টগুলো আপনি পেয়েছেন?'

মার্গারেটের প্রশ্নের সাথে সাথেই ডা: ক্লার্কের মুখ মলিন হয়ে গেল। মুহূর্ত কয়েক বাকহীন হয়ে থাকার পর ডা: ক্লার্ক বলল, 'ও তুমি ঘটনাটা এখনও জানতে পারনি। রিপোর্টগুলো এবং রিপোর্টের সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছু চুরি গেছে।'

'চুরি গেছে?'

'হ্যাঁ। ডা: বিশপ রাতে ডিউটি থেকে যাবার সময় রিপোর্ট তার ফাইলে রেখে গিয়েছিল এবং পরীক্ষিত ব্লাড, ইউরিন ইত্যাদি রীতি অনুসারে ল্যাবেই রাখা ছিল। তোমাকে টেলিফোন করার ক'মিনিট আগে ডা: বিশপ-এর টেলিফোন পাই। টেলিফোন করেই অফিসে যান। অফিসে গিয়ে রিপোর্ট এবং ওগুলোর কিছুই পাননি।'

বিষয়টা ডা: মার্গারেটের জন্যে শ্বাসরুদ্ধকর বিস্ময়ের। কিছুক্ষণ সে কথা বলতে পারল না। ডা: ক্লার্কই আবার কথা বলল বলল, 'আরও কিছু ঘটনা ঘটেছে। তুমি আমার ছাত্রী এবং মেয়ের মত। বলতে বাধা নেই। বিষয়টা খুব জটিল মনে হচ্ছে। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

একটু থামল ডা: ক্লার্ক। দু'পাশে তাকাল। দেখল সাথের ডাক্তার ও নার্স ওদিকের টেবিলের দিকে গিয়ে ডা: মার্গারেটের ফাইল নিয়ে আলোচনা করছে।

ডাক্তার ক্লার্ক বলল, 'চুরির খবর জানার সাথে সাথে আমি বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখি এবং থানায় কেস করার সিদ্ধান্ত নেই এবং পুনরায় লাশ তিনটিকে টেষ্টের চিন্তা করি। সংগে সংগেই বিষয়টা আমি ডা: ওয়াভেল ও ডা: বিশপকে জানিয়ে দেই। মাত্র আধ ঘণ্টা পরে আমি টেলিফোন পাই। একটা ভারি কণ্ঠ যান্ত্রিক স্বরে বলে, 'ডাক্তার সাহেব, তিনটি শিশুর প্যাথোলজিক্যাল টেষ্টের রিপোর্ট এবং আনুসঙ্গিক জিনিসগুলো হারানোর ব্যাপারে থানায় নাকি মামলা করছেন এবং লাশগুলোকে আবার নাকি পরীক্ষা করাবেন শুনলাম। শুনুন ডাক্তার, বিশেষ প্রয়োজনে ওগুলো আমরা নিয়েছি। আমরা চাই, নতুন টেষ্ট এবং থানায় মামলা করার ব্যাপারে এক ইঞ্চি এগুবেন না। এগুলে রিপোর্টগুলো যেভাবে গায়েব হয়েছে, সেভাবে আপনিও গায়েব হয়ে যাবেন।'

শুকনো কণ্ঠে কথাগুলো বলল ডা: ক্লার্ক। তার চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্ন।

'তারপর স্যার?' ভয় মেশানো উদগ্রীব কণ্ঠে বলল ডা: মার্গারেট।

'ডা: ওয়াভেলের সাথে আলাপ করলাম। ডা: বিশপ-এর সাথেও। ডা: ওয়াভল এই ছোট্ট বিষয় নিয়ে কোন ঝুঁকি নেয়ার বিরোধীতা করলেন। অন্যদিকে ডা: বিশপ ভীত হয়ে পড়েন। তবে মামলা ও টেষ্টের পক্ষে তিনি। কিন্তু আবার মামলার জড়িত হয়ে বিপদ ডেকে আনতে চান না। এই অবস্থায় মামলা করা ও নতুন পরীক্ষায় সাহস পাচ্ছি না।' বলল ডা: ক্লার্ক।

হতাশা নেমে এল ডা: মার্গারেটের চোখে মুখে। বলল, 'তাহলে শিশু তিনটির মৃত্যুর কারণ জানার আর উপায় রইল না স্যার। তার ফলে এভাবে হয়তো শিশু মৃত্যু ঘটেই চলবে।'

'স্যরি, মাই ডটার।'

বলে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ডা: ক্লার্ক বলল, 'তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠো। ঈশ্বর আছেন মার্গারেট।'

ডা: ক্লার্ক চলে যাবার অনেক সময় পর। ডা: মার্গারেট তার বেডে শুয়ে। আহমদ মুসা তার পাশে চেয়ারে বসে। জর্জ দাড়িয়েছিল আহমদ মুসার পেছনে। ডাক্তার, নার্স, কেউ তখন ঘরে নেই।

ডাক্তার মার্গারেট গত তিনদিনের কাহিনী বলছিল আহমদ মুসাকে। বলছিল কিভাবে সেদিন প্রথম মুসলিম শিশুটির মৃত্যু হওয়ায় সন্দেহ জাগে, কিভাবে মৃত শিশুর পোষ্টমর্টেম মার্গারেট দাবী করলে ডাক্তার ওয়াভেল তার বিরোধীতা করেন, কিভাবে ডাক্তার ক্লার্কের সমর্থনে শিশুটির লাশ পোষ্টমর্টেমে যায়, কিভাবে ১দিন পরে দু'টি মুসলিম শিশু দুর্বোধ্য রোগে সংকটজনক অবস্থায় পড়ে। ডা: মার্গারেট তার প্যাথোলজিক্যাল টেষ্টের সুপারিশ করেন এবং ডাক্তার ওয়াভেলের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন, কিভাবে তাদের টেষ্ট অবশেষে হয়, কিভাবে তিনটি টেষ্টের রিপোর্ট ও পরীক্ষিত আইটেম মিসিং হয়েছে, কিভাবে তার এ্যাকসিডেন্ট হয় এবং কিছুক্ষণ আগে ডা: ক্লার্ক তার উপর হুমকি আসার বিষয়ে কি বলে গেলেন।

গভীর মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনছিল আহমদ মুসা।

কাহিনী শেষ করে ডা: মার্গারেট থামলেও আহমদ মুসা কথা বলল না।

ভাবছিল সে। তার চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

বলল সে ডাক্তার মার্গারেটকে লক্ষ্য করে, 'তুমি দু'দিনে বহুদূর এগিয়েছ। শিশু তিনটির মৃত্যুর কারণ জানা গেল না, কিন্তু কারণের উৎস চিহ্নিত হয়ে গেছে। তোমাকে ধন্যবাদ মার্গারেট।'

ডা: মার্গারেটের চোখ-মুখ আনন্দের বন্যায় ভেসে গেল। আহমদ মুসা তার কাজের স্বীকৃতি দিয়েছে, প্রশংসা করেছে, এটুকু পাওয়ায় তার সব ব্যথা-বেদনা ভুলিয়ে দিল। দুর্বোধ্য একটা আনন্দের সুখ-শিহরণ খেলে গেল তার দেহ, মনে এবং প্রতিটি রক্ত কণিকায়।

একটু সময় নিয়ে ডাক্তার মার্গারেট বলল, 'উৎস চিহ্নিত হয়েছে? আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'এটুকু জেনে রাখ আইসবার্গের অনেক মাথার একটা মাথা ডা: ওয়াভেল হতে পারেন।'

বিস্মিত ডা: মার্গারেট কিছু বলতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'ডা: ওয়াভেলের বাসা কোথায়?'

'হাসপাতালের পাশেই ডাক্তারদের রেসিডেন্সিয়াল ব্লকে। নম্বার এফ-১৩।'

'ওর কোন ক্লিনিক আছে?'

'নিজস্ব ক্লিনিক নেই, কিন্তু একটা ক্লিনিকে তিনি বসেন। বাসায় আমার টেলিফোন ইনডেক্সে ঠিকানা আছে।'

'মার্গারেট তিনটি শিশুর নাম আমার দরকার। রিপোর্টে তাদের নাম যেভাবে আছে।'

মার্গারেট তাকাল জর্জের দিকে। কাগজ কলম নিতে বলল জর্জকে। মার্গারেট নাম তিনটি বলল লিখে নিল জর্জ। নাম লেখা স্লিপটা হাতে নিয়ে ভাঁজ করে পকেটে রাখতে রাখতে বলল, 'ধন্যবাদ মার্গারেট।'

'এসব নিলেন, কিছু করতে চাচ্ছেন?' বলল মার্গারেট উদ্বিগ্ন কণ্ঠে।

'কতটুকু কি করতে পারব জানি না। কিছু করতে তো হবেই এবং সেটা কাল সকালের আগেই।'

'কি সেটা?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠ মার্গারেটের।

'সবই জানবে, তবে এখন নয়, এখানে নয়।'

বলে উঠে দাঁড়াচ্ছিল আহমদ মুসা।

রুমে প্রবেশ করল লায়লা জেনিফার এবং সারা উইলিয়াম। কথা না বললে ওদের চিনতেই পারতো না আহমদ মুসা। দু'জনের পরণে ছেলের পোশাক। মাথায় হ্যাটও ছেলেদের। বলা যায় নিখুঁত ছদ্মবেশ।

বাইরে বেরুলে লায়লা জেনিফারকে ছদ্মবেশ নিতে বলা হয়েছে। এটা আহমদ মুসারই নির্দেশ।

বা! তোমরা সুন্দর ছদ্মবেশ নিয়েছ।' বলল জেনিফারদের আহমদ মুসা।

'না ভাইয়া, এ আমি পারব না। কি লজ্জা, তার চেয়ে ভাল আমি বাইরেই বেরুব না।' মুখ লাল করে বলল জেনিফার।

‘বেশিদিন এ কষ্ট করতে হবে না জেনিফার। দেখ তোমার তালিকায় এবার মার্গারেটও পড়েছে। আজ আল্লাহ তাকে বাঁচিয়েছেন। মার্গারেটকেও সাবধান থাকতে হবে।’

বলে আহমদ মুসা মার্গারেটের দিকে তাকিয়ে বলল, ’যে কয়দিন তুমি হাসপাতালে আছ, তেমন কোন ভয় নেই। কিন্তু তারপর আমার মনে হয় একটা বিপজ্জনক সময় তোমাকে পাড়ি দিতে হবে।’

‘কেমন?’ বলল মার্গারেট।

‘সামনে তুমি শত্রুর আরও বড় টার্গেট হয়ে দাঁড়াতে পার।’

‘জানি, আপনি বেশি বেশি ভয় দেখাচ্ছেন, যাতে আমি সাবধান হই।’

‘না মার্গারেট, সাউথ টার্কো দ্বীপের এক পর্যায়ের লড়াই সমাপ্ত হলো। আরেক লড়াই শুরু হয়ে গেছে।’ বলল গম্ভীর কণ্ঠে আহমদ মুসা।

থামল আহমদ মুসা। একটু থেমেই আবার শুরু করল, ‘সত্যি আমি একটু স্লো হয়ে গিয়েছিলাম, বুঝতে পারিনি, আঘাতটা দ্রুত আসবে। সবই আল্লাহর ইচ্ছা, কিন্তু আমার অসাবধানতার জন্যে মার্গারেটের জীবন বিপন্ন হয়েছিল।’

বিষন্ন হয়ে উঠল মার্গারেটের মুখ। বলল, ‘না পরিস্থিতিটা আপনাকে জানাইনি, এটা আমারই দোষ।’

‘না মার্গারেট, আমার এখন মনে হচ্ছে, খুব একটা চিন্তা না করেই তোমাকে কঠিন এক বিপদে ঠেলে দিয়েছি। হয়তো এই কাজটা অন্যভাবে করতে পারতাম।’

ডা: মার্গারেটের মুখে ক্ষোভের চিহ্ন ফুটে উঠল। চোখের দৃষ্টি আবেগে ভারি হয়ে উঠেছে তার। বলল, ‘সব বিপদ আপনি আপনার জন্যে বরাদ্দ করে নেবেন। কেন বিপদ মোকাবিলার মন, শক্তি কিছুই বুঝি আমাদের নেই। আদেশ দিয়ে দেখুন না, আগুনেও ঝাপ দিতে পারি কিনা।’ কণ্ঠ ভারি মার্গারেটের। কথা শেষ করেই ওপাশে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে মার্গারেট।

আহমদ মুসা হাসল। উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘ধন্যবাদ মার্গারেট তোমাদের। আমি নিশ্চিত, লড়াইয়ে আমরা জিতব। ক্যারিবিয়ান দ্বীপাঞ্চল তোমাদের যে পেয়েছে, এ জন্যে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।’

কথা শেষ করে আহমদ মুসা ফিরল জেনিফারের দিকে। আহমদ মুসা কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল। কিন্তু আহমদ মুসার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জেনিফার বলল, ‘ভাইয়া মার্গারেট আপা’র মত সাহসীদের লক্ষ্য করে ‘তোমাদের’ শব্দ বললেন, তার মধ্যে আমি আছি কিনা?’

‘কেমন করে থাকবে? একটা ছদ্মবেশ পরার ভয়ে বাইরে বেরুতে চাচ্ছ না। তাহলে কি পারবে তুমি বল?’ হেসে বলল আহমদ মুসা।

‘ঠিক আছে পারব না। একদিন একটা গাড়ি এ্যাকসিডেন্ট করে দেখাব।’

‘এ্যাকসিডেন্ট করো, কিন্তু আহত, নিহত না হও সেটা দেখো।’

‘তাতে কার কি ক্ষতি?’

‘এ প্রশ্নের জবাব জর্জ দিতে পারবে। তবে আমার একটা ক্ষতি আছে, ঝগড়া করা ও ঝামেলা পাকাবার লোক থাকবে না।’

‘আমি ঝামেলা পাকাই?’

‘তুমি ঝামেলা পাকিয়েই তো আমাকে নিয়ে এসেছ।’

বলেই আহমদ মুসা ‘চলি’ বলে হাঁটা শুরু করল কক্ষ থেকে বেরুবার জন্যে।

জেনিফার ছুটে গিয়ে আহমদ মুসার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, ‘আমার তো আরও কথা আছে। যেতে দেব না।’

আহমদ মুসা তাকে পাশ কাটিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল, ‘সাউথ টার্কো দ্বীপে পুলিশ প্রহরা ভালো চলছে। শত্রুদের চররা কিছুদিন সাউথ টার্কো দ্বীপে সক্রিয় ছিল, কিন্তু কোন খবর সংগ্রহ করতে না পেরে, তারা হাল ছেড়ে দিয়েছে, ইত্যাদি কথা বলবে তো আমি জানি।’

আহমদ মুসা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ডা: মার্গারেট আবার এ পাশ ফিরেছে। জেনিফারকে লক্ষ্য করে বলল, ‘তোমাকে উনি এত ¯েœহ করেন তাতো জানতাম না।’

‘আর আপনাকে যে উনি আকাশে তুললেন সেটা কি?’

‘আকাশে তোলা আর কাছে টানা এক জিনিস নয়।’

কথাটা বলেই মার্গারেট বুঝতে পারল মুখ ফসকে যা বলার নয় তাই বেরিয়ে গেছে। কথাটা সংশোধন করার জন্যে মার্গারেট সংগে সংগেই আবার বলল, 'তোমার মত অমন কাছে হতে পারা সবার জন্যেই সৌভাগ্যের।'

জেনিফার জর্জের দিকে চেয়ে একটা দুষ্টুমি হেসে ডাঃ মার্গারেটকে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ডাক্তার ও নার্স ঘরে এসে প্রবেশ করায় মুখ তেতো করে নীরব হয়ে যেতে হলো জেনিফারকে।

ডাঃ মার্গারেটের কক্ষ থেকে বের হয়ে আহমদ মুসা প্রথম কাজ ঠিক করল, ডাঃ ওয়াভেল কোথায় তা জানা।

আহমদ মুসা নিঃসন্দেহ যে, হয় ডাঃ ওয়াভেল নিজে রিপোর্টগুলো চুরি করেছে, না হয় সে চুরি করতে সাহায্য করেছে। সুতরাং তাকে পাওয়া দরকার।

আহমদ মুসা ছুটল ডিউটি রুমের দিকে।

ওয়ার্ডগুলোর প্রবেশ মুখে সিঁড়ি ও লিফট রুমের পাশেই ডিউটি রুম।

ওয়ার্ডে প্রবেশের আগে ডাক্তার ও ষ্টাফরা তাদের ডিউটি কার্ড রেজিষ্টার মেশিনে ঢুকিয়ে ডেট ও টাইম এন্ট্রি করিয়ে নেয়। ডিউটি থেকে ফেরার সময়ও তাই করে।

ডিউটি রুমে ডিউটি অফিসারের চেয়ারে একটি মেয়ে। কক্ষে সেই একমাত্র লোক।

আহমদ মুসা ঘরে ঢুকে গুড ইভনিং জানিয়ে ডিউটি অফিসার মেয়েটিকে বলল, 'একটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য পেতে পারি?'

'অবশ্যই। কি করতে পারি বলুন?' গোঁফওয়ালা আনকমন একজন যুবকের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে চেয়ে বলল মেয়েটি।

'আমি ডাঃ ওয়াভেল সম্পর্কে জানতে চাই। তিনি ডিউটিতে আছেন কিনা।'

মেয়েটি বলল, 'প্লিজ বসুন, এখনি জানাচ্ছি।'

বলে মেয়েটি তার সামনের কম্পুটারের দিকে মনোযোগ দিল। তার হাতের দুটো আঙুল কয়েকটি কম্পুটার নব-এর উপর ঘুরে এল।

কম্পুটার স্ক্রিনে ভেসে উঠল কয়েকটি শব্দ, কয়েকটি অংক। সেদিকে একবার চোখ বুলিয়েই মেয়েটি বলল, 'ডাঃ ওয়াভেল আধ ঘণ্টা আগে রাত ৭টায় চলে গেছেন। শরীর খারাপ বলে আজ একটু আগেই চলে গেছেন।'

শরীর খারাপ হওয়ার কথা শুনে হঠাৎ আহমদ মুসার মনে প্রশ্ন জাগল, এর মধ্যে কোন তাৎপর্য নেই তো!

আহমদ মুসা চট করে প্রশ্ন করল, 'অসুস্থ ছিলেন! কিন্তু আমাকে তো আসতে বলেছিলেন!'

'অসুস্থ ছিলেন না। হঠাৎ করেই খারাপ ফিল করে চলে গেছেন।' বলল মেয়েটি।

'এ রকম প্রায়ই তাঁর হয় বুঝি?' বলল আহমদ মুসা।

'না, এভাবে তার চলে যাবার দৃষ্টান্ত নেই।'

'তাহলে তাঁকে বাড়িতে পাওয়া যেতে পারে।'

'সম্ভবত।'

'অনেক ধন্যবাদ।' বলে আহমদ মুসা ডিউটি রুম থেকে বেরিয়ে এল।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে ভাবল আহমদ মুসা, 'ডাঃ ওয়াভেল নিশ্চয় অসুস্থ নন। কিন্তু অসুস্থতার কথা বলে আগেই চলে গেছেন কেন, যা তিনি কখনই করেননি। কোন জরুরী কাজে কি গেছেন? সে কাজটা কি?

আহমদ মুসা এই মুহূর্তেই ডাঃ ওয়াভেলের বাসায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

হাসপাতালের উত্তর পাশে ডাক্তারদের জন্যে নির্দিষ্ট রেসিডেন্সিয়াল ব্লকে ডাঃ ওয়াভেলের বাড়ি।

রেসিডেন্সিয়াল ব্লকের উত্তর প্রান্তের শেষ বাড়িটা ডাঃ ওয়াভেলের। এর পরেই শুরু হয়েছে আরেকটা রেসিডেন্সিয়াল ব্লক।

বাড়িটা খুবই নিরিবিলি।

আহমদ মুসা বাড়ির চারদিক দেখল। ব্লকের সব বাড়িই এক রকম। বাড়িতে ঢোকার প্রধান প্যাসেজ একটা। বাড়ির অন্য পাশে চাকর-বাকরদের জন্যে আরও একটা ছোট প্যাসেজ রয়েছে।

ডাক্তারের দর্শনার্থী একজন রোগীর মত স্বাভাবিক হেঁটে আহমদ মুসা বাড়িটার দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

রাত তখন ৮টা।

আহমদ মুসা তেমন একটা ছদ্মবেশ নেয়নি। মুখে একটা গোঁফ লাগিয়েছে মাত্র। মাথার হ্যাটটা কপালের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত নামানো।

দরজায় নক করল আহমদ মুসা।

আধা মিনিটের মধ্যেই দরজা খুলে গেল।

বার-তের বছরের একটা ছেলে দরজায় দাঁড়ানো।

দরজা খুলে যাওয়ার সাথে সাথে আহমদ মুসার দৃষ্টি ছুটে গেল ভেতরে।

দরজার পরেই একটা করিডোর। করিডোরটি প্রশস্ত।

করিডোরের দক্ষিণ দেয়ালে একটা দরজা। উত্তর দেয়ালেও আরেকটা। উত্তর দরজার উপরে শিরোনাম ‘টয়লেট’। অল্প পশ্চিমে এগিয়ে করিডোরটি বড়, ফাঁকা একটা স্পেসে গিয়ে শেষ হয়েছে।

‘কে আপনি? কাকে চাই?’ ছেলেটি প্রশ্ন করল।

‘আমি ডাঃ ওয়াভেলের সাথে সাক্ষাত করতে চাই। আছেন তিনি?’

‘আছেন। কি বলব তাকে?’

‘হাসপাতালে গিয়ে ওকে পাইনি, তাই এখানে এসেছি। খুব জরুরী দরকার।’

ছেলেটি করিডোরের দক্ষিণ পাশের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

এক মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে বলল, ‘উনি এখন ব্যস্ত। আধঘণ্টা পরে আসুন, নয়তো কাল হাসপাতালে দেখা করতে বলেছেন।’

‘ঠিক আছে তুমি গিয়ে বল, আমি আধঘণ্টা দাঁড়াচ্ছি।’

ছেলেটি আবার গেল সেই কক্ষে। আহমদ মুসার মনে হলো, কক্ষটি বাইরের ড্রইং রুম, নয়তো ডাঃ ওয়াভেলের পার্সোনাল কোন ঘর। করিডোরের সামনে যে সুদৃশ্য কার্পেট মোড়া স্পেস দেখা যাচ্ছে, ওটাই মূল ড্রইং রুম।

ছেলেটি ফিরে এসে বারান্দায় চেয়ার দেখিয়ে বলল, ‘এখানে তাহলে বসুন।’

বলেই ছেলেটি করিডোর দিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

ছেলেটি চলে যেতেই আহমদ মুসা ভেতরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল। তারপর পকেটে হাত দিয়ে রিভলবার স্পর্শ করে দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়ে ঘরটিতে প্রবেশ করল।

ঘরে তিনজন লোক। একদিকের সোফায় দু'জন, অন্যদিকে একজন।

একজন মধ্য বয়সী। অন্য দু'জন যুবক। আহমদ মুসা বুঝতে পারলো মধ্য বয়সী জনই ডাঃ ওয়াভেল। তারা মুখো-মুখি বসে। তাদের মাঝখানে টেবিলের উপর একটা ছোট ফাইল। আহমদ মুসা ঢুকেই দরজা লাগিয়ে দিল।

আহমদ মুসাকে ঢুকতে দেখেই ডাঃ ওয়াভেল ফাইলটি টেবিল থেকে সোফায় সরিয়ে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়েছে। তার চোখে তীব্র দৃষ্টি। বলল, 'কে আপনি?'

আহমদ মুসার দু'হাতই পকেটে।

ধীরে ধীরে এগুলো ওয়াভেলের দিকে।

ডাক্তার ওয়াভেলের সামনে বসা দু'জন লোক তখনও বসে। তাদের চোখ-মুখ দেখলে মনে হয় তারা ব্যাপারটা বুঝার চেষ্টা করছে।

আহমদ মুসা ডাঃ ওয়াভেলের কাছাকছি পৌছে ডাঃ ওয়াভেলকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'কি চাই বলছি ডাঃ ওয়াভেল, তার আগে ঐ ফাইলটা একটু দেখে নেই।'

আহমদ মুসার কথার সাথে সাথেই ডাঃ ওয়াভেলের মুখ মরার মত পাংশু হয়ে উঠল।

সোফায় বসা যুবক দু'জনও সংগে সংগে উঠে দাঁড়িয়েছে।

'ফাইলটি দিন ডাঃ ওয়াভেল। দু'বার বললাম। আমি এক আদেশ কিন্তু দু'বার দেই না।' চাপা কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা কথাগুলো।

ডাক্তার ওয়াভেলকে কথা বলার সময় আহমদ মুসা খেয়াল করেনি যে, যুবক দু'জন সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তাদের দু'জনেরই দুই পা তীব্র গতিতে এগুলো ভারি টিপয় লক্ষ্যে।

মুহূর্তেই টিপয় টেবিলটি উপরে উঠে তীব্র বেগে এল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা যখন টের পেল, তখন সময় ছিল না।

আহমদ মুসা টিপয়টির আঘাত খেয়ে পাশের সোফার উপর ছিটকে পড়ে গেল।

টিপয় ছুঁড়ে দেয়ার পর ওরাও ঝাঁপিয়ে পড়ল আহমদ মুসার ওপর। কিন্তু আহমদ মুসা টিপয়ের আড়ালে থাকায় তাকে বাগে আনা ওদের পক্ষে অসুবিধা হচ্ছিল।

ওদিকে আহমদ মুসা টিপয়ের ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলেও দু'হাত দিয়ে টিপয়টি সে অবশেষে ধরতে পেরেছিল। সুতরাং তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়া দু'জনকে টিপয় দিয়ে ধাক্কা মেরে তার উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে সংগে সংগে উঠে দাঁড়াল এবং পকেট থেকে রিভলবার হাতে তুলে নিল।

যুবক দু'জনও নিজেদের সামলে নেবার পর পকেট থেকে রিভলবার বের করেছিল এবং রিভলবার তুলছিল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

কিন্তু আহমদ মুসার রিভলবার আগেই উঠেছিল।

আহমদ মুসার সাইলেন্সার লাগানো রিভলবার পর পর দু'বার অগ্নি বৃষ্টি করল।

গুলী দু'টি যুবক দু'জনের রিভলবার ধরা হাত গুড়ো করে দিল।

ওদেরহাত থেকে রিভলবার ছিটকে পড়ল।

দু'জনেই আহত হাত চেপে ধরে বসে পড়ল।

আহমদ মুসা ওদের দু'টি রিভলবার কুড়িয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ডাঃ ওয়াভেলের দিকে।

ডাঃ ওয়াভেল তখন দাঁড়িয়ে কাঁপছিল।

আহমদ মুসা তাঁর দিকে রিভলবার তাক করে বাম হাত বাড়াল ফাইল নেবার জন্যে।

ডাঃ ওয়াভেল আহত যুবক দু'জনের দিকে একবার তাকিয়ে কম্পিত হাতে ফাইলটি সোফার উপর থেকে নিয়ে আহমদ মুসার হাতে তুলে দিল।

আহমদ মুসা তার দিকে রিভলবার তাক করে থেকেই ফাইলের উপর নজর বুলাল। দেখল, কম্পুটারে টাইপ করা চার-পাঁচ শিট কাগজ হোয়াইট ঈগল নামক সংস্থার প্যাডে। শিরোনাম দেখে চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার। শিরোনামে বড় বড় অক্ষরে লিখা, 'এ রিভিউ অব মুসলিম পপুলেশন কনট্রোল প্রজেক্ট অব ক্যারিবিয়ান রিজিওন।'

কিন্তু আহমদ মুসা ফাইলে শিশু তিনটির প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্ট পেল না।

ফাইল বন্ধ করে আহমদ মুসা তীব্র চোখে তাকাল ডাঃ ওয়াভেলে দিকে। বলল, 'চুরি করে আনা তিনটি প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্ট কোথায়?'

কাঁপতে কাঁপতে মরার মত মুখ করে ডাঃ ওয়াভেল বলল, 'আমি আনিনি, আমি জানিনা।'

আহমদ মুসার তর্জনি চাপ দিল রিভলবারের ট্রিগারে। বেরিয়ে গেল একটা গুলী নিঃশব্দে। গুলীটা ডাঃ ওয়াভেলের কানের উপর দিয়ে মাথার এক টুকরো চামড়া তুলে নিয়ে চলে গেল।

শক খাওয়া মানুষের মত কেঁপে উঠল ডাঃ ওয়াভেল।

আর এক মুহূর্ত দেরী করলে গুলী এবার মাথা গুড়ো করে দেবে।' স্থির, কঠোর কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

সংগে সংগেই ডাঃ ওয়াভেল কম্পিত হাতে পকেট থেকে কাগজের কয়েকটা শিট বের করে টিপয়ের উপর রাখল।

আহমদ মুসা কাগজের শিটগুলো তুলে নিয়ে দেখল, তিনটি শিশুরই পরীক্ষাগুলোর উপাত্ত এবং ডাক্তারের ডায়াগনসিস রয়েছে।

'ধন্যবাদ ডাঃ ওয়াভেল।'

বলে আহমদ মুসা পিছু হটে বেরুবার দরজার দিকে আসতে শুরু করল। আহত যুবকদের একজন জিজ্ঞেস করল, 'কে আপনি?'

'মানুষ এবং চোর আর অত্যাচারীদের যম।'

আহমদ মুসা ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে করিডোরে পথে বাড়ির ভেতর দিকে তাকাল। দেখল, করিডোরের মাথায় ফাঁকা স্পেসটাতে

একজন বয়স্ক মহিলা সহ কয়েকজন ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চোখে-মুখে ভয়ার্ত দৃষ্টি। আহমদ মুসা বুঝল, ভেতরের কথা তারা কিছু জানতে পেরেছে।

পরক্ষণেই আহমদ মুসা ভাবল, ওরা কি পুলিশে খবর দিয়েছে?

এই কথা ভাবার সাথে সাথেই আহমদ মুসা তাকাল বাইরের দরজার দিকে। দেখল, দরজা ভেতর থেকে লক করা। অথচ আহমদ মুসা দরজা তখন লক করে যায়নি।

আহমদ মুসার কাছে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে গেল। এই সময় আহমদ মুসা বাইরে বাড়ির সামনে গাড়ির শব্দ পেল।

আহমদ মুসা দ্রুত এগুলো মহিলাদের দিকে। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে দ্রুত বলল, 'মিসেস ওয়াভেল এই ফাইল আপনার স্বামী হাসপাতাল থেকে চুরি করে শত্রুদের দিতে যাচ্ছিল। আমি এটা উদ্ধার করে নিয়ে গেলাম। দেখুন আমার দু'হাতে গ্লাভস। এ ফাইলে এবং ভেতরের কাগজ-পত্রে আপনার স্বামীর ফিংগার প্রিন্ট আছে। পুলিশের হাতে আমি এখন ফাইলটি দিলে আপনার স্বামী দেশদ্রোহীতার অভিযোগে জেলে যাবে। বাইরে পুলিশ এসেছে, আপনি তাদের কি বলবেন ভেবে দেখুন।'

মিসেস ওয়াভেলের ভয়-কাতর মুখে উদ্বেগের ছায়া ফুটে উঠল। তার সামনে দাঁড়ানো শত্রু যুবকটির ঋজু কথাকে তার মন সত্য বলে মেনে নিতে বাধ্য হলো। তাছাড়া তার স্বামীর কিছু অস্বাভাবিক আচরণ এবং আজ দেখা একটা ফাইলের কথা তার মনে পড়ে গেল।

বাইরে থেকে নক হতে শুরু করেছে।

আহমদ মুসার দিকে একবার তাকাল মিসেস ওয়াভেল। আহমদ মুসার হাতের রিভলবারও দেখল সে। তারপর এগুলো বাইরের দরজার দিকে।

দরজা খুলল মিসেস ওয়াভেল।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একজন পুলিশ অফিসার। বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে আরও দু'জন। আরেকজন পুলিশ গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসে তখনও।

'গুড ইভনিং। আপনারা?' পুলিশদের দিকে তাকিয়ে পুলিশ অফিসারকে লক্ষ্য করে বিস্মিত কণ্ঠে বলল মিসেস ওয়াভেল।

‘কেন, আপনারা পুলিশকে টেলিফোন করেননি? আপনার বাসার নম্বার ১৫-এর এ নয়?’

‘হ্যাঁ। কিন্তু আমরা তো এ ধরনের টেলিফোন করিনি?’

‘এটা কি ডাঃ ওয়াভেলের বাড়ি নয়?’

‘হ্যাঁ।’

‘আমাদের তো বলা হয়েছে ডাঃ ওয়াভেল সন্ত্রাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে।’

হেসে উঠল মিসেস ওয়াভেল। বলল, ‘কেউ নিশ্চয় আপনাদের মিস গাইড করেছে। দুঃখিত।’

‘স্যরি, আপনাদের বিরক্ত করার জন্যে।’ বিষণœ কণ্ঠে বলল পুলিশ অফিসারটি।

পুলিশের গাড়ি চলে গেল।

পুলিশ চলে গেলে মিসেস ওয়াভেল ফিরে এল।

‘ধন্যবাদ মিসেস ওয়াভেল। পুলিশ চলে যাওয়ায় আমি বাড়তি ঝামেলা থেকে বাঁচলাম। আপনার স্বামীও বাঁচল। ঐ ঘরে আপনার স্বামীর সাথে দু’জন ক্রিমিনাল রয়েছে। ওদের স্বার্থেই আপনার স্বামী হাসপাতাল থেকে এই ফাইল চুরি করেছিল।’ বলে আহমদ মুসা যাবার জন্যে পা বাড়াল।

‘থামুন।’ পেছন থেকে বলল মিসেস ওয়াভেল।

ফিরে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

‘আপনি কে? আপনি হাসপাতালের লোক?’

‘আমি মিথ্যা বলব না। তাই আপনার এ প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না। এটুকু জেনে রাখুন, আমি আপনাদের শত্রু নই। আপনারাও আমার শত্রু নন। এক ক্ষতিকর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়েই আমাকে এখানে এভাবে আসতে হয়েছে।’

‘কি ষড়যন্ত্র?’

‘আমি এখন বলতে পারবো না।’

‘আমি বলি?’

চমকে উঠে আহমদ মুসা মিসেস ওয়াভেলের মুখের দিকে তাকাল। বলল, 'আপনি জানেন?'

'জানি। ক্যারিবিয়ান এলাকা থেকে মুসলিম জনসংখ্যা বিনাশের ষড়যন্ত্র। একটা গোপন ফাইল হঠাৎ আমার হাতে আসায় আমি জেনেছি।'

'ষড়যন্ত্র আপনি সমর্থন করেন?'

'না। আমার স্বামীও করেন না। কিন্তু বাঁচতে হলে ষড়যন্ত্রে সহযোগিতা না করে তাঁর উপায় নেই।'

একটু থামল মিসেস ওয়াভেল। একটা ঢোক গিলেই আবার শুরু করল, 'কিন্তু আপনি এমন একটা দু'টো ফাইল উদ্ধার করে, দু'চারজনকে মেরে বা হত্যা করে এ ষড়যন্ত্রের সামান্য গতিরোধও করতে পারবেন না। এ পন্ডশ্রম হবে মাত্র।'

কৌতুহলী চোখে আহমদ মুসা মিসেস ওয়াভেলে দিকে তাকাল। বলল, 'তাহলে এ ষড়যন্ত্র অপ্রতিরুদ্ধ আপনি মনে করেন?'

'তা মনে করি না। কিন্তু যে আন্তর্জাতিক প্রচার-প্রতিক্রিয়া এর গতিরোধ করতে পারে, তা এখানে কারো হাতে নেই।'

বিস্মিত হলো আহমদ মুসা মিসেস ওয়াভেলের কথা শুনে। বলল, 'আপনি শুধু মিসেস ওয়াভেল নন, কে আপনি?'

'আমি মিসেস ওয়াভেল, সেই সাথে চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের অধ্যাপিকা।' গম্ভীর কণ্ঠে বলল মিসেস ওয়াভেল।

'আপনি কেন আমাকে সহযোগিতা করলেন? ঐ ষড়যন্ত্র পছন্দ করেন না বলেই কি?'

'সেটা তো বটেই। আরও কারণ আছে?'

'কি সেটা?'

'আমি টার্কস দ্বীপপুঞ্জের সকল মানুষের ঐক্য ও মিলনে বিশ্বাসী।'

'কেন?'

'আপনি কে না জানলে এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

আহমদ মুসা গভীরভাবে দেখছিল মিসেস ওয়াভেলকে। যেন তার দৃষ্টি প্রবেশ করেছে মিসেস ওয়াভেলের অন্তরেও। বলল আহমদ মুসা, 'আপনার উত্তরটা আমিই দেই?'

কিছুটা বিস্ময় মিসেস ওয়াভেলের চোখে। বলল, 'বলুন।'

'আপনি এই দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীনতা চান।'

চমকে উঠল মিসেস ওয়াভেল। তার চোখে এবার রাজ্যের বিস্ময়। বিস্ময়ের ধাক্কায় কিছুক্ষণ সে কথা বলতে পারল না। একটু পর বলল, 'কে আপনি?' অনেক প্রশ্ন ও কৌতুহলের ভীড় তার চোখে এবং কিছুটা ভয়ও।

'ভয় নেই। আমি সরকারী গোয়েন্দা নই।'

'কিন্তু কে আপনি?'

'দুঃখিত, আপনার এ প্রশ্নটার উত্তর এখন দিতে পারছি না। তবে পরিচয়টা আপনাকে দেয়া যাবে।'

'আরেকটা প্রশ্ন, আপনি অনুমানটা কিসের ভিত্তিতে করলেন?'

'অনুমানটা সত্যি কিনা?'

'দয়া করে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।'

'খুব সহজ উত্তর। আপনি 'হোয়াইট ন্যাশনালিজম ষড়যন্ত্রের বিরোধী, অন্যদিকে টার্কস দ্বীপপুঞ্জের সব মানুষের ঐক্য চান। কেন চান? কোন স্বার্থে চান? কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য চান? এসব প্রশ্নের উত্তর একটাই, আপনি ঐ দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। দ্বীপপুঞ্জের সব মানুষের ঐক্যের মাধ্যমেই এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব।'

বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে উঠল মিসেস ওয়াভেলের চোখ। বলল, 'সত্যি কে আপনি? না বললে আমি উদ্বেগে থাকবো।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'উদ্বেগের কারণ নেই। আমি বৃটিশ সরকারের লোক নই। আমি মিথ্যা কথা বলি না।'

বলে আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরুবার জন্যে দরজার দিকে হাঁটা শুরু করল।

আহমদ মুসার চলার পথের দিকে তাকিয়ে ছিল মিসেস ওয়াভেল।

‘অদ্ভুত লোক তো আম্মা?’

‘অদ্ভুত শুধু নয়, অকল্পনীয় এক চরিত্র।’

বলেই মিসেস ওয়াভেল ছুটল বন্ধ ড্রইং রুমের দিকে যেখানে তার স্বামী বন্ধ আছে।

ফার্ডিন্যান্ড মাথা নিচু করে তিনটি মুসলিম পুরুষ শিশুর মৃত্যু নিয়ে ডাঃ মার্গারেট ও ডাঃ ওয়াভেলের কাহিনী, ডাঃ ওয়াভেল কর্তৃক প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্ট চুরির কথা এবং সর্বশেষ ডাক্তার ওয়াভেলের বাড়িতে একজন মাত্র যুবক এসে কিভাবে তিনজনকে আহত করে মুসলিম পপুলেশন কনট্রোল রিভিউ রিপোর্ট ও প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্টগুলো নিয়ে গেল তার কাহিনী শুনছিল।

তার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল ডাঃ ওয়াভেলের ড্রইং রুম থেকে ফিরে আসা সেই দুই যুবক এবং পাশের একটি সোফায় বসেছিল অপারেশন চীফ হিসেবে নতুন দায়িত্ব প্রাপ্ত হের বোরম্যান।

যুবক দু’জনের কথা শেষ হলে মাথা তুলল ফার্ডিন্যান্ড। তার দুই চোখ রক্তের মত লাল। তীব্র কণ্ঠে বলল, ‘একজন লোক এসে তোমাদের জীবনের চেয়ে মূল্যবান রিপোর্ট নিয়ে তোমাদের ঘরে বন্ধ করে বেরিয়ে গেল। আর তোমরা এটা জানাতে এসেছ?’

বলে ফার্ডিন্যান্ড পকেট থেকে রিভলবার বের করে যুবক দু’জনকে লক্ষ্য করে দু’টি গুলী করল। দু’জনেই বুকে গুলী খেয়ে ছিটকে পড়ল মেঝেয়।

উঠে দাঁড়াল ফার্ডিন্যান্ড। বলল বোরম্যানকে লক্ষ্য করে, ‘জায়গাটা পরিষ্কার করতে বলে তুমি এস আমার অফিসে।’

অফিসে এসে নিজের চেয়ারে বসল ফার্ডিন্যান্ড। ভীষণ অস্থির সে। একের পর এক বিপর্যয়, সর্বশেষে অত্যন্ত গোপনীয় রিভিউ রিপোর্টসহ গুরুত্বপূর্ণ প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্ট হাত ছাড়া হয়ে যাওয়াকে সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না।

চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজল সে। না, তাতে করে অস্থিরতা আরও কিলবিলিয়ে উঠছে।

উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে লাগল ফার্ডিন্যান্ড। ঘরে ঢুকল হের বোরম্যান। ফার্ডিন্যান্ড তার চেয়ারে ফিরে এল। বসল বোরম্যানও।

'কি বুঝছ বোরম্যান?' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ফার্ডিন্যান্ড।

'আমার মনে হয় সেই এশীয় যুবকই সব অনর্থের মূল। চেহারার যে বিবরণ ওদের দু'জনের কাছে পাওয়া গেছে তাতে সেই এশীয়ই সেদিন রিপোর্টগুলো ছিনিয়ে নেবার মত অঘটন ঘটিয়েছে।'

'কিন্তু এই এশীয় কে? তাকে কোথায় পাওয়া যাবে? সে কেন আমাদের পেছনে লেগেছে? ওখানকার পুলিশ কি বলে?'

'পুলিশের কাছে কোন এশীয় সম্পর্কে কোন রিপোর্ট নেই, তথ্যও নেই।'

'সে থাকছে কোথায় কিংবা কাদের সাথে যোগাযোগ রাখছে তা না জানলে তো আমরা এগুতেই পারছি না।'

'ডাঃ মার্গারেট আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হবার পর তার কক্ষে একজন এশীয়কে ঢুকতে দেখা গেছে।'

চেয়ারে সোজা হয়ে বসল ফার্ডিন্যান্ড। তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বলল, 'এ খবর তো আমাকে দাওনি?'

'ওদের দু'জনের কাছ থেকে আজই তো শুনলাম।'

'ডাঃ মার্গারেটের কক্ষে এশীয়টির যাওয়ার খবরকে তুমি কিভাবে দেখছ?'

'পেশেন্ট হিসেবে পরিচয়ের কারণে ডাক্তারের এ্যাকসিডেন্টের খবরে তার কাছে যেতে পারে। আবার কোন সম্পর্কের সূত্র ধরেও যেতে পারে।'

'আমি জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি ভাবছ?'

'আমার মনে হয়, সম্পর্কের সূত্র ধরেই গেছে।'

'তোমার এই মনে হওয়ার কারণ?'

'তিনটি মুসলিম পুরুষ শিশুর প্যাথোলজিক্যাল টেষ্ট করাবার যে জেদ ডাঃ মার্গারেটের এবং এ নিয়ে ডাঃ ওয়াভেলের সাথে তার যে আচরণ তা থেকে

মনে হয় নিছক ডাক্তার হিসেবে নয় কোন উদ্দেশ্য নিয়েই এটা তিনি করেছেন। এই সন্দেহ হওয়ার কারণেই ডাঃ ওয়াভেলের পরামর্শে টার্কস দ্বীপপুঞ্জের হোয়াইট ঈগল শাখা তাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল।'

'তোমাকে ধন্যবাদ বোরম্যান। তুমি অবশেষে ঠিক ভেবেছ। আসলে আমরা ভুল করছি, ডাঃ মার্গারেটকে টার্কস দ্বীপপুঞ্জের হোয়াইট ঈগল সন্দেহ করার সংগে সংগে আমাদের সক্রিয় হওয়া দরকার ছিল।'

'কিন্তু টার্কস দ্বীপপুঞ্জের হোয়াইট ঈগল তো যথাসময়ে সক্রিয় হয়েছে এবং দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে ডাঃ মার্গারেটকে।' বলল বোরম্যান।

'এখানেই তাদের ভুল হয়েছে এবং এ ভুল আমরা শুধরে দেইনি।'

'ভুলটা কি?'

'ডাঃ মার্গারেটকে হত্যা করে কি হবে? ডাঃ মার্গারেট গেলে আরেক ডাক্তার মার্গারেট তৈরি হবে। আসল হলো, ডাঃ মার্গারেটকে দিয়ে এসব যে করাচ্ছে তাকে চিহ্নিত করা এবং তাকে হত্যা করা। তাহলেই ডাঃ মার্গারেট আর তৈরি হবে না।'

'ঠিক বলেছেন।'

'ঠিক বললাম, কিন্তু সেটা ক্ষতি হবার পর।'

'এশীয়টা ঐ রিপোর্টগুলো নিয়ে কি করতে পারবে! মিডিয়া তো আমাদের দখলে। সরকারকে এসব জানিয়েও কোন লাভ হবে না।'

'কি করবে, সেটা আমার কাছেও স্পষ্ট নয়। অপেক্ষা করতে হবে এ জন্যে। কিন্তু একটা ক্ষতি হয়েছে, আমাদের পরিকল্পনা আমাদের হাতের বাইরে চলে গেছে।'

ফার্ডিন্যান্ড থামলেও বোরম্যান কিছু বলল না। ভাবছিল সে।

কিছুক্ষণ পর ফার্ডিন্যান্ডই মুখ খুলল। বলল, 'কি ভাবছ বোরম্যান?'

'ভাবছি এখন কি করণীয়।'

'এটা নিয়ে এত চিন্তা করতে হয়? কি করতে হবে তা কি পরিষ্কার নয়?'

'কি সেটা স্যার?'

'আগের ভুলের সংশোধন।'

'কিভাবে?'

'ডাঃ মার্গারেটকে হত্যা নয়, তাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে হবে। বের করতে হবে ঐ এশীয়টির পরিচয় তার কাছ থেকে।'

মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল বোরম্যানের। বলল, 'ধন্যবাদ স্যার। এটাই এখন একমাত্র পথ।'

ফার্ডিন্যান্ড কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গেল। তাকাল ইন্টারকমের দিকে। সেখানে একটা সবুজ সংকেত।

ইন্টারকমের একটা বোতামে চাপ দিল ফার্ডিন্যান্ড। ওপার থেকে তথ্য চীফ মার্ক পল-এর গলা শুনা গেল। বলল, 'কেন্দ্র থেকে একটা ডকুমেন্ট এসেছে স্যার।'

'নিয়ে এস।' বলল ফার্ডিন্যান্ড।

তথ্য চীফ মার্ক পল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘরে প্রবেশ করে একটা ইনভেলাপ তুলে দিল ফার্ডিন্যান্ডের হাতে।

হাতে নিয়েই খুলল ইনভেলাপ ফার্ডিন্যান্ড। ভেতরের কাগজের উপর চোখ পড়তেই বুঝল, হোয়াইট ঈগল-এর হেড কোয়ার্টার থেকে আসা মাসিক সিচুয়েশন রিপোর্ট। সমকালিন পরিস্থিতির উপর এই রিপোর্টে থাকে আমেরিকান মহাদেশের উপর বিগত মাসের পর্যবেক্ষণ।

ফার্ডিন্যান্ড হের বোরম্যান-এর দিকে তাকিয়ে বলল, 'বস, রিপোর্টে কি আছে দেখা যাক।'

বলে রিপোর্টটা পড়তে লাগল ফার্ডিন্যান্ড,

"গত মাসে গোটা আমেরিকা বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকা থেকে আমাদের প্রতিনিধিরা হেড কোয়ার্টারকে যা জানিয়েছে, তা উদ্বেগজনক কিছু পুরাতন প্রবণতা নতুন করে তীব্র হওয়া এবং আমাদের পরিকল্পনা বাচনাল করার লক্ষ্যে পরিচালিত কিছু মারাত্মক ঘটানা ঘটেছে। গত মাসের পরিস্থিতির প্রধান দিকগুলো হলো: এক. রেড ইন্ডিয়ানদের সাথে মুসলিম সখ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত মাসে ১০ জন রেড ইন্ডিয়ান তরুণীর সাথে মুসলিম

তরুণের এবং ৮ জন মুসলিম তরুণীর সাথে রেড ইন্ডিয়ান তরুনের বিয়ে হয়েছে। সব ক্ষেত্রেই রেড ইন্ডিয়ান পরিবার ইসলাম গ্রহণ করেছে স্বতস্ফুর্তভাবে। উদ্বেগজনক হলো, আগে মুসলিম তরুণীরা রেডইন্ডিয়ানদের ঘরে যায়নি, কিন্তু এখন যাওয়া শুরু করেছে। অন্যদিকে গত এক বছরে মাত্র তিনজন রেড ইন্ডিয়ান তরুণী আমেরিকান শ্বেতাংগ তরুণের সাথে বিয়ে হয়েছে, কিন্তু একজন রেডইন্ডিয়ান তরুণও শ্বেতাংগ তরুণীকে বিয়ে করেনি। আর উল্লেখিত তিনটি বিয়ের কোন রেড ইন্ডিয়ান তরুণীই খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেনি। দুই. মুসলিম রেড ইন্ডিয়ান বিয়ের ৫০ ভাগ হয়েছে আমেরিকায় জন্মগ্রহণকারী এশীয় ও আফ্রো-আমেরিকান ব্ল্যাক মুসলমানের সাথে। আর ৫০ ভাগ চীন, কোরিয়া, জাপান, ফিলিপাইন ও তুর্কিস্থান এলাকা থেকে সদ্য আসা আমেরিকান নাগরিকত্ব পাওয়া মুসলমানদের সাথে হয়েছে। তিন. আমেরিকানস ইন্ডিয়ানস মুভমেন্ট (AIM) নতুন করে জোরদার হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। গত মাসের ২৫ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিয়ন ষ্টেটের প্রাচীন রেডইন্ডিয়ান নগরী 'কাহোকিয়া'তে 'এইম' (AIM) এর বিরাট সম্মেলন হয়েছে। সে সম্মেলনে প্রধান যে দাবী তারা তুলেছে তা হলো, মিসিসিপি ও সংলগ্ন অন্যান্য নদীর তীর বরাবর সতের শ' রেড ইন্ডিয়ান নগরী ছিল যা ইউরোপিয়ানরা ধ্বংস করেছে, সে সব রেড ইন্ডিয়ান নগরীর পুনস্থাপন করতে হবে এবং রেড ইন্ডিয়ানদেরকে তা ফেরত দিতে হবে। দ্বিতীয় যে দাবী তারা করেছে তা হলো, ইউরোপিয়ানরা আমেরিকায় আগমনের সময় অর্থাৎ ১৪৯২ সালের দিকে আমেরিকায় রেড ইন্ডিয়ানদের সংখ্যা ছিল দুই কোটি যার মধ্যে ৫০ লাখ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই রেড ইন্ডিয়ান জনসংখ্যা গত ৫শ' বছরে সাড়ে সাত কোটিতে উন্নীত হবার কথা ছিল। কিন্তু ইউরোপীয় গণহত্যার শিকার হয়ে তাদের সংখ্যা বাড়ার বদলে তা ৫০ লাখ থেকে আজ ১৪ লাখে নেমে এসেছে। এই গণহত্যার বিচার তারা চাচ্ছে না, কিন্তু রেড ইন্ডিয়ানদের ন্যায্য ভূখন্ডগত অধিকার রক্ষার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাংশে মিসিসিপি নদীর পশ্চিম ও পূর্ব এলাকায় তাদের রিজার্ভ এলাকার সংখ্যা ২৮৫ থেকে ১০০০-এ উন্নীত করতে হবে। চার. বিশেষ উদ্বেগজনক ঘটনা ঘটেছে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের টার্কস দ্বীপপুঞ্জে। গত মাসে এই দ্বীপাঞ্চল হোয়াইট

ঈগলের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে আমাদের দেড়শ' লোক হারিয়ে গেছে অর্থাৎ প্রাণ হারিয়েছে। কিন্তু যাদের দ্বারা এতবড় ঘটনা ঘটল তাদের চিহ্নিত করা যায়নি। উপরন্তু ঐ অঞ্চলে এখন বৃটিশ পুলিশ এমন তৎপরতা শুরু করেছে যার ফলে আমাদের প্রতিশোধমূলক সশস্ত্র পদক্ষেপের কর্মসূচী বাদ দিতে হয়েছে। পাঁচ. গত মাসে আমেরিকায় অশ্বেতাংগ জনসংখ্যা বেড়েছে শূন্য দশমিক দুই পাঁচ (০.২৫) ভাগ, আর শ্বেতাংগ জনসংখ্যা বেড়েছে শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ (০.০৫) ভাগ। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গত মাসে অশ্বেতাংগ বৃদ্ধি পেয়েছে শূন্য দশমিক এক পাঁচ (০.১৫) ভাগ এবং শ্বেতাংগ জনসংখ্যা কমেছে শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ (০.০৫) ভাগ।

উল্লেখিত এসব তথ্য প্রমাণ করছে শত শত বছরের চেষ্টায় শ্বেতাংগরা যে অধিকার অর্জন করেছে, তাতে ভাগ বসাতে আসছে অশ্বেতাংগরা। আর এ পরিস্থিতি 'হোয়াইট ঈগল'-এর প্রয়োজনকে সর্বোচ্চে তুলে ধরেছে।'

রিপোর্ট পড়া শেষ করল ফার্ডিন্যান্ড। পড়তে পড়তেই তার মুখটা শক্ত হয়ে উঠেছিল।

পড়া শেষ করেই ফার্ডিন্যান্ড টেবিলে একটা প্রচন্ড মুষ্টাঘাত করে বলল, 'কয়েক ঘন্ডা রেড ইন্ডিয়ানকে বাঁচিয়ে রাখার কি দরকার ছিল? দাস প্রথা উচ্ছেদের আগে বা পরে কেন আমরা ব্ল্যাকদেরকে আফ্রিকায় ঠেলে দেইনি? এরাই তো অশ্বেতাংগ জনসংখ্যা বাড়াচ্ছে আমেরিকায়। আর এরাই তো আবার ইসলাম গ্রহণ করে আমেরিকায় মুসলমানদের সংখ্যা বাড়াচ্ছে। এদের কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানরা দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় জাতি গোষ্ঠীতে পরিণত হতে যাচ্ছে।'

'স্যার, রেডইন্ডিয়ানদের বাঁচিয়ে রাখা এবং ব্ল্যাকদের শুধু দেশে রাখা নয়, তাদেরকে আমরা আমেরিকায় বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন অধিকার দিয়ে মাথায় তুলেছি। আজ রেড ইন্ডিয়ানরা এত বড় দাবী তুলতে পারছে কারণ অতীতে মার্কিন সরকার রেড ইন্ডিয়ানদের এ ধরনেরই দাবী নানাভাবে মেনে নিয়েছে। সত্তর দশকের শুরুর দিকে হঠাৎ করে রেড ইন্ডিয়ানরা শত শত বছর আগে শ্বেতাংগদের হাতে তাদের যে জমি চলে গেছে তা উদ্ধারের জন্যে মামলা করতে শুরু করে। পাসামোকাই ও পেনরস্কট নামে দু'টি রেড ইন্ডিয়ান গোত্র

মামলা করে ‘মেইন’ ষ্টেট-এর ১২ মিলিয়ন একর অর্থাৎ রাজ্যটির দুই তৃতীয়াংশের দখল দাবী করে বসে। মার্কিন সরকার অনেক অনুরোধ করে ৮২ মিলিয়ন ডলার দিয়ে রেড ইন্ডিয়ানদেরকে মামলা প্রত্যাহারে রাজী করে। আবার ১৯৮৭ সালের দিকে ম্যাসাচুসেটস ষ্টেটে ওয়ামপানগ রেড ইন্ডিয়ান গোত্রের অনুরূপ দাবী প্রায় ৫ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে রফা করে। এর আগের আরেকটা বড় ঘটনা ঘটে। ১৯৮০ সালে মার্কিন সুপ্রীমকোর্ট ১৯৮৭ সালে সাউথ ডাকোটার রেড ইন্ডিয়ানদের যে জমি শ্বেতাংগরা জোর করে কুক্ষিগত করে তার জন্যে রেড ইন্ডিয়ানদেরকে প্রায় ১২৩ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে মার্কিন সরকারকে বাধ্য করে। এইভাবে রেড ইন্ডিয়ানদের দাবীর যৌক্তিকতা সরকার এবং কোর্ট স্বীকার করে নিয়েছে। সন্দেহ নেই, এর উপর ভিত্তি করেই তাদের জন্যে বরাদ্দ রিজার্ভ এলাকার পরিমাণ ২৮৫ থেকে ১০০০-এ উন্নিত করার দাবী করেছে।’ বলল বোরম্যান।

‘ধন্যবাদ বোরম্যান। ঠিকই বলেছ তুমি। সরকারের আইন ও মানবতাবাদী এই সর্বনাশা চেহারা শ্বেতাংগ জনগণের কাছে উন্মুক্ত করে দিতে হবে। কিন্তু রেড ইন্ডিয়ানদের ও মুসলমানদের সাথে এই দহরম-মহরমের কি করা যাবে?’ বলল ফার্ডিন্যান্ড।

‘স্যার, এটা ঐতিহাসিক সম্পর্কের একটা ফল। মূলের দিকে ফিরে যাওয়া মানুষের একটা স্বভাব বা প্রবণতা। রেড ইন্ডিয়ানরা তাই করছে। রেড ইন্ডিয়ানদের পূর্ব পুরুষ এশিয়া থেকে আমেরিকায় আসে। বিশেষ করে পূর্ব এশিয়ার চীন, জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, তুর্কিস্থান এলাকার মঙ্গোলীয় ও মিশ্র মঙ্গোলীয় জাতি-গোষ্ঠী বরফ ঢাকা বেরিং প্রণালী পথে আমেরিকায় আসে। এরাই আমেরিকার প্রথম মানুষ। রেড ইন্ডিয়ানরা এদেরেই বংশধর। সুতরাং এশিয়ানদের প্রতি, এশিয়ান কালচারের প্রতি তাদের দূর্বলতা রয়েছে।’

‘কিন্তু প্রশ্নটা এশিয়ানদের নিয়ে নয়, মুসলমানদের নিয়ে।’

‘একই কথা স্যার। এশিয়ানরাই তাদের কাছে ইসলাম নিয়ে আসে। ৮ম থেকে দ্বাদশ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে মুসলিম নাবিকরা, তাদের সাথে মুসলিম পর্যটক, ব্যবসায়ী ও মিশনারীরা পৃথিবীর গোটা সমুদ্র এলাকা চষে ফিরেছে।

তাদেরই অনেকে আফ্রিকা থেকে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে এবং বেরিং প্রণালী হয়ে বা ফিলিপাইন থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় আসে। এরা ছিল এশিয়ান এবং প্রশান্ত মহাসাগর পথে যারা আসে তাদের অধিকাংশই মঙ্গোলীয় জাতি গোষ্ঠীর মুসলমান, যাদের সাথে রেড ইন্ডিয়ানদের মিল রয়েছে। রেডইন্ডিয়ানরা অনেক ক্ষেত্রে তাদের এশিয়ান ভাইদের বুকে জড়াবার সাথে সাথে ইসলামকেও বুকে জড়িয়ে নেয়। মুসলামানদের প্রতি রেডইন্ডিয়ানদের বিশেষ দুর্বলতার কারণ এটাই।'

'জানি বোরম্যান। কিন্তু এটা যে সর্বনাশা প্রবণতা। রেডইন্ডিয়ানদের ঘরে শ্বেতাংগ মেয়ে যাওয়া বন্ধ হয়েছে, এটা একটা ভালো প্রবণতা। কিন্তু রেড ইন্ডিয়ান ও মুসলমানদের মিলন বন্ধ করা যাবে কি করে?'

'পথ একটাই রেড ইন্ডিয়ান ও মুসলমানদের ঘরে কোন মেয়ে দেযা যাবে না এবং তাদের মেয়ে আনাও যাবে না। উভয় ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। মুসলমান ও রেড ইন্ডিয়ানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি শূন্যে নামিয়ে আনতে হবে অবিলম্বে। তাহলে অশ্বেতাংগ জনসংখ্যা বৃদ্ধি শূন্য দশমিক পাঁচের দিকে নেমে আসবে। অন্যদিকে শ্বেতাংগ জনসংখ্যা প্রতি মাসে অনুরূপ পরিমাণ বাড়াতে হবে।'

'কিভাবে? সন্তান নেয়ার প্রতি শ্বেতাংগ মেয়েদের যে অনিহা তার মোকাবিলা তো বন্দুক দিয়ে করা যাবে না।'

'বন্দুক দিয়ে পারা যাবে না, কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে যাবে।'

'সে বুদ্ধিটা কি?'

'খুব সহজ। মার্কিন মেয়েরা যে ব্রান্ডের জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল ব্যবহার করছে, সে সব ব্রান্ডের কোম্পানীগুলোতে ঢুকতে হবে এবং শতকরা ২৫ ভাগ পিলে ভেজাল ঢুকাতে হবে। অন্য দিকে যে সব ক্লিনিক সৌখিন এ্যাবরশন করায়, তাদের ঘাড় মটকাতে হবে।'

'ঠিক বলেছ বোরম্যান। এই কাজ এখনি আমরা শুরু করতে পারি। গোল্ড ওয়াটারকে জানাতে হবে ব্যাপারটা। এ কর্মসূচী কেন্দ্রীয়ভাবে গ্রহণ করা উচিত।'

কথা শেষ করে একটু সোজা হয়ে বসে বলল, ‘এস আমাদের কথায় ফিরি। রিপোর্টে বলেছে, টার্কস দ্বীপপুঞ্জে আমাদের দেড়শ’ লোক হত্যার জন্যে যারা দায়ী, তাদের চিহ্নিত করা যায়নি। কিন্তু চিহ্নিত আমরা করেছি। আমরা নিশ্চিত এশিয়ানটাই সব কিছুর মূলে রয়েছে। এই মূলকে ধরার জন্যে ডাঃ মার্গারেটকে আমরা হাতে নিয়ে আসছি। এ কথাটা গোল্ড ওয়াটারকে জানাতে হবে।’

‘জ্বি, আজকেই টেলিফোনে কথা বলা যায়।’

‘এখন ডাঃ মার্গারেটকে নিয়ে আসার ব্যাপারে কি চিন্তা করছ?’

‘স্যার, একটু ভেবে দেখি। আর গ্রান্ড টার্কস থেকে আরও কিছু জানারও প্রয়োজন আছে। তারপরে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।’

‘কিন্তু দেরী করা যাবে না। পরশু দিনের মধ্যে তাকে এখানে চাই।’

‘তাই হবে স্যার।’

ফার্ডিন্যান্ড উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়াল হের বোরম্যানও।

টেবিলে নাস্তা সাজিয়ে রেখে সোফায় এসে বসতে বসতে ডাঃ মার্গারেট জর্জকে বলল, ‘আমার অবাক লাগছে, হঠাৎ করে উনি বিশেষ এ সময়ে টিভি প্রোগ্রাম দেখতে আসতে চাইলেন কেন!’

‘আমারও অবাক লেগেছে আপা। উনি তো অনর্থক কোন কাজ করেন না।’

‘কিন্তু বল তো উনি আমাদের বাড়িতে থাকছেন না গ্রান্ড টার্কসে এসেও, এর পেছনে কি অর্থ আছে?’ বলল মার্গারেট।

‘অর্থ আছে। আমি তার সিদ্ধান্তে আপত্তি করেছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন, ‘তোমাদের পরিবারকে সন্দেহের উর্ধে রাখার মধ্যেই আমাদের লাভ। হাসপাতালের ঘটনায় ডাঃ মার্গারেট ওদের সন্দেহের তালিকায় পড়তে

পারে বলে আমি আশংকা করছি। আমি বিদেশী, তোমাদের ওখানে থাকলে সন্দেহ আরও গভীরতর হবে।' বলল জর্জ।

'আমিও এটাই বুঝেছি। অদ্ভুত এক মানুষ। সব মাথা খালি করে সব বোঝা তিনি নিজের মাথায় নেন। কিন্তু এত করেও তিনি আমাকে সন্দেহমুক্ত রাখতে পারেননি।'

'কি ব্যাপার?' জর্জ বিস্ময়ের সাথে বলল।

'গতকাল ডাঃ ওয়াভেল আমাকে বলেছেন সাবধানে থাকতে। আমি তাঁকে কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'যারা প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্ট চুরি করতে বাধ্য করেছিল, তারা তোমাকেও সন্দেহ করছে। ওরা সাংঘাতিক। ওরা না পারে এমন কিছু নেই।'

'উনি কি তোমাকে ভয় দেখালেন, না আন্তরিকভাবে তোমাকে সাবধান হওয়ার জন্যে বললেন?'

'না জর্জ, সেদিনের ঘটনার পর উনি বদলে গেছেন। এমনকি ওঁর (আহমদ মুসার) প্রতি কোন ক্ষোভ তাঁর নেই। বরং বলেন, সেদিনের ঘটনা তাঁর জন্যে ভালই হয়েছে। এই ঘটনার অজুহাতে ওদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার সুযোগ হয়েছে।'

'আমি যতটা শুনেছি, ওঁর স্ত্রীর কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে। ঘটনার পর একদিন আহমদ মুসা ভাইয়ের সাথে মিসেস ওয়াভেলের কথা হয়েছে। মিসেস ওয়াভেল তাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন এবং দেখা করার জন্যে অনুরোধ করেছেন। আহমদ মুসা ভাইয়ের মতে মিসেস ওয়াভেলের রাজনৈতিক চিন্তা আমাদের সাহায্য করতে পারে।'

'সত্যি ওঁর উপর আল্লাহর বিশেষ রহমত আছে। যে পরিবারটা তার সাংঘাতিক শত্রু হওয়ার কথা, সে পরিবার তার বন্ধু হয়ে গেল।'

'আপা আমার বিস্ময়টা এখনও কাটেনি। সেদিন তিনি হাসপাতালের রুম থেকে স্বাভাবিকভাবে বের হয়েছিলেন। এত বড় একটা অভিযানে উনি বেরুচ্ছেন তার বিন্দু মাত্র আঁচ করা যায়নি। কি করে উনি বুঝলেন ডাঃ ওয়াভেলের বাসায় অভিযান করলে চুরি যাওয়া ডকুমেন্টগুলো পাওয়া যাবে! সামান্য ভয়ও তাঁর মনে

জাগেনি। কি আশ্চর্য, তিনি শুধু ডকুমেন্টগুলো উদ্ধারই করলেন না, কঠিন এক সময়ে গোটা পরিস্থিতিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনলেন, যার ফলে মিসেস ওয়াভেল পুলিশ ডেকেও মিথ্যা কথা বলে পুলিশকে ফেরত দেন।'

'বোধ হয় এটাই ওঁর মৌলিকত্ব যে, তিনি যুদ্ধের ময়দানে অস্ত্রের শক্তির চেয়ে বুদ্ধির শক্তির উপর বেশি নির্ভর করেন।'

আটটা বাজার শব্দ হলো ঘড়িতে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জর্জ বলল, 'আহম মুসা ভাই এতক্ষণ এলেন না।'

জর্জের কথা শেষ না হতেই দরজায় নক হলো। ছুটে গেল জর্জ দরজায়। খুলে দিল দরজা। দরজায় আহমদ মুসা।

তারা সালাম বিনিময়ের পর আগে আহমদ মুসা ও পেছন পেছন জর্জ প্রবেশ করল ঘরে।

ঘরে প্রবেশ করে সালাম দিল আহমদ মুসা মার্গারেটকে।

দরজা খোলার সংগে সংগেই ডাঃ মার্গারেট উঠে দাঁড়িয়েছিল। গায়ের কাপড় ঠিক-ঠাক করে মাথার ওড়নাটা টেনে দিয়েছিল কপালের উপর।

'ওয়া আলাইকুম।' বলে সালাম গ্রহণ করল ডাঃ মার্গারেট। মার্গারেটের চোখে-মুখে আনন্দ। তার সাথে সেখানে লজ্জার একটা পীড়ন। দুইয়ে মিলে অপরূপ লাবন্যের সৃষ্টি হয়েছে মার্গারেটের চেহারায়।

আহমদ মুসা সালাম দেয়ার সময় ডাঃ মার্গারেটের মুখের উপর একবার চোখ পড়েছিল মাত্র। চোখ নিচু করে নিয়েছিল সংগে সংগেই।

আহমদ মুসা সোফায় এসে বসল। তার পাশে এসে বসল জর্জ। আর মার্গারেট জর্জের ওপাশে আরেকটা সোফায়। টেলিভিশনটা তাদের সামনে।

আহমদ মুসা সেদিকে তাকিয়ে বলল, জর্জ, 'ফ্রি ওয়ার্ল্ড টিভি' (FWTV) তে দাও।'

'আচ্ছা, ওদের তো এখন 'ওয়ার্ল্ড ইন এক্সক্লুসিভ' প্রোগ্রাম রয়েছে। ঐ প্রোগ্রামের কথা আপনি বলেছেন?'

'হ্যাঁ' বলল আহমদ মুসা।

জর্জ উঠতে উঠতে বলল, ‘ওদের এই প্রোগ্রামটা খুব নাম করেছে ভাইয়া। দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সকল জালেম ও মজলুমের কথা কোন অতিরঞ্জন ছাড়াই এরা নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরে। এ কারণেই এটা এখন দুনিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রোগ্রাম। ‘ওয়ার্ল্ড ওয়াচ’-এর সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুসারে বিশ্বের টিভি দর্শকদের শতকরা ৭০ ভাগ নিয়মিত এই প্রোগ্রাম দেখে থাকে, যা একটি প্রোগ্রামের সর্বোচ্চ রেকর্ড।’

রিমোর্ট কনট্রোলটা এনে চ্যানেল চেঞ্জ করে FWTV তে নিয়ে এল জর্জ।

ঠিক আটটা পাঁচ মিনিটে প্রোগ্রাম শুরু হলো।

একজন ঘোষক বলল, আজ আমাদের দৃশ্যপট আমেরিকান কন্টিনেন্ট, বিশেষভাবে ক্যারিবিয়ান দ্বীপাঞ্চল। তারপর সে বলল, ‘রীতি অনুসারে প্রথমে রিপোর্ট সারাংশ। তারপর ‘সরেজমিন’, যাতে থাকবে সাক্ষাতকার ও প্রমাণপঞ্জী। সবশেষে থাকবে ‘মন্তব্য’।

ঘোষণা শুনেই জর্জ বলল, ‘লায়লা জেনিফার ও অন্যান্যদের খবরটা জানানো দরকার। নিশ্চয় বিষয়টা খুব ইন্টারেষ্টিং হবে।’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ওরা সবাই জানে।’

‘জানে?’ জর্জের মুখে বিস্ময়। বলল, ‘তাহলে এ প্রোগ্রামটা নিশ্চয় খুব গুরুত্বপূর্ণ।’

‘দেখে মন্তব্য করলে ভালো হবে।’ ঈষৎ হেসে বলল আহমদ মুসা।

রিপোর্ট সারাংশ তখন শুরু হয়ে গেছে।

সবারই সব মনোযোগ আছড়ে পড়ল টিভি’র উপর।

রিপোর্টে তখন বলা হচ্ছে,

‘আজ একুশ শতকে মানুষের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার যখন সবচেয়ে বড় শ্লোগান হতে যাচ্ছে, তখন ক্যারিবিয়ান সাগরের দ্বীপাঞ্চলে চরম মানবাধিকার লংঘনের খবর পাওয়া গেছে। জানা গেছে, সেখানকার অশ্বেতাংগ বিশেষ করে মুসলিম কম্যুনিটির সদ্যজাত পুরুষ সন্তানদের অব্যাহত হত্যা এবং মুসলিশ পুরুষদের হত্যা, গুম, ইত্যাদি কর্মসূচীর মাধ্যমে সেখান থেকে মুসলিম জনসংখ্যা নির্মূলের কাজ উদ্বেগজনক গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। গ্রান্ড টার্কস

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ষ্টুডেন্ট গ্রুপের বিশেষ সমীক্ষা এবং এই মানবাধিকার লংঘনের ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত ‘হোয়াইট ঈগল’ নামক গোপন সংগঠনের নিজস্ব দলীল থেকে এই মানবাধিকার লংঘন-ষড়যন্ত্রের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে।

চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের ষ্টুডেন্ট গ্রুপের সমীক্ষা অনুসারে গত ৬ বছরে জনসংখ্যার বিশেষ শ্রেণী মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে গড়ে ১৪ শতাংশ হারে। মুসলিম জনসংখ্যার মধ্যে মুসলিম পুরুষ শিশুর মৃত্যুর হার উদ্বেগজনক। গত ছয় বছরের প্রথম বছর মুসলিম শিশুর মৃত্যু হার শতকরা ৬ ছিল, কিন্তু ষষ্ঠ বছর অর্থাৎ গত বছর এই হার ছিল শতকরা ২৫, তার আগের বছর ছিল শতকরা ২০ এবং তার আগের বছর শতকরা ১৫ ছিল। হোয়াইট ঈগলের নিজস্ব দলিলে গত তিন বছরের একটা মুল্যায়ন পাওয়া গেছে। চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের ষ্টুডেন্টদের সমীক্ষা ছিল টার্কস দ্বীপপুঞ্জের উপর, কিন্তু হোয়াইট ঈগল-এর মূল্যায়ন গোটা ক্যারিবিয়ান দ্বীপাঞ্চল নিয়ে। এই মূল্যায়নে ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের প্রতিটি দ্বীপ-রাষ্ট্রের চিত্র পৃথক পৃথক ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মূল্যায়ন অনুসারে গত তিন বছরে গোটা ক্যারিবিয়ান দ্বীপাঞ্চলে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাসের গড় হার ১৫ শতাংশ। এর মধ্যে কিউবাতে সবচেয়ে কম, তিন বছরে গড়ে হ্রাস ১০ শতাংশ এবং সবচেয়ে বেশি টার্কস দ্বীপপুঞ্জে, তিন বছরে গড় হ্রাস ২১ শতাংশ।

‘হোয়াইট ঈগল’ পরিচালিত মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাসের পদ্ধতিটি চরম অমানবিক এবং হৃদয়বিদারক। হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ম্যাটারনিটিতে সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া মুসলিম শিশু সন্তানদের নানা মেডিকেল পদ্ধতিতে কৌশলে হত্যা করা হচ্ছে। সম্প্রতি গ্রান্ড টার্কস-এর কুইন এলিজাবেথ হাসপাতালে সদ্য মৃত তিনটি মুসলিম শিশুর লাশ পরীক্ষা করে দেখা গেছে, একজনকে ‘স্লিপ পয়জনিং’ এবং অন্য দু’জনকে ভয়ংকর ‘ডেথ ভাইরাস’ দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ‘হোয়াইট ঈগল’ নামের গোপন সংগঠন পরীক্ষার এই রিপোর্টগুলো এবং পরীক্ষার উপকরণসমূহ চুরি করে বিষয়টি ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করে। হাসপাতালের শিশু ও প্রসূতি বিভাগের প্রধান ডাঃ ক্লার্ক চুরি ঘটনার কথা স্বীকার করেছেন। মনে করা হচ্ছে, কমপক্ষে গত ৬ বছর ধরে লাখ লাখ মুসলিম পুরুষ শিশুকে এই ধরনের

নানা পন্থায় হত্যা করা হয়েছে। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে প্রবল ডেমোগ্রাফিক ভারসাম্যহীনতার। স্যাম্পলিং সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে, ক্যারিবিয়ান দ্বীপাঞ্চলে মুসলিম মেয়ে শিশু ও পুরুষ শিশুর গড় অনুপাত দাঁড়িয়েছে ২০:১ এবং সবচেয়ে উপদ্রুত টার্কস দ্বীপপুঞ্জে এই অনুপাত ৩০:১-এ পৌছেছে। মনে করা হচ্ছে, এই প্রজন্ম তাদের বয়স কালে মুসলিম তরুণীরা বিয়ের জন্যে মুসলিম তরুণ পাবে না। ফলে মুসলিম মেয়েরা স্বাভাবিক পারিবারিক জীবন লাভে ব্যর্থ হবে অথবা শতকরা নব্বই ভাগ ক্ষেত্রে তাদেরকে অমুসলিমদের ঘরে প্রবেশ করতে বাধ্য হতে হবে।

প্রাপ্ত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে মনে করা হচ্ছে, মানবতা বিরোধী এই জঘন্য অপরাধের সাথে 'হোয়াইট ঈগল' নামের গোপন সংগঠন জড়িত। এক শ্রেণীর শ্বেতাংগ পুলিশ, আমলা, ডাক্তার অথবা হাসপাতাল কর্মীরা কোথাও স্বতস্ফূর্তভাবে, কোথাও ভয়ে-প্রলোভনের কারণে বাধ্য হয়ে 'হোয়াইট ঈগল'কে সহযোগিতা দিচ্ছে। মনে করা হচ্ছে, জাতীয় সরকারগুলো ব্যাপক অনুসন্ধান চালালে 'হোয়াইট ঈগল'এর এজেন্ট পুলিশ, আমলা ও অন্যান্যদের চিহ্নিত করা কঠিন হবে না। তবে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, 'হোয়াইট ঈগল'-এর মত আন্তআমেরিকান সংগঠনের হুমকি ও চাপ মোকাবিলার সাধ্য ছোট ছোট জাতীয় সরকারগুলোর নেই। এ জন্যেই তারা অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট এজেন্সিগুলোকে তাদের তৃতীয় বিশ্বের বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে গঠিত টিমের মাধ্যমে তদন্ত ও উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে এগিয়ে আসতে হবে। অবিলম্বে এদের কালো হাত ভেঙে দিতে না পারলে গোটা আমেরিকার অবস্থাকে তারা ঐ একই পর্যায়ে নিয়ে যাবে বলে আশংকা করা হচ্ছে।'

'রিপোর্ট সার-সংক্ষেপ' উপস্থাপনার পর 'সরেজমিন' প্রতিবেদন শুরু হলো।

ডা: মার্গারেট ও জর্জের চোখ টিভি'র দৃশ্যে যেন আটকে গেছে আঠার মত। গোগ্রাসে যেন তারা গিলছে সব কথা। দেখছে সবকিছু সম্মোহিত হওয়ার মত।

প্রোগ্রামটি ছিল বিশ মিনিটের।

প্রোগ্রাম শেষ হয়ে গেলেও সম্মোহন যেন তাদের কাটল না। তাদের মুখে কোন কথা নেই। নড়াচড়া করতেও তারা যেন ভুলে গেছে।

টেলিফোন বেজে উঠল। জর্জ তার মোবাইলটা তুলে নিল পাশ থেকে।

টেলিফোন ধরেই তা আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'ভাইয়া জেনিফারের টেলিফোন।'

আহমদ মুসা টেলিফোন ধরতেই সালাম দিয়ে জেনিফার বলল, 'অভিনন্দন ভাইয়া। যে ঘটনা ওরা টার্কস দ্বীপপুঞ্জে আমাদের প্রচার করতে দেয়নি, তা আপনি বিশ্বময় ছড়িয়ে দিলেন। ভাইয়া, কি বলে কি দিয়ে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাব ভাইয়া।' আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল জেনিফারের কণ্ঠ।

'পাগল বোন, ভাইকে বুঝি এভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়?'

'আমার নয় ভাইয়া, এটা জাতির কৃতজ্ঞতা।'

'জাতি কি আমার নয়?'

'তবু ভাইয়া, আমি জাতির মধ্যকার একজন।'

'আচ্ছা থাক এসব। শোন, একে শুধু আনন্দের নয়, আশংকার দৃষ্টিতেও দেখতে হবে। তোমাকে এবং মার্গারেটকে খুব সাবধানে থাকতে হবে। ওরা এটা শোনার পর এতক্ষণে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হয়ে গেছে। ষ্টুডেন্ট গ্রুপের সমীক্ষার তথ্য পাচার করার জন্যে তোমাকে এবং হাসপাতালের তিনটি শিশুর পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করার জন্যে মার্গারেটকেই ওরা সন্দেহ করবে। সুতরাং তোমাদেরকে খুবই সাবধান থাকতে হবে। রাস্তায় বেরুনো তোমার একেবারেই বন্ধ করে দিতে হবে।'

'আমি তো লুকিয়েই আছি। ওখানে আপনাদের সাথে এক সাথে টিভি দেখার ইচ্ছা আমার ছিল। কিন্তু রাস্তায় বেরুতে হবে, এ কারণেই তো যেতে পারলাম না। জর্জকে টেলিফোন দিন। আমি ওর সাথে ঝগড়া করবো। আমার সৌভাগ্য সে কেড়ে নিচ্ছে।'

'জেনিফার, তোমার আর জর্জের সৌভাগ্য আলাদা হয়ে গেল কখন? দিচ্ছি ওকে টেলিফোন, ঝগড়া কর।'

বলে আহমদ মুসা জর্জকে টেলিফোন দিল। দিতে দিতেই শুনল জেনিফার চিৎকার করছে, ‘থাক ওর সাথে আর কথা বলব না।’

জর্জ টেলিফোন ধরে বলল, ‘বেশ জেনিফার, আমি তো কথা বলতে চাইনি।’

ওপারের কথা শুনে জর্জ আবার বলল, ‘তুমি আসতে পারনি, এটা কি আমার দোষ?’

ওপারের কথার পর জর্জ পুনরায় বলল, ‘বা! বা! বা!, আমি গিয়ে তোমাকে নিয়ে এলাম না কেন, তুমি বলনি কেন? আমি তো তোমাকে চালাই না, তুমিই আমাকে চালাও। তাই........।’

জর্জের কথা শেষ হতে পারল না। ওপার থেকে টেলিফোন রেখে দিয়েছে জেনিফার।

জর্জ টেলিফোন রাখতে রাখতে বলল, ‘রেগে গেছে জেনিফার’

‘তুমি যাতা বলে ওকে রাগাও জর্জ, এটা ভাল নয়।’ বলল ডা: মার্গারেট।

‘আপা, তুমি তো কোন সময়ই জেনিফারের ত্রুটি দেখ না। ওই প্রথম আজ অযৌক্তিক কথা বলেছে।’

আহমদ মুসার ঠোঁটে হাসি। বলল, ‘ঠিক আছে জর্জ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আজ জেনিফারই ঝগড়াটা প্রথম শুরু করেছে।’

আহমদ মুসা থামতেই ডা: মার্গারেট চকিতে আহমদ মুসার দিকে একবার চোখ তুলল। তারপর কম্পিত চোখটা নামিয়ে গভীর কণ্ঠে বলল, ‘FWTV’-তে এই অসম্ভব ঘটনা কিভাবে ঘটতে পারলো?’

‘এটা তো অসম্ভব ঘটনা নয়!’

‘আমাদের কাছে অসম্ভব। লোকাল খবরের কাগজে যে নিউজ ছাপা যায় না, সে নিউজ বিশ্ব টিভি’তে বিশ্বময় প্রচার হবে এটা অসম্ভব ঘটনা নয়?’

‘তা ঠিক। কিন্তু FWTV –এর মত বিশ্বমানের টিভিগুলো এ ধরনের বিষয় পেলে লুফে নেয়।’

‘কিন্তু পেল কি করে?’

‘আমি ওদের কাছে পাঠিয়েছি।’

‘সেটা আমরা বুঝেছি।’ হেসে বলল ডা: মার্গারেট।

থেমেই ডা: মার্গারেট আবার শুরু করল, ‘কিন্তু পেয়েই ওরা প্রচার করল? BBC কিংবা VOA কে দিলে তারা কি প্রচার করত?’

‘না করত না।’

বলে একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর সোফায় হেলান দিয়ে বসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আসল কথা ডা: মার্গারেট, FWTV এবং WNA-এই দু’টি সংবাদ মাধ্যম মুসলমানদের তৈরি। বিশ্বমানের সংবাদ মাধ্যম হিসাবে যে দায়িত্ব, সেটা তারা পালন করার সাথে নিজস্ব দায়িত্বও এভাবে তারা পালন করছে।’

‘আলহামদুলিল্লাহ।’ ডা: মার্গারেট ও জর্জ এক সাথেই বলে উঠল।

একটু থেমেই জর্জ আবার বলল, ‘এ সংবাদ মাধ্যম দু’টির এই গোপন পরিচয় কি অন্যেরা জানে?’

‘কেউ কেউ এটা সন্দেহ করে। কিন্তু সবাই এটা জানে, এ সংবাদ মাধ্যম দু’টিতে মুসলিম কিছু পুঁজিপতির পুঁজি আছে। কিন্তু তারা মনে করে অন্যগুলোর মতই এটা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। বিশেষ করে এ সংস্থা দু’টোর সংবাদ প্রচারে নিরপেক্ষতা এদের সম্পর্কে নেতিবাচক চিন্তার সুযোগ কাউকে দিচ্ছে না। মুসলিম কোন গ্রুপ বা শাসকের দ্বারা কোন অন্যায় হলে তা এ সংবাদ মাধ্যম দু’টো সোচ্চার কণ্ঠেই প্রচার করে থাকে।’

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা ডা: মার্গারেটকে বলল, ‘তুমি কি কিছুদিনের জন্যে ছুটি নিতে পার?’

‘কেন?’

‘হাসপাতালে যাতায়াত তোমার নিরাপদ নয়। তাছাড়া আমি মনে করি কিছুদিন তোমার একটু সরে থাকা দরকার।’

‘আপনি যা আদেশ করবেন তাই হবে।’

‘এটা আমার আদেশ নয়, পরামর্শ।’

মুখ নিচু রেখেই থামল ডা: মার্গারেট। বলল, ‘নেতা যেটা দেন তা পরামর্শ নয়, নির্দেশ।’

‘আদেশ না হয়ে পরামর্শই হওয়া ভাল নয় কি? আদেশ হলে তা তো অপরিহার্য হয়ে যায়।’

‘আদেশ না মানতে পারি, এ ভয় তাহলে আপনার আছে?’

‘মার্গারেট, আমার কথা বিশেষ কারো জন্যে নয়, সাধারণ নীতি হিসাবে বলেছি।’

‘ধন্যবাদ।’ বলে ডা: মার্গারেট উঠে দাঁড়াল এবং বলল, ‘আমি উঠছি। আজ কিন্তু আপনি খেয়ে যাবেন। সব রেডি।’

কথা শেষ করেই আহমদ মুসাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে মার্গারেট দ্রুত ড্রইং রুম ত্যাগ করল।

মার্গারেট চলে গেলে জর্জ টিভি বন্ধ করে দিল। মুখোমুখি হলো আহমদ মুসার। বলল, ‘এরপর কি ভাইয়া? হোয়াইট ঈগল তো ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হয়ে উঠবে বলছেন। কিন্তু বিশ্ব কিছু বলবে না?’

‘অবশ্যই বলবে। দেখবে আগামী কালের সংবাদপত্র এই নিউজ কমবেশী কভার করবে গোটা দুনিয়ায়। প্রতিক্রিয়াও কালকে থেকেই প্রকাশ হওয়া শুরু করবে। এবং এটা অবশ্যই একটা ইস্যুতে পরিণত হবে।’

‘এর ফল কি হবে?’

‘কি ফল হবে আমি জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি বৃটিশ সরকার, টার্কস দ্বীপপুঞ্জের এ ঘটনার জন্যে ঘরে বাইরে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়বে। সুতরাং বাধ্য হয়েই তাকে টার্কস দ্বীপপুঞ্জে ‘হোয়াইট ঈগল’-এর মূলোচ্ছেদ করতে এগিয়ে আসতে হবে।’

‘আলহামদুলিল্লাহ। এটা হবে আমাদের জন্যে একটা বড় লাভ। শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল আমাদের জন্যে।’

আহমদ মুসা কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল। কিন্তু তার আগেই ভেতর থেকে জর্জের ডাক পড়ল, ‘ওঁকে নিয়ে এস জর্জ।’

সংগে সংগেই জর্জ উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘চলুন ভাইয়া। বাড়িতে আর কেউ নেই, কাজের দু’জন মেয়ে ছাড়া।’

আহমদ মুসাও উঠল। খাবার টেবিলে বসল জর্জ এবং আহমদ মুসা।

খাবারগুলো ঠিক-ঠাক এগিয়ে দিয়ে ডা: মার্গারেট বলল, 'শুরু করুন সেলফ সার্ভিস।'

'এটাই নিয়ম, ধন্যবাদ।' বলল আহমদ মুসা।

'আপা, তুমি বস। দাঁড়িয়ে রইলে যে!' বলল জর্জ।

'হোষ্ট হিসাবে তুমি তো খাচ্ছই। মেহমানের অস্বস্তির কোন কারণ নেই।' ঠোঁটে হাসি টেনে বলল মার্গারেট।

জর্জ একটু ভাবল। তারপর আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভাইয়া, এভাবে একত্রে খাওয়ার ব্যাপারে ইসলামের কোন নিষেধাজ্ঞা আছে?'

'নিরাপদ পরিবেশে পর্দাসহ বিয়ে নিষিদ্ধ নয় এমন লোককে খাবার পরিবেশন করা, তার সাথে দেখা করা, কথা বলা যায়, কিন্তু একান্ত বাধ্য না হলে এক সাথে খাওয়া যায় কিনা আমার জানা নেই।'

'নিরাপদ পরিবেশ কি?' জর্জ বলল।

'যাদের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ নয় এমন দু'জন ছেলে মেয়ে কোন নিভৃত স্থানে বা কোন নির্জন কক্ষে দেখা করতে বা কথা বলতে পারে না। তবে নিরাপদ হলে পারে। অর্থাৎ সাথে যদি স্বামী ও ভাই-এর মত কেউ থাকে তাহলে পারে। সাথে স্বামী ও ভাই-এর মত অতি আপন কেউ থাকাই নিরাপদ পরিবেশ।'

'এক সাথে খাওয়ার ক্ষেতেও এই একই বিধান হতে পারে না কেন?'

'আমি মনে করি একান্ত বাধ্য হলে পারে। কিন্তু সাধারণভাবে এটা আমার মনে হয় মুসলিম সংস্কৃতি বিরোধী।'

'কারণ?' প্রশ্ন করল জর্জ।

'জনাব, কারণ বলবেন না। এসব ব্যাপারে কত বই আছে, কোরআনের তফসির এবং হাদীস তো আছেই। লেখাপড়া করবে না, শুধু প্রশ্ন। এত কথা বললে খাওয়া হবে না। খেতে দাও।' কৃত্রিম শাসনের সুরে বলল ডাঃ মার্গারেট।

জর্জ আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্যরি, ভাইয়া। আপা ঠিকই বলেছেন।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'ঠিক আছে তোমার প্রশ্নটার জবাব আরেকদিন দেব।'

‘জর্জ কিন্তু লেখাপড়া করে না। ওর আবেগ যতটা বেশি, লেখাপড়া ততটাই কম।’ ঠোঁটে হাসি টেনে বলল মার্গারেট।

‘তাই নাকি জর্জ?’

‘ভাইয়া আপা ইসলামের পন্ডিত হচ্ছেন, আমাকে পন্ডিত হতে বলেন।’ বলল জর্জ।

‘পন্ডিত না হও, প্রয়োজনীয় সবকিছু তোমাকে জানতে হবে।’

‘সে চেষ্টা করছি ভাইয়া। কোরআন শরীফ আমি অর্থসহ দু’বার পড়া সম্পন্ন করেছি। মিশকাত শরীফের অর্ধেক পর্যন্ত পড়েছি। তাছাড়া মাসলা-মাসায়েলের বই নিয়মিতই দেখি।’

‘ধন্যবাদ জর্জ। আর তোমার আপা?’

‘সে হিসেব আমি দিতে পারবো না। ওঁর টেবিল ভর্তি বইয়ে। ডাক্তারি বিদ্যা সে ভুলতে বসার পথে।’

আহমদ মুসা তাকাল ডাঃ মার্গারেটের দিকে। বলল, ‘জর্জের অভিযোগ সত্য নয় আশা করি। তোমাকে শ্রেষ্ঠ ডাক্তার হতে হবে, সেই সাথে হতে হবে একজন শ্রেষ্ঠ মুসলমান।’

আহমদ মুসার দিকে মুহূর্তের জন্যে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল ডাঃ মার্গারেট। তার মুখ রক্তিম হয়ে উঠেছে লজ্জা এবং অপরিচিত এক আবেগে। বলল, ‘দোয়া করুন।’

বলে ডাঃ মার্গারেট কি মনে হওয়ায় দ্রুত রিফ্রেজারেটরের দিকে এগুলো।

আহমদ মুসা মনোযোগ দিল খাওয়ার দিকে।

টেলিফোনের শব্দে আহমদ মুসার ঘুম ভাঙল। রাত তখন ৩টা। ধরল টেলিফোন। লায়লা জেনিফারের কণ্ঠ। কান্নায় কথা বলতে পারছে না জেনিফার।

'সময় নষ্ট করো না জেনিফার। কি ঘটেছে বল?' একটু শক্ত কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

'মার্গারেট আপাকে কেউ ধরে নিয়ে গেছে। জর্জ আহত হয়ে বাইরে পড়ে আছে।' কান্না জড়িত কণ্ঠে বলল জেনিফার।

'কি বলছ তুমি জেনিফার? তুমি বাসা থেকে?'

'আমি বাসায়। জর্জের বাসায় আর কেউ নেই। কাজের মেয়েটা আমার টেলিফোন নম্বার জানত, এইমাত্র আমাকে জানাল।'

'তুমি টেলিফোন রেখে দাও। আমি এখনি বেরুচ্ছি।'

'ভাইয়া, আমি যাব।'

'বেশ প্রস্তুত থাক। আসছি আমি।'

রাত সাড়ে তিনটার মধ্যেই আহমদ মুসা জেনিফারকে নিয়ে জর্জদের বাড়ি পৌছল।

জর্জকে তখন প্রতিবেশীরা কয়েকজন এসে ধরাধরি করে ড্রইং রুমে এনে তুলেছে।

জর্জ আহমদ মুসাকে দেখে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

আহমদ মুসা কোন কথা না বলে জর্জের মাথায় হাত বুলিয়ে জর্জের আঘাত পরীক্ষা করল। দেখল, জর্জের দু'হাত ক্ষত-বিক্ষত। বাধা দেবার জন্যে দুহাতে ছোরা ধরে ফেলারই ফল এটা। তাছাড়া তার ডান বাহুতে এবং কাঁধে মারাত্মক আঘাত।

কাজের মেয়েরাও প্রতিবেশীরা ক্ষতগুলো কাপড় দিয়ে বেঁধে রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে চেষ্টা করছে।

আহমদ মুসা কান্নারত বিমূঢ় জেনিফারের দিকে চেয়ে বলল, 'জেনিফার তুমি থানায় এবং হাসপাতালে টেলিফোন কর।'

বলে আহমদ মুসা কান্নারত জর্জের দিকে চেয়ে বলল, 'জর্জ এখন কান্নার সময় নয়। তুমি আমাকে সাহায্য কর।' আদেশের সুরে কথাগুলো বলল আহমদ মুসা।

জর্জ চোখ মুছল। শান্ত হবার চেষ্টা করল।

‘বল, যারা মার্গারেটকে ধরে নিয়ে গেছে, তাদের সম্পর্কে তুমি কি বুঝেছ?’

‘ওরা দশ বারোজন এসেছিল। সবারই মুখ মুখোশে ঢাকা ছিল। আমার সাথে ধস্তাধস্তির সময় ওদের একজনের মুখোশ খুলে যায়, জামার কয়েকটা অংশ ছিড়ে পড়ে যায়। আমার মনে হয় ওরা সবাই শ্বেতাংগ। যারা কথা বলেছে, সবাই ইংরেজি ভাষায়। ইংরেজির উচ্চারণ উত্তর বাহামা অঞ্চলের মত।’

‘জামার অংশগুলো ছিড়ে খসে পড়েছে তা কোথায়?’

‘আমি আপার চিৎকার শুনে ঘুমে থেকে জেগে ছুটে আসি আপার ঘরের দিকে। ওদের সাথে ঘরের দরজায় আমার ধস্তাধস্তি হয়। সম্ভবত জামার ছিড়ে পড়ে যাওয়া অংশ ও মুখোশ ওখানেই পড়ে আছে।’

শুনেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘জর্জ ওটা আমাকে দেখতে হবে। আমি দেখছি।’

বলে ছুটল আহমদ মুসা মার্গারেটের ঘরের দিকে।

মার্গারেটের ঘরের সামনেই প্রশস্ত করিডোরে কালো সার্টের কয়েকটা টুকরো পড়ে থাকতে দেখল।

আহমদ মুসা দ্রুত সেদিকে এগুলো এবং তাড়াতাড়ি জামার টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিল।

আহমদ মুসা দেখল, টুকরোগুলো মিলালে গোটা জামাই হয়ে যায়। জামা ছিঁড়ে যাওয়া লোকটি নিশ্চয় গোটা জামা খুলে ফেলে দেয়। সাফারী ধরনের সার্টের উপরে ও নিচের চারটি পকেটই অক্ষত আছে।

আহমদ মুসা পরীক্ষা করল পকেটগুলো। একটা পকেটে টাকার কয়েকটা নোট পেল। টাকাগুলো বাহামার ডলার। তাহলে লোকরো ছিল বাহামার? অন্য একটা পকেটে আহমদ মুসা ভাঁজ করা নীল রঙের পাতলা কাগজ পেল।

ভাঁজ খুলল কাগজটির। একটা রশিদ ধরনের কাগজ। ভালো করে দেখল আহমদ মুসা। একটা এয়ার প্যাসেস সার্টিফিকেট। সানসালভাদরের কলম্বাস এয়ারপোর্ট ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে ‘দি ব্লু বার্ড’কে।

তাড়াতাড়ি তারিখের দিকে নজর বুলাল আহমদ মুসা। তারিখ আজকের। টেক অফের সময়ও লেখা আছে রাত দশটা। চমকে উঠল আহমদ মুসা। ওরা কি সানসালভাদর থেকে বিমান নিয়ে এসেছিল! ডাঃ মার্গারেটকে ওরা বিমানেই নিয়ে যাবে। চঞ্চল হয়ে উঠল আহমদ মুসা। ওদের বিমান নিশ্চয় ল্যান্ড করেছে গ্রান্ড টার্কস বিমান বন্দরে। ডাঃ মার্গারেটকে নিয়ে তাহলে ওরা এয়ারপোর্টেই গেছে।

বিষয়টা চিন্তা করেই আহমদ মুসা ছুটল জর্জের কাছে। আহমদ মুসা যেতেই জেনিফার বলল, 'ভাইয়া, পুলিশ আসছে। হাসপাতাল থেকেও এই শিফটের এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার একজন ডাক্তার নিয়ে আসছেন।'

'আলহামদুলিল্লাহ। পুলিশ এলে জর্জ তুমি একটা মামলা দায়ের কর।'

তারপর জেনিফারের দিকে তাকিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'ডাক্তার জর্জকে যদি হাসপাতালে নিয়ে যেতে চায়, তুমিও যেও তার সাথে হাসপাতালে। বাড়িতে একা তুমি থাকবে না।'

'আপনি থাকছেন না?' বলল জর্জ।

'আমি এখনি গ্রান্ড টার্কস এয়ারপোর্টে যাচ্ছি।'

'কেন?' বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বলল জেনিফার।

'সম্ভবত বিমানে করে মার্গারেটকে টার্কস দ্বীপপুঞ্জের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দেখি ওদের নাগাল পাই কিনা?'

বেদনায় অন্ধকার হয়ে উঠেছে জর্জের মুখ। বলল, 'ওরা কারা ভাইয়া? হোয়াইট ঈগল?'

'নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তবে সন্দেহ ওদেরকেই।' কথা শেষ করেই আহমদ মুসা বলল, 'আসি।' বলে দ্রুত পা চালাল আহমদ মুসা বাইরে বেরুবার জন্যে।

এক ঘণ্টা পরে ফিরে এল আহমদ মুসা। এসে জর্জ এবং জেনিফারকে পেল না। শুনল, এ্যাম্বুলেন্সেই ওরা হাসপাতালে চলে গেছে। হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল আহমদ মুসা। রাত সাড়ে ৪টা।

সময় হাতে বেশি নেই। ছুটল সে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে।

ব্যান্ডেজ ইত্যাদি শেষ করে এইমাত্র জর্জকে বেডে আনা হয়েছে।

আহমদ মুসা যখন কক্ষে ঢুকছিল, তখন বেরিয়ে যাচ্ছিল ডাক্তার ও নার্সরা।

কক্ষে প্রবেশ করল আহমদ মুসা।

জর্জ চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল। আর জেনিফার বসেছিল জর্জের মাথার পাশে এক চেয়ারে।

আহমদ মুসা প্রবেশ করতেই আকুল, উৎসুক্য চোখে জেনিফার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল।

পায়ের শব্দ পেয়ে জর্জও চোখ খুলেছে। আহমদ মুসাকে দেখেই তার চোখ দু'টি চঞ্চল হয়ে উঠল। শত প্রশ্ন ঝরে পড়ল তার চোখ থেকে।

আহমদ মুসা জর্জের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। একটি হাত জর্জের বুকে আস্তে করে রেখে জর্জের শত প্রশ্ন ভরা চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'না জর্জ, তোমাকে মুখে হাসি ফুটানোর মত কোন খবর নিয়ে আসতে পারিনি। যেটা এনেছি সেটা দুঃসংবাদই।'

জর্জ চোখ বুজল।

'কি খবর ভাইয়া?' কম্পিত গলায় প্রশ্ন করল জেনিফার।

'আমার সন্দেহ যদি সত্য হয়, আমি এয়ারপোর্টে পৌছার আধঘণ্টা আগে মার্গারেটকে বহনকারী প্রাইভেট বিমানটি বিমান বন্দর ত্যাগ করেছে।'

'কোথায় নিয়ে গেছে ভাইয়া?' জেনিফারই বলল।

'আমার সন্দেহ সত্য হলে বিমানটি সানসালভাদরে গেছে।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা আবার বলল, 'জেনিফার পুলিশ এসে কি করল?'

'পুলিশ কেস নিয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও পুলিশকে টেলিফোন করেছে। পুলিশ জানতে চাচ্ছে কাউকে আমাদের সন্দেহ হয় কিনা। জর্জ শুধু এটুকু বলেছিল, যারা সম্প্রতি প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্ট চুরি করেছিল তারা জড়িত থাকতে পারে। কারা চুরি করিয়েছিল আমরা জানি না।'

'ঠিক আছে এটুকু। ধন্যবাদ তোমাদের।'

জর্জ চোখ খুলল। বলল, 'কিন্তু ভাইয়া, পুলিশ কেস নেয়া পর্যন্তই। কিছুই হবে না।' জর্জের কণ্ঠে হতাশা।

জর্জের গায়ে সান্ত্বনার হাত বুলিয়ে আহমদ মুসা বলল, 'পুলিশ কিছু করবে এজন্যে পুলিশকে বলা হয়নি। বলা হয়েছে এজন্যে যে পুলিশের কাছে ঘটনাটা রেকর্ডেড হওয়া দরকার।'

বলে একটু থামল আহমদ মুসা। পরক্ষণেই আবার শুরু করল, 'আমার হাতে সময় বেশি নেই জর্জ। একটা বোট ঠিক করে এসেছি। ঠিক সাড়ে ছয়টায় আমি যাত্রা করব। ফজরের নামাযও আমি সেরে নিয়েছি।'

'কোথায় ভাইয়া?' দুজনেই চমকে উঠে এক সাথে প্রশ্ন করল।

'সানসালভাদর।'

'আপনি কি নিশ্চিত ভাইয়া, আপাকে ওরা সানসালভাদর নিয়ে গেছে?'

'নিশ্চিত নই। তবে যেটুকু প্রমাণ পেয়েছি, তাতে ওরা সানসালভাদর থেকে এসেছিল, ওখানেই ফিরে গেছে। মার্গারেটকে তাদের সাথে নেবারই কথা।'

'মাফ করবেন, কি প্রমাণ ভাইয়া?'

'তুমি যে ছেঁড়া জামার কথা বলেছিলে, সে জামার পকেটে একটা এয়ার প্যাসেজ সার্টিফিকেট পাওয়া গেছে। সার্টিফিকেট অনুসারে 'দি ব্লু বার্ড' নামক একটা প্রাইভেট এয়ারলাইন্সের একটা বিমান গত রাত দশটায় সানসালভাদর বিমান বন্দর থেকে 'টেক অফ' করেছিল। আমার ধারণা এই বিশেষ বিমানেই ওরা এসেছিল এবং ফিরে গেছে। এবং আমার আরো ধারণা, শুধু ডাঃ মার্গারেটকে কিডন্যাপ করার জন্যেই ছিল তাদের এ আয়োজন।'

আহমদ মুসার এই বর্ণনা যেন ভীত করল জর্জকে। তার মুখ কুঁকড়ে গেছে উদ্বেগ ও বেদনায়। কম্পিত গলায় বলল সে, 'মনে হচ্ছে ওরা বিরাট শক্তিশালী বিশাল দল। আপনি একা। কিভাবে......।'

কথা শেষ করতে পারল না জর্জ। রুদ্ধ হয়ে গেল তার কণ্ঠ।

আহমদ মুসা হো হো করে হেসে উঠল। বলল, 'জর্জ আমি একা নই। আমার সাথে আল্লাহ আছেন। আর আল্লাহর শক্তির কাছে ঐসব শক্তি কিছুই নয়।'

‘নিশ্চয় আল্লাহ সকলের চেয়ে, সবকিছুর চেয়ে বড়। কিন্তু সবক্ষেত্রেই সাফল্য কি তিনি দেন? আমি যে ভাবনা মন থেকে দূর করতে পারছি না।’ বলে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল জর্জ।

আহমদ মুসা হেসে উঠল। সোজা হয়ে দাঁড়াল। বলল, ‘জর্জ, তুমি শুধু ডাঃ মার্গারেটের ভাই এ হিসাবে ভাবলে চলবে না, তুমি আজ ‘আমেরিকান ক্রিসেন্ট’ এর সভাপতি।’

ঠোঁটে হাসি কিন্তু শক্ত কণ্ঠে কথাগুলো বলল আহমদ মুসা।

জর্জ ধীরে ধীরে আহত হাত তুলে গায়ের চাদর দিয়ে চোখের পানি মুছে ফেলল। বলল, ‘দুঃখিত আমি ভাইয়া। আপাকে না নিয়ে আমাকে ওরা ধরে নিয়ে গেলে ভেঙে পড়াতো দূরে থাক কোন ভয়ই করতাম না।’

‘জানি জর্জ। তোমাকে এখন শক্ত হতে হবে। আমি চলে যাচ্ছি। তোমাকে এদিকটা দেখতে হবে।’

থামল আহমদ মুসা। তারপর তাকাল লায়লা জেনিফারের দিকে। সে বিমূঢ় এক পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে। এরপর তাকাল জর্জের দিকে। ধীরে ধীরে বলল আহমদ মুসা, ‘আমি তোমাদের দু’জনকে একটা কথা বলতে চাই।’

‘আদেশ করুন ভাইয়া।’ দুজনেই বলল।

‘FWTV -তে ঐ খবরটি প্রচারিত হবার পর ওরা নিশ্চয় পাগল হয়ে গেছে। তারই একটা প্রমাণ, বিশেষ বিমান নিয়ে এসে তারা ডাঃ মার্গারেটকে ধরে নিয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস, লায়লা জেনিফারের উপর তারা আরও বেশি ক্ষেপে আছে। সুতরাং লায়লা জেনিফারের একটা শক্ত আশ্রয় ও সার্বক্ষণিক সাথী দরকার। গ্রামের বাড়ি তার জন্যে নিরাপদ নয়। তার মামার বাড়িও নয়। মেয়ে হওয়ার কারণেই অন্য কোন আশ্রয়ও তার জন্যে নিরাপদ নয়। অপর দিকে জর্জও একা হয়ে পড়েছে। আমি চাই, এই মুহূর্তে না হলেও আজই তোমরা বিয়ে কর। তোমাদের মত বল।’

লজ্জায় লাল হয়ে উঠল জেনিফারের মুখ। মুখ নিচু করেছে সে।

আকস্মিক এই প্রস্তাবে জর্জও লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে অনেকটা।

‘বলেছি, হাতে আমার সময় নেই। তোমরা কথা বল। আমি মনে করছি, জর্জ অসুস্থ হওয়ায় জেনিফারের সঙ্গ তার জন্যে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বিয়ে এই সমস্যারও সমাধান করে দেবে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ভাইয়া আপনার সিদ্ধান্তই আমার সিদ্ধান্ত। আপনি ওকে জিজ্ঞেস করুন। ওকে তার মতের বাইরে একবিন্দুও নড়ানো যায় না।’ বলল জর্জ।

‘ভাইয়া, ও বলতে চাচ্ছে আপনার আদেশ সেই শুধু চোখ বন্ধ করে মানে, আমি মানি না। নিজের মত বলা কি অপরাধ? ওকে জিজ্ঞেস করুন ভাইয়া, কবে কোন আদেশ আপনার আমি মানিনি!’ জেনিফারের রাঙা মুখে ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটেছে।

দুঃখের মধ্যেও আহমদ মুসার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল দু’জনের মধুর ঝগড়া দেখে। বলল, ‘ঠিক আছে তোমাদের দু’জনের মত আমি পেয়ে গেছি। আলহামদুলিল্লাহ।’

মুহূর্তের জন্যে থামল আহমদ মুসা। থেমেই আবার বলল, ‘আমি গাড়িতে করে মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন ও আর একজনকে নিয়ে এসেছি। ওদের বলে দেই, আজ দিনের কোন এক সময় তারা বিয়ে পড়াবার ব্যবস্থা করবে। তোমরাও বন্ধু-বান্ধবদের ডাকতে পার।’

আহমদ মুসা থামার সাথে সাথেই জেনিফার প্রতিবাদ করে উঠল, ‘না ভাইয়া, সবার অনুপস্থিতিতে বিয়ে হতে পারে, আপনার অনুপস্থিতিতে নয়।’

‘তাহলে?’ আমাকে তো অল্পক্ষণের মধ্যেই যেতে হবে।’

‘এই অল্পক্ষণে বিয়ে হতে পারে না? এবং এই কক্ষেই?’ বলল জেনিফার।

‘পারে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘এতেই আমি আনন্দিত হবো ভাইয়া। এখন ওকে জিজ্ঞেস করুন।’ বলল জেনিফার।

আহমদ মুসা তাকাল জর্জের দিকে।

'ভাইয়া, আমার কোন পৃথক সিদ্ধান্ত নেই। আপনি যা বলবেন, সেটাই আমি করব। কিন্তু দেখলেন তো ভাইয়া, ও নিজের মতের ব্যাপারে কতটা সিরিয়াস। কিভাবে তার মত সে চাপিয়ে দিয়ে ছাড়ল।' বলল জেনিফার।

জেনিফার তীব্র কণ্ঠে কিছু বলতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা তাকে হাতের ইশারায় বাধা দিয়ে বলল, 'বোন জেনিফার তোমাকে কিছু বলতে হবে না। আমিই জর্জের কথার প্রতিবাদ করছি।'

বলে আহমদ মুসা জর্জের দিকে তাকিয়ে বলল, 'জর্জ, জেনিফারের মতামত আমার কাছে খুবই মূল্যবান। আশা করি তোমার কাছেও। মতামত দেয়ার ক্ষমতা একটা বড় গুণ। এ গুণ আমার এ বোনটির আছে। মতামতকে সম্মান করবে, রাগাবে না কখনও।'

জর্জ গম্ভীর হলো। জেনিফারের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'স্যরি, রিয়েলি স্যরি জেনিফার।'

জেনিফারের মুখ লজ্জা, সংকোচে একেবারে রাঙা হয়ে গেছে। মুখ নিচু করেছে সে।

'জর্জ, তোমার অনামিকায় হীরক বসানো যে সোনার আংটি দেখছি, সেটা তুমি জেনিফারকে পরিয়ে দাও। এটাই হবে মোট মোহরানার নগদ অংশ।'

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়িয়ে বাইরে বেরুবার জন্যে হাঁটা শুরু করে বলল, 'তোমরা তৈরি হও, আমি গাড়ি থেকে ওদের নিয়ে আসি।'

দু'মিনিটের মধ্যেই আহমদ মুসা মসজিদ থেকে আনা ইমামসহ তিনজনকে নিয়ে হাজির হলো।

আহমদ মুসা কক্ষে ঢুকে দেখল, জর্জ বাসা থেকে সাথে করে আনা বাড়তি সার্টটা পরেছে। জেনিফার যা পরেছিল সেটাই। শুধু ডান হাতের অনামিকায় শোভা পাচ্ছে জর্জের দেয়া হীরের আংটি। পোশাকে পার্থক্য শুধু এটুকুই ঘটেছে যে, মাথায় ওড়নাটা কপালের নিচে একটু বেশি পরিমাণে নেমে এসেছে।'

ইমাম সাহেবরা এসে ভেতরে বসলেন।

আহমদ মুসা জর্জ ও জেনিফারের কাছাকাছি এসে একটু নিচু গলায় বলল, 'বিয়ের জন্যে ইসলামী বিধান মতে অভিভাবকদের উপস্থিতি প্রয়োজন। তোমরা আমাকে অভিভাবকত্ব দিচ্ছ কিনা।'

'ভাইয়া, আল্লাহ সবচেয়ে বড় অভিভাবক। আর দুনিয়ায় আপনার চেয়ে বড় কোন অভিভাবক আমাদের নেই।' বলল জেনিফার।

'আমি জেনিফারের মতকে সম্মান করি ভাইয়া।' বলল জর্জ, তার ঠোঁটে হাসি।

'ভাইয়া, ও কি বলল দেখুন।'

হাসল আহমদ মুসা। জর্জের মাথায় আঙুল দিয়ে একটা টোকা দিয়ে বলল, 'যাই হোক, বিয়ের পর যেন ঝগড়া দিয়ে জীবন শুরু করো না।'

বিয়ের অনুষ্ঠান হলো খুবই সংক্ষিপ্ত।

আহমদ মুসা বর ও কনে দুই পক্ষের নিকট থেকে সম্মতি (এজেন) আদায়ের দায়িত্ব পালন করল। সাক্ষী মসজিদের মুয়াজ্জিন এবং আরও একজন। বিয়ে পড়াল ইমাম সাহেব। সবশেষে দোয়া করল আহমদ মুসা।

এই রাতে মিষ্টি পাওয়া সম্ভব নয়। আহমদ মুসা সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে সকলের হাতে একটা করে আমেরিকান ক্যান্ডি তুলে দিয়ে বলল, 'হাসপাতালের পাশের একটা শপে এটাই পেয়েছি। আপনারা এটা গ্রহণ করে দম্পতিকে দোয়া করুন।'

'আপনি যে মিষ্টির কথা বলছেন, সে মিষ্টির চেয়ে অনেক দামী মিষ্টি এটা।' বলল ইমাম সাহেব।

'ধন্যবাদ।' বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা ইমাম সাহেবদের গাড়িতে রেখে কক্ষে ফিরে এল আবার।

এবার আহমদ মুসা কক্ষে প্রবেশের আগে দরজায় নক করল। জেনিফার এসে দরজা খুলে ধরলে তবেই আহমদ মুসা কক্ষে প্রবেশ করল।

জর্জ এবং জেনিফার দু'জনেই লজ্জায় জড়সড়। দু'জনের চোখে মুখেই নতুন এক লজ্জার আবরণ।

‘আমার যাবার সময় হয়েছে। কয়েকটা কথা বলছি মনোযোগ দিয়ে তোমরা শুন।’

বলে আহমদ মুসা একটা দম নিল। তারপর শুরু করল, ‘জেনিফার হাসপাতালের বাইরে বেরুতে পারবে না। কাউকে দিয়ে খাবার আনিয়ে খেতে হবে। এই অবস্থায় হাসপাতালে থাকা কঠিন হবে। সুতরাং আজকেই বিকেলে হাসপাতাল থেকে রিলিজ নেয়ার চেষ্টা করতে হবে। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, জর্জদের বাড়ি ওরা চিনেছে। ওখানে তোমরা দু’জন কেউ নিরাপদ নও। সুতরাং হাসপাতাল থেকে ভিন্ন কোথাও গিয়ে তোমাদের উঠতে হবে। জর্জের কোন আত্মীয়ের বাসা হলে চলবে না। আত্মীয়ের বাসার সন্ধান ওদের জন্যে সহজ হবে। এ রকম জায়গা তোমাদের খোঁজে আছে?’

‘আমার এক ফুফা চাকরী নিয়ে সপরিবারে পোর্টেরিকা চলে যাচ্ছেন আজ, সেখানেই আজ আমার উঠার কথা। আম্মাও আসবেন। আমরা সেখানে উঠতে পারি।’

‘ধন্যবাদ জেনিফার। একটা দুঃশ্চিন্তা থেকে আমাকে বাঁচালে।’

একটু থামল। শুরু করল আবার, ‘জেনিফারের বেরুনই চলবে না বাড়ির বাইরে। জর্জ বেরুলেও কিছু ছদ্মবেশ নিয়ে বেরুতে হবে।’

‘ভাইয়া, আমি তো ওদের টার্গেট নই। হলে আজই তো নিয়ে যেত।’ বলল জর্জ।

‘জর্জ তোমার টার্গেট হওয়া, না হওয়া নির্ভর করছে ডাঃ মার্গারেটকে নিয়ে কি ঘটছে তার উপর। খোদা না করুন, সে যদি সব কথা বলে দিতে বাধ্য হয়, সব কিছু স্বীকার করতে বাধ্য হয়, তাহলে তুমি ওদের একটা প্রধান টার্গেট হয়ে দাঁড়াতে পার।’

উদ্বেগ, আতংকে ছেয়ে গেল জর্জ এবং জেনিফারের মুখ। বলল আর্তকণ্ঠে জেনিফার, ‘আপার উপর কি নির্যাতন করতে পারে?’

‘জর্জ, জেনিফার তোমরা কি হবে, কি ঘটবে এসব নিয়ে ভেব না। ভবিষ্যতটা আল্লাহর উপর ছেড়ে দাও। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ হেফাজতকারী।’

বলে আহমদ মুসা টেবিলের উপর থেনে নিজের ব্যাগটা তুলে নিল।

আহমদ মুসার যাবার প্রস্তুতি দেখে জর্জ এবং জেনিফার দু'জনেরই মুখ মলিন হয়ে উঠল। বলল জেনিফার, 'শত শত্রুর মধ্যে গিয়ে আপনি কিভাবে কি করবেন! আপার মত আপনিও যদি বিপদে পড়েন, আমার ভয় করছে ভাইয়া।' ভারি কণ্ঠ জেনিফারের।

'বলেছি তো, কি হবে, কি ঘটবে এসব চিন্তাকে বড় করে দেখো না।' একটু শক্ত কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

'আপনার খবরের জন্যে প্রতি মুহূর্তে আমরা উৎকণ্ঠিত থাকব। কিভাবে আমরা জানতে পারব।' জর্জ অশ্রু ভেজা নরম কণ্ঠে বলল।

আহমদ মুসা একটু চিন্তা করল। বলল, 'এ ব্যাপারে আমি এখন কিছু বলতে পারবো না। তবে কোন খবর থাকলে সেটা মাকোনির কাছেই থাকবে।'

বলে আহমদ মুসা যাবার জন্যে পা বাড়িয়েও ঘুরে দাঁড়াল। বলল জেনিফারকে, যদি সম্ভব হয় তাহলে আজতেই তোমার ভাবীকে টেলিফোন করে বলবে, 'আমি সানসালভাদরে গেছি।'

'আপার কথা তাঁকে বলব?'

'ওঁর কাছে কোন কথা আমি লুকোই না, তা যত খারাপই হোক।'

আহমদ মুসা সালাম দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল দরজার দিকে।

জর্জ ও জেনিফারের চারটি চোখ আহমদ মুসা চলে গেলেও তার চলার পথের উপর আটকে থাকল। দু'জন যেন হারিয়ে ফেলেছে নিজেদেরকে।

এক সময় ধীরে ধীরে মুখ খুলল জেনিফার। বলল, 'দেখেছ জর্জ, ভাইয়া ভাবীর কথা মনে করেছেন, কিন্তু তাঁর চোখে মুখে কোন বেদনা, দুশ্চিন্তা নয়, বরং তাতে একটা প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির ছাপ। অথচ তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছেন একটা জীবন-মৃত্যুর লড়াই-এ।'

'এটাই আহমদ মুসা জেনিফার। আল্লাহ ওঁকে মানুষের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মনও ঐভাবে তৈরি।' বলল জর্জ।

'না হলো না জর্জ। উদ্দেশ্য লক্ষ্য স্থির করার এবং মন ঠিক করার দায়িত্ব মানুষের। আহমদ মুসা তা করেছেন।'

‘তুমি ঠিক বলেছ জেনিফার। এ অধিকার আল্লাহ মানুষের হাতেই দিয়েছেন।’ বলল জর্জ।

‘ধন্যবাদ। সত্য তুমি বিনা তর্কে মেনে নিয়েছ জর্জ।’ হেসে বলল জেনিফার জর্জের দিকে তাকিয়ে।

জর্জও চোখ তুলল জেনিফারের দিকে। তারও মুখে হাসি। বলল, ‘বিশ্বাস কর জেনিফার, তোমার মতকে আমি সম্মান করি।’

‘ধন্যবাদ, ভাইয়ার পরামর্শ যে তুমি মানছ!’ মুখে মিষ্টি হাসি জেনিফারের।

‘না জেনিফার, এ শ্রদ্ধা আমার তোমাকে জানার পর থেকেই।’

‘তাহলে কথায় কথায় ঝগড়া বাধাও কেন?’

‘তুমি রাগলে তোমাকে অপরূপ দেখায়।’ বলে জর্জ হাত বাড়াল জেনিফারের দিকে।

‘না মশায়, এটা হাসপাতাল। বেড রুম নয়, বাড়ি নয়।’

বলে জেনিফার দৌড় দিয়ে পালাল জর্জের কাছ থেকে। তার মুখ ভরে গেছে মিষ্টি হাসিতে। রাঙা হয়ে উঠেছে মুখ আপেলের মত।

৪

রাগে-ক্ষোভে মুখ লাল করে টেলিফোন রাখল ফার্ডিন্যান্ড।

তাকাল তীব্র দৃষ্টিতে সামনে বসা অপারেশন কমান্ডার হের বোরম্যান এবং তথ্য চীফ পল-এর দিকে। বলল, 'গোল্ড ওয়াটার দারুণ ক্ষেপেছে। বলছে, যাকে যেখানে সন্দেহ হয় সাফ করে দাও। তাঁর রাগ হলো, যে সব কথা হোয়াইট ঈগলের বাইরে কাক-পক্ষীও জানত না, তা টিভি নেটওয়ার্ক ও নিউজ এজেন্সী নেটওয়ার্কে গেল কি করে?'

'হোয়াইট ঈগল-এর বাইরে কাক-পক্ষীও জানে না, একথা ষোলআনা ঠিক নয় স্যার। চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছেলে তো ব্যাপারটা ধরে ফেলেছিল যাদের মধ্যে অন্তত একজন লায়লা জেনিফার এখনও জীবিত আছে। এবং গ্রান্ড টার্কস দ্বীপে আমাদের লোক গায়েব করার যে ঘটনাগুলো পর পর ঘটল তা লায়লা জেনিফারের এলাকা বা লায়লা জেনিফারকে কেন্দ্র করেই।' বলল বোরম্যান।

'কিন্তু লায়লা জেনিফাররা মাত্র জনসংখ্যাগত একটা তথ্য জানতে পেরেছিল, আমাদের পরিকল্পনার কিছুই তো জানতে পারেনি।' বলল বিরক্তির সাথে ফার্ডিন্যান্ড।

'মাফ করবেন স্যার, গ্রান্ড টার্কস-এর কুইন এলিজাবেথ হাসপাতালের তিনটি মৃত মুসলিম পুরুষ শিশুর প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্ট আমাদের হাতে এসেও হাত ছাড়া হয়ে যাওয়া এবং সবচেয়ে বড় কথা ডাঃ ওয়াভেলের বাসায় আমাদের লোকদের হাত থেকে আমাদের প্লান বাস্তবায়নের রিভিউ রিপোর্ট শত্রুর হাতে চলে যাওয়া প্রমাণ করে শত্রুর হাতে আমাদের তথ্য চলে গেছে। সে শত্রুরাই তথ্যগুলো টিভি চ্যানেল ও নিউজ এজেন্সী চ্যানেলে দিয়েছে।' বলল হের বোরম্যান।

'কিন্তু এই শত্রু তো এমন নয় যে, ঐ সব বিশ্ব চ্যানেল নিয়ন্ত্রণ করে!' ফার্ডিন্যান্ড বলল।

‘ঐ এশিয়ানকে পাওয়ার আগে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে না স্যার।’ বলল বোরম্যান।

‘ডাঃ মার্গারেটকে দিয়েই ঐ এশিয়ানকে পেতে হবে স্যার।’ বলল তথ্য চীফ পল।

‘হ্যাঁ মার্গারেটের প্রসঙ্গটা খুব জরুরী। আমি সে প্রসংগে আসছি, তার আগে এস একটু আলোচনা করি, এখন পরিস্থিতি কি? ঐ টিভি নিউজ ও নিউজ পেপার রিপোর্টের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া কি?’ ফার্ডিন্যান্ড বলল।

পল নড়েচড়ে বসল। বলল, ‘বাইরের এ পর্যন্ত চারটা প্রতিক্রিয়ার কথা জানা গেছে। এক. বৃটিশ সরকার তার টার্কস দ্বীপপুঞ্জের বিষয়টা তদন্তের জন্যে একটা তদন্ত কমিশন গঠন করেছে এবং তদন্ত কমিশনটি দু’একদিনের মধ্যেই টার্কস দ্বীপপুঞ্জে এসে পৌছবে। দুই. এ্যামনেষ্টি তার নির্বাহী কমিটির জরুরী মিটিং-এ বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং সাত দিনের মধ্যে গোটা বিষয়ের উপর সরেজমিন রিপোর্ট চেয়েছে। তিন. জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন ও ইউনিসেফও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং সরেজমিন রিপোর্টের জন্যে প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছে। আর ইউনিসেফ ক্যারিবিয়ানের প্রত্যেক হাসপাতাল ও ক্লিনিকে পৃথক পৃথক ফান্ড দিয়ে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে ছয় মাসের জন্যে। তারা প্রত্যেক শিশুর কেস মনিটর করবে। চার. ওআইসি, রাবেতা আলমে আল ইসলামীসহ পৃথিবীর অসংখ্য মুসলিম সংগঠন বিষয়টির তীব্র প্রতিবাদ করেছে, জাতিসংঘের কাছে তদন্ত ও বিচার দাবী করেছে। ওআইসি সরকারগুলোর সাথে যোগাযোগ করে প্রত্যেক দেশেই পর্যবেক্ষক দল পাঠাচ্ছে। আর অভ্যন্তরীন অবস্থা হলো, সরকারগুলো চারদিকের প্রবল প্রেসারের মুখে চরম বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছে। গত ছয় সাত বছরের সকল শিশু মৃত্যুর পরিসংখ্যান ও বিবরণ সংগ্রহ করছে। সরকারগুলো তাদের সকল হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোর শিশু বিভাগে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছে। প্রতিটি অসুস্থ শিশুর প্রতি বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। অন্যদিকে ক্যারিবীয় অঞ্চলের জনগণের মধ্যে বিশেষ করে মুসলিম সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতংক দেখা দিয়েছে। অসুস্থ শিশুর চিকিৎসা গর্ভবতী

মহিলাদের প্রসবের জন্যে হাসপাতাল ও ক্লিনিকে নেয়া তারা বন্ধ করেছে। সরকার ও ইউনিসেফ উদ্যোগ নিয়েছে তাদের বুঝানোর জন্যে।'

এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে থামলো তথ্য চীফ পল।

ফার্ডিন্যান্ডের চোখে মুখে বিরক্তি ও ক্রোধের ছাপ। বলল, 'খারাপ খবরগুলো যতটা বিস্তৃত ও মনোযোগের সাথে সংগ্রহ করেছ, তার খোঁজ সউদী আরবের ওআইসি পেলে তোমাকে পুরস্কার দেবে।'

বলে ফার্ডিন্যান্ড হের বোরম্যানের দিকে চেয়ে বলল, 'আমাদের চলমান কাজের ব্যাপারে যা বলেছিলাম, তার কি করেছ?'

'আপনার কথাই ঠিক স্যার। প্রত্যেক অঞ্চল থেকে আমাদের লোকেরা একই কথা বলেছে, যে বা যারা আমাদের পক্ষে কাজ করছে, তারা সবাই ভীত হয়ে পড়েছে। কেউ কেউ কর্মস্থল থেকে সরে পড়েছে। এই অবস্থায় তাদেরও সকলের মত, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা যাবে না এবং কাজ বন্ধও হয়ে গেছে।' বলল বোরম্যান।

রাগে-ক্ষোভে মুখ লাল হয়ে উঠেছে ফার্ডিন্যান্ডের। বলল, 'প্রকল্পের কাজ বন্ধ থাকবে, কিন্তু যে শয়তানরা এই বিপর্যয়ের জন্যে দায়ী, তাদের শায়েস্তা করার কাজ তীব্র করতে হবে। লায়লা জেনিফারকে যে ভাবেই হোক ধরতে হবে। ওকে জ্যান্ত কবর দিতে হবে। জর্জকেও খোঁজ কর। মনে হচ্ছে সেও একজন নাটের গুরু।'

বলে থামল। গ্লাস থেকে এক ঢোক মদ গলধঃকরণ করে বলল, 'বল এবার শয়তান ডাক্তারের কথা।'

'স্যার আমরা যে ভদ্র আচরণ করছি, তা দিয়ে তার কাছ থেকে কথা বের করা যাবে না।' বলল হের বোরম্যান।

'কি করব এটা গোল্ড ওয়াটারের অনুরোধ। ডাঃ মার্গারেটের আব্বা এবং আমাদের গোল্ড ওয়াটার পরস্পর পরিচিত ছিলেন। মার্গারেটের আব্বা বৃটিশ নৌবাহিনীতে থাকাকালে একবার এক বিপন্ন অবস্থা থেকে গোল্ড ওয়াটারকে বাঁচিয়েছিলেন।' বলল ফার্ডিন্যান্ড।

'কিন্তু স্যার তাকে মানসিক চাপ দিয়ে কথা আদায়ের সকল প্রচেষ্টা বলা যায় ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের গোয়েন্দা ইউনিটের সবচেয়ে দক্ষ মিঃ বেভান এবং হায়েনার মত ক্রুর ও শৃগালের মত চালাক মিস মার্টিনা তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় একটা কথাও আদায় করতে পারেনি।'

'পরিবেশটা কি সৃষ্টি করেছিলে?'

'স্যার তাকে তিন দিন থেকে ঘুমুতে দেয়া হয়নি। সর্বক্ষণ চোখ ধাঁধানো আলোর মধ্যে রাখা হয়েছে। তার সাথে হৃদয় মুচড়ে দেয়ার মত অব্যাহত শব্দের নিরন্তর আক্রমণ। মানসিক প্রতিরোধ তার নষ্ট হয়ে যাবার কথা। এরপরও কিন্তু এর কাছ থেকে একটা কথাও বের হয়নি।'

'চল আমি তার সাথে কথা বলব। তারপর সিদ্ধান্ত নেব কি করা যায়।'

বলেই ফার্ডিন্যান্ড উঠে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়াল হের বোরম্যান এবং পল।

ডাঃ মার্গারেটকে রাখা হয়েছে অফিস বিল্ডিং-এর নিচ তলায় একটি কক্ষে। হোয়াইট ঈগলের বন্দীখানাটা কলম্বাস দ্বীপের পাশেই ককবার্স দ্বীপে।

সানসালভাদর শহরটা কয়েকটা দ্বীপের সমষ্টি।

ডাঃ মার্গারেটকে হোয়াইট ঈগলের বন্দীখানায় নিয়ে যাওয়া হয়নি। এটাও গোল্ড ওয়াটারের পরামর্শেই। গোল্ড ওয়াটারের পরামর্শ হলো, মেয়ে মানুষ তার উপর বয়স কম। কোন কৃমিনালও নয়। সুতরাং তার কাছ থেকে কথা বের করা কোন ব্যাপার নয়। বন্দী খানায় রাখার দরকার নেই।'

অফিস বিল্ডিং এবং ফার্ডিন্যান্ডের বাড়ি পাশাপাশি গায়ে গায়ে লাগানো। কিন্তু অফিস বিল্ডিংটা কলম্বাস কমপ্লেক্সের অংশ। আর ফার্ডিন্যান্ডের বাড়ি কমপ্লেক্সের বাইরে।

ফার্ডিন্যান্ডের বাড়ি তিন তলা।

ফার্ডিন্যান্ডের বাড়ির তিন তলা ও অফিস বিল্ডিং এর তিন তলা একটা করিডোর দিয়ে সংযুক্ত। করিডোরটি ছয়ফুট দীর্ঘ একটা ফোল্ডিংব্রীজ। ফোল্ড (F) সুইচ টিপলে করিডোরটি প্রসারিত হয়ে দুই বিল্ডিং-এর মধ্যে একটা ব্রীজে

পরিণত হয়। আর আনফোল্ড (UF) সুইচ টিপলে মুহূর্তে ব্রীজটি সরে যায়। ফার্ডিন্যান্ড এই পথেই অফিসে যাতায়াত করেন।

অফিস বিল্ডিংটা দক্ষিণমুখী। আর ফার্ডিন্যান্ডের বাড়ি পূর্বমুখী।

ফার্ডিন্যান্ডের বাড়ির উত্তরের জানালায় দাঁড়ালে অফিস বিল্ডিং-এর প্রধান গেট ও তার সামনের চত্বরটি পরিষ্কার দেখা যায়।

ফার্ডিন্যান্ড এগুচ্ছিল সেই ফোল্ডিং ব্রীজটার দিকে।

আগে আগে চলছিল ফার্ডিন্যান্ড। আর পেছনে একটু দুরত্ব নিয়ে হাঁটছিল হের বোরম্যান ও পল পাশাপাশি।

'পল, যে মানসিক চাপ আমরা দিচ্ছি তাতে মার্গারেটের কিছুই হবে না।' বলল বোরম্যান অনেকটা ফিসফিসিয়ে।

'একজন সাধারণ মেয়ে মানুষ এত শক্ত?'

'সাধারণ কোথায় দেখলেন?'

'না। সাধারণ এই অর্থে যে, তিনি কোন ক্রিমিনাল নন এবং গোয়েন্দাও নন।'

'তা হয়তো নয়, কিন্তু মেয়েটির নার্ভ আমাকে চমকে দিয়েছে। বুঝতে পারছি না তার এ মানসিক শক্তির উৎস কি?'

'কিন্তু তার তথ্যে যা পাওয়া গেছে, তাতে সে একজন সাধারণ ডাক্তার মাত্র। কিন্তু একজন সাধারণ মহিলা ডাক্তার এই অসাধারণ শক্তি পেল কোত্থেকে?'

'আসলে এ ধরনের মেয়েরা যে মানসিক চাপে ভেঙে পড়ে, সে চাপ আমরা দিতে পারিনি?'

'সেটা কি?'

'এ ধরনের নীতি বাগীশ মেয়েরা খুব বেশি স্পর্শ কাতর হয় তাদের সতিত্ব নিয়ে। আমরা তার মনের এই দুর্বল জায়গায় আঘাত করতে পারিনি।'

'বসকে বলেননি?'

'বলেছি। কিন্তু তিনি গোল্ড ওয়াটারের অসন্তুষ্টির ভয় করছেন।'

‘জানলে তবে তো তিনি অসন্তুষ্ট হবেন। জানবেন কি করে? নষ্ট হওয়ার আগে মেয়েদের যতই সুচিবাই থাকুক, নষ্ট হওয়ার পর এই ধরনের মেয়েরা বিষয়টা চেপে যায়। গোল্ড ওয়াটার কিছুই জানতে পারবে না।’

‘দেখা যাক, বস আজ কি করেন?’ বলল হের বোরম্যান।

সেই সংযোগ ব্রীজ পেরিয়ে সবাই এল অফিসের নিচ তলায়। তিন তলা থেকে লিফট নয় সিঁড়ি দিয়ে নামল।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে দক্ষিণ দিকে এগুলে অফিস থেকে বের হবার প্রধান গেট। কিন্তু গেটটি এখন বন্ধ। পুরু ষ্টিল-প্লেটের দেয়াল দিয়ে স্থায়ীভাবেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তার বদলে গেট সোজা বাইরে থেকে একটা প্রশস্ত সিঁড়ি উঠে তেতলার সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এর সাথে যুক্ত হয়েছে। এই সিঁড়ি পথেই এখন হোয়াইট ঈগলের অফিসে ঢুকতে হয়। দোতলা তিনতলা এখন অফিসের কাজে ব্যবহার করা হয়। এক তলাটি ষ্টোর ও বিভিন্ন গোপন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। দোতলা থেকে নিচ তলায় নামার সিঁড়ি মুখ তালাবন্ধ ফোল্ডিং গেট দ্বারা বন্ধ। এক তলায় নেমে উত্তর দিকে এগুলে প্রায় পনের ফিট পরেই অফিসের মাঝ বরাবর দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে একটা প্রশস্ত করিডোর। দু’পাশে বন্ধ ঘর।

করিডোর দিয়ে পশ্চিম দিকে এগুলে অল্প পরেই উত্তরে আরেকটা করিডোর। দক্ষিণ মুখী করিডোরের মুখে দু’জন প্রহরী। হাতে তাদের ষ্টেনগান। ফার্ডিন্যান্ডদের দেখেই একটা স্যালুট দিয়ে দু’পাশে সরে দাঁড়াল। ফার্ডিন্যান্ডরা এ করিডোরে পশ্চিমের একটা দরজার সামনে দাঁড়াল। দরজাটা ষ্টিলের।

দরজার মাথা বরাবর উঁচুতে একটা ‘কী বোর্ড’। আলফাবেটিক্যাল ‘কী বোর্ড’-এর অর্থ দরজাটা তালাবদ্ধ।

ফার্ডিন্যান্ড দরজার সামনে দাঁড়াতেই হের বোরম্যান এগিয়ে গেল এবং কী বোর্ডের কয়েকটা আলফাবেটে ডিজিটের উপর আঙুলে টোকা দিল। জ্বলজ্বলে লাল কিছুটা নীল বিন্দুতে রুপান্তরিত হলো।

খুলে গেল দরজা।

চোখ ধাঁধানো উৎকট আলোর প্রবল ধাক্কা এসে সবার চোখকে আহত করল। সে সাথে বুকে স্পন্দন তোলা এক ঘেয়ে শব্দের গোঙানী এসে কানে ঢুকল।

ঘরটির নগ্ন মেঝে। শোবার কোন ব্যবস্থা নেই। বসার কোন চেয়ারও নেই।

মার্গারেটের পরনে একটা পাতলা নাইট গাউন। আর কিছু নেই। এভাবেই তাকে ধরে এনেছিল।

দরজা খুলে যাবার পরপরই হের বোরম্যান পকেট থেকে রিমোর্ট কনট্রোল বের করে দু'টো সুইচ অফ করল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ ধাঁধানো আলো এবং শব্দ থেমে গেল।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল ডাঃ মার্গারেট। দরজা খোলার শব্দে সে উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়েছিল। তার চোখ দু'টি রক্তের মত লাল।

আলো ও শব্দ অফ হবার সাথে সাথে ডাঃ মার্গারেট ধপ করে মাটিতে পড়ে গেল। যেন আলো ও শব্দই তাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল।

ঘরে প্রবেশ করল ফার্ডিন্যান্ড, হের বোরম্যান ও পল।

ঘরে তখন জ্বলে উঠেছে হালকা নীল রঙের এক প্রশান্ত কিন্তু রহস্যময় আলো।

প্রহরীরা ইতিমধ্যেই তিনটি চেয়ার এনেছে ঘরে। ফার্ডিন্যান্ড, বোরম্যান ও পলের জন্যে।

ডাঃ মার্গারেটের দেহটা মাটির উপর এলিয়ে পড়েছিল। ধীরে ধীরে সে উঠে বসল।

ফার্ডিন্যান্ড চেয়ারে বসতে বসতে বোরম্যানকে বলল, 'আরেকটা চেয়ার আনতে বল।'

চেয়ার আরেকটা এল।

চেয়ারটা প্রহরী রাখল মার্গারেটের কাছে।

ফার্ডিন্যান্ড মার্গারেটের দিকে চেয়ে বলল, 'বসুন, আপনি চেয়ারটায়।'

মার্গারেট চেয়ারে ভর দিয়ে দুর্বল দেহটা উপরে তুলে চেয়ারে বসল।

'স্যরি ডাঃ মার্গারেট আপনি আপনার উপর অবিচার করছেন, আমাদের কোন দোষ নেই।' বলল ফার্ডিন্যান্ড।

মার্গারেট কোন উত্তর দিল না। যেমন ছিল তেমনিভাবে মাথা নিচু করে থাকল।

'ডাঃ মার্গারেট, আমরা এক দেশের, আমরা এক জাতির। আপনার সাথে আমাদের কোন শত্রুতা নেই। আপনি আমাদের সহযোগিতা করলে সে সহযোগিতা দেশকে এবং জাতিকেই করা হবে।' নরম কণ্ঠে বলল ফার্ডিন্যান্ড।

'কিন্তু যে সহযোগিতা আপনারা চান, সেটা আমার বিষয় নয়।' দুর্বল কণ্ঠে বলল মার্গারেট।

'ডাঃ ওয়াভেলের বাসা থেকে যে এশীয়টি প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্টগুলো ছিনিয়ে নিয়ে গেল, তাকে আপনি চেনেন? তার পরিচয় ও ঠিকানা আমরা জানতে চাই।'

বারবার এ উত্তর আমি দিয়েছি। ঐ ঘটনার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমার পক্ষে কিছুই বলা সম্ভব নয়।'

'প্যাথোলজিক্যাল টেষ্ট করানোর ব্যাপারে আপনার বিশেষ ভূমিকা ছিল।' বলল ফার্ডিন্যান্ড।

'সেটা ডাক্তার হিসেবে আমার দায়িত্ব ছিল।'

'সেই এশিয়ানকে আপনি চেনেন। আপনি আহত অবস্থায় হাসপাতালে ছিলেন যখন, তখন সেই এশিয়ান হাসপাতালে আপনার সাথে দেখা করতে যায়।'

'সে জর্জের বন্ধু। সে নির্দোষ।'

'আমরা তার ঠিকানা চাই।'

'সে এখন কোথায় আমি জানি না।'

'দেখুন আপনি উত্তর এড়িয়ে যাচ্ছেন।'

'আমাকে মাফ করবেন। আমার কাছে আপনারা অবাস্তব দাবী করছেন।'

'দেখুন আপনি সহযোগিতা না করলে জর্জকেও এখানে আমরা ধরে আনব।'

ভীষণ চমকে উঠল মার্গারেট। তার ভেতরটা থর থর করে কেঁপে উঠল। জর্জকে পেলে মেরেই ফেলবে ওরা। তার উপর আমি বলেছি এশীয়টি জর্জের বন্ধু। কেন বললাম?

‘জর্জের কি দোষ?’ শুকনো ও ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

‘আপনার যে দোষ, সে দোষ তারও। এক সাথেই দু’জনকে আমরা দেখাব, দেশদ্রোহিতা জাতিদ্রোহিতার কি সাজা!’

‘আমরা দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে কিছুই করিনি। কোন অপরাধ আমাদের নেই।’

‘দুঃখিত ডাঃ মার্গারেট, আমরা ভদ্র আচরণ করেছিলাম। আপনি তার মূল্য দিচ্ছেন না। নিজের জীবন কিন্তু আপনি নিজেই বিপন্ন করছেন।’ শক্ত কণ্ঠে বলল ফার্ডিন্যান্ড।

‘বাঁচব সে আশা করছি না। অতএব জীবনের ভয় দেখিয়ে আর লাভ কি?’

‘মৃত্যুর আগেও আরও অনেক ধরনের মৃত্যু আছে ডাঃ মার্গারেট। আমাদেরকে আপনি সেদিকে যেতেই বাধ্য করছেন।’

বলে ফার্ডিন্যান্ড একটু থামল। এরপর বলল, ‘শুনুন মিস মার্গারেট, এশীয় লোকটির নাম ঠিকানা আমরা জানতে চাই। কি করে হোয়াইট ঈগলের গোপন কাজের খবর টিভি ও নিউজ এজেন্সীতে গেল তা আমরা পরিষ্কার জানতে চাই। আজকের দিনটুকুই সময়। এর মধ্যে আপনি সিদ্ধান্ত নিন। সন্ধ্যে সাতটায় আমি আসব। তখন যদি সব কথা আপনার কাছ থেকে না পাই, তাহলে আপনার এক মৃত্যু আসবে। সে মৃত্যু আপনার প্রাণের মৃত্যু নয়, এক ধরনের দৈহিক মৃত্যু। এক ক্ষুধার্ত পুরুষের হাতে আপনাকে ছেড়ে দেয়া হবে। সে পুরাতন মার্গারেটের মৃত্যু ঘটিয়ে নতুন এক ধর্ষিতা মার্গারেটের জন্ম দেবে। এই মৃত্যু আপনার প্রতিরাতেই ঘটবে, যতদিন না আপনি মুখ খোলেন।’

বলেই ফার্ডিন্যান্ড উঠে দাঁড়াল।

বেরিয়ে গেল তার ঘর থেকে।

ডাঃ মার্গারেটের হৃদয়ে ফার্ডিন্যান্ডের কথাগুলো বজ্রের আঘাতের মত তীব্র হয়ে প্রবেশ করল। অসহনীয় এক যন্ত্রণায় দেহের প্রতিটি তন্ত্রী যেন তার চিৎকার করে উঠল। কিছু বলতে চাইলে সে ফার্ডিন্যান্ডকে, কিন্তু শুকনো আড়ষ্ট জিহ্বা এক বিন্দুও নড়ল না। কাঠ হয়ে যাওয়া গলা থেকে একটু স্বরও বেরুল না।

তার বিস্ফোরিত চোখের সামনে ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। জ্বলে উঠল সেই চোখ দগ্ধকারী আলো এবং বেজে উঠল হৃদয় কাঁপানো সেই অব্যাহত শব্দ।

আছড়ে পড়ল ডাঃ মার্গারেট মেঝের উপর। তার কাছে ঐ চোখ ঝলসানো আলো এবং হৃদয় কাঁপানো শব্দ এখন কিছুই মনে হচ্ছে না। মন বলছে, এই আলো আগুন হয়ে জ্বলে উঠে তার দেহকে পুড়িয়ে ছাই করে দিক এবং শব্দ ভয়ংকর হয়ে উঠে তার কান ফাটিয়ে দিক, তবু যদি বাঁচা যায় দেহের ঐ ভয়াবহ মৃত্যু থেকে।

সন্ধ্যে তো বেশি দূরে নয়! বিদ্যুতে শক খাওয়ার মত দেহটা তার কেঁপে উঠল। তার মনে হচ্ছে, এক ক্ষুধার্ত হায়েনা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সকল সম্পদ লুটেপুটে নিচ্ছে, তার সত্তাকে ছিন্ন-ভিন্ন করছে এবং তাকে একটি জীবন্ত লাশে পরিনত করছে। সে হাজার মৃত্যুর যন্ত্রণা সহ্য করতে রাজি আছে, কিন্তু এ মৃত্যু সে সইতে পারবে না। গোটা জগতের বিনিময় দিয়ে হলেও এই মৃত্যু থেকে সে বাঁচতে চায়।

সে কি তাহলে বলে দেবে আহমদ মুসার নাম এবং তার সব তথ্য যা সে জানে?

আহমদ মুসার কথা মনে হতেই চোখ ফেটে অশ্রুর ঢল নামল মার্গারেটের। না না, সে আহমদ মুসার নাম বা তার সম্পর্কে কোন তথ্যই এদের দিতে পারবে না। যে লোক কোনও স্বার্থ ছাড়াই আত্মীয় নয়, স্বজন নয় এমন লোকদের সাহায্যের জন্যে ছুটে এসেছে, নিজের জীবন বিপন্ন করে তাদের জন্যে কাজ করছে, ইতিমধ্যেই যে আহত হয়েছে কয়েকবার এবং মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছে বারবার এবং যার আগমনের সাথে সাথে সৌভাগ্যের সূর্যোদয় ঘটেছে মজলুম ক্যারিবিয়ানদের জীবনে, সেই আহমদ মুসার কথা সে এদের বলতে পারবে না।

কিন্তু তার পরিনতি কি হবে। সে তো তার জীবনের সবকিছু হারাবে, একটা সজীব দেহের খোলস ছাড়া তো তার কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না। এই জীবন নিয়ে বাঁচবে কি করে সে! গোটা দেহ মন তার আর্তনাদ করে উঠল। গোটা পৃথিবী এবং তার মৃত্যুর বিনিময়েও সে এই পরিনতি থেকে বাঁচতে চায়। এক

আহমদ মুসা কি এই গোটা পৃথিবী এবং তার জীবনের চেয়ে বড় হয়ে গেল? আহমদ মুসা তার কে? কিন্তু এই প্রশ্ন উচ্চারণ করতে গিয়ে কেঁপে উঠল তার হৃদয়। হৃদয়ের কোন দরজা যেন খুলে গেল। ভীষণভাবে চমকে উঠল ডাঃ মার্গারেট। একি দৃশ্য সেখানে! হৃদয়ের সে গহীনে আহমদ মুসা যে তার জীবন ও তার পৃথিবীর চেয়ে বড় আসন নিয়ে বসে আছে। হৃদয়ের সবটুকু জুড়ে যে সে সমাসীন! সবটা হৃদয় উপচে একটাই সুর জেগে উঠল, আহমদ মুসার জন্যে কোন ত্যাগই তার কাছে বড় নয়, কোন পরিণতিই তাকে পিছপা করতে পারে না।

নিজেকে এইভাবে আবিষ্কার করে আঁৎকে উঠল মার্গারেট। কি অন্যায় করে সে বসে আছে! ও জানতে পারলে নিশ্চয় তাকে অন্ধ, অবিবেচক ও জঘন্য চরিত্রের বলে মনে করবে। সত্যিই সে সব জেনেও অন্ধের মত কাজ করেছে।

কিন্তু কি দোষ তার! সজ্ঞানে তো আমি এমনটা কখনো চিন্তা করিনি।

চোখ থেকে নেমে আসা অবিরল ধারার অশ্রু মুছে ফেলল মার্গারেট। হঠাৎ তার মনের ভয়গুলো যেন কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে। তার নিজের আর কিছুই নেই, তাই কিছু হারাবার ভয়ও নেই। তার সামনে আর কোন চাওয়া নেই, তাই আর কিছু পাওয়ারও প্রশ্ন নেই। কোন অদৃশ্য লোক থেকে যেন একটা প্রশান্তির হাওয়া নেমে এল তার হৃদয় জুড়ে। আহমদ মুসার জন্যে সে সবকিছু উৎসর্গ করতে প্রস্তুত, এর চেয়ে বড় সাফল্য তার আর কি হতে পারে!

নতুন ধরনের এক কান্না নেমে এল তার দু'চোখ জুড়ে। এ যেন আপনার চেয়ে আপন যিনি, তার জন্যে সব হারানোর প্রশান্তি।

দু'হাতে চোখ চেপে উপুড় হয়ে পড়ে মেঝেতে মুখ গুজেছে মার্গারেট। যেন সে লুকাতে চায় তার একান্ত আপনার এ কান্না। কিন্তু তার এ কান্না দেখার তো কেউ নেই ঘরের চার দেয়াল ছাড়া।

বাহামার সানসালভাদর।

সানসালভাদরের কলম্বাস বিমান বন্দরে ল্যান্ড করল আহমদ মুসা। বিমানের সিঁড়ি থেমে সামনে তাকাতেই ছোট আকারের দোতলা টারমিনালের উপর দিয়ে দেখতে পেল কলম্বাস মনুমেন্ট। কলম্বাস মনুমেন্টটি কলম্বাস নৌবন্দরের প্রবেশ মুখে। মনুমেন্ট পেরিয়ে সমুদ্র যাত্রার জন্যে নৌবন্দরে প্রবেশ করতে হয়।

কলম্বাস নৌবন্দরের পাশেই গড়ে তোলা হয়েছে কলম্বাস বিমান বন্দর।

বিমান বন্দর থেকে বেরিয়ে এল আহমদ মুসা। তার মুখে ইহুদী বারবীদের মত দাঁড়ি। মাথায় বারবীদের মতই পেয়ালা মার্কা টুপি। তাকে একবার দেখেই যে কেউ বলবে ইসরাইলের একজন তরুণ বারবী এসেছে কলম্বাসের স্মৃতি বিজড়িত সানসালভাদরে বেড়াতে।

আহমদ মুসার দরকার একজন ভাল ট্যাক্সিওয়ালা। এখন তার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন 'দি ব্লু বার্ড' এয়ারলাইন্সের ঠিকানা। এয়ারপোর্টের কাউন্টারে এটা সে জিজ্ঞেস করতে পারতো। কিন্তু নিরাপদ মনে করেনি আহমদ মুসা। হোয়াইট ঈগল-এর জাল এ ছোট্ট বিমান বন্দরে কতটা বিস্তৃত এবং কে তাদের সাথে আর কে নেই তার কিছুই সে জানে না। জিজ্ঞেস করতে গিয়ে হঠাৎ সে তাদের চোখে পড়ে যেতে পারে। সে চায়না মার্গারেটের দেখা পাওয়ার আগে তাকে শত্রু শিবির চিনে ফেলুক।

আহমদ মুসা টারমিনালের বাইরে গিয়ে হাতের ব্যাগটা মাটিতে রেখে ট্যাক্সি ষ্ট্যান্ডের দিকে তাকাতেই ট্যাক্সি ষ্ট্যান্ড থেকে একজন লোক এগিয়ে এল। আহমদ মুসার সামনে এসে বলল, 'গাড়ি লাগবে স্যার?'

'হ্যাঁ। তুমি 'দি ব্লু বার্ড' এয়ার লাইন্স-এর অফিস চেন?'

'ওটা তো এয়ারলাইন্স নয় স্যার, একটা এয়ার কোম্পানী। কোন লাইনে ওরা যাতায়াত করে না, কোন যাত্রীও বহন করে না, সাধারণ কোন কার্গো ক্যারিয়ারও নয়। আমার মনে হয় রিজার্ভ ক্যারিয়ার হিসাবে কাজ করে। যে নেয় গোটা বিমান ভাড়া নেয়।'

আহমদ মুসার কাছে এ তথ্যগুলো খুবই মূল্যবান। কিন্তু এ বিষয়ে কোন কথা বলল না। জিজ্ঞেস করল 'দি ব্লু বার্ড'-এর অফিস কোথায় কতদূর?'

‘বেশি দূরে নয়, কলম্বাস কমপ্লেক্সের ওপাশে।’ বলল ট্যাক্সির লোকটি।

‘তাহলে চল।’

বলে আহমদ মুসা ব্যাগটি হাতে তুলে নিল।

‘স্যার কি বিমান ভাড়া-টাড়া নেবেন?’ বলল হাঁটতে হাঁটতে ট্যাক্সির লোকটি।

‘দেখি ওদের সাথে বনিবনা কেমন হয়।’ বলল আহমদ মুসা।

তারা গাড়িতে উঠল। গাড়ি চলতে শুরু করলে আহমদ মুসা বলল, ‘দেশে শান্তি কেমন আছে, কোন গন্ডগোল নেই তো?’

আহমদ মুসা একটু টোকা দিয়ে তার দৃষ্টি ভংগি জানতে চাইল।

‘না স্যার কোন অসুবিধা নেই। তবে অশ্বেতাংগ বিদেশীরা থাকতে চাইলেই অসুবিধা।’ বলল লোকটি। লোকটিও অশ্বেতাগং, মিশ্র শ্রেণীর।

‘কেমন অসুবিধা?’

‘তাদের থাকতে দেয়া হচ্ছে না।’

‘নাগরিকত্ব নিয়ে থাকতে চাইলেও?’

‘ক’বছর আগেও অশ্বেতাংগদের নাগরিকত্ব দেয়া হয়েছে। এখন একদম বন্ধ।’

‘কেন?’

‘জানি না। তবে শোনা যায়, অশ্বেতাংগদের সংখ্যা আর বাড়তে দেয়া হবে না। অন্যদিকে স্যার, শ্বেতাংগদের সংখ্যা বাড়াবার জন্যে ¯্রােতের মত শ্বেতাংগদের নিয়ে আসা হচ্ছে।’

‘কেন, এর প্রতিবাদ হয় না? অশ্বেতাংগরা তো এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ।’

‘স্যার এসব হচ্ছে আইন করে নয়, বেআইনি ভাবে। শ্বেতাংগদের নিয়ন্ত্রণে সরকার। আইনের লোকেরা চোখের আড়ালে বেআইনি কাজ করে যাচ্ছে, ধরবে কে?’

‘আচ্ছা এই ‘দি ব্লু বার্ড’ এয়ার লাইন্সটা কাদের?’

‘আমি জানি না স্যার। তবে এদের অফিসটা কলম্বাস কমপ্লেক্সে ছিল। স্থান সংকটের কারনে নতুন জায়গায় অফিস নিয়েছে। স্যার, যারা কলম্বাস কমপ্লেক্সে জায়গা পায় তারা খাস শ্বেতাংগ।’

‘ধন্যবাদ। তোমার নাম কি?’

‘জন কার্লোস।’

‘তুমি খৃষ্টান?’

‘আমার আব্বা খৃষ্টান ছিলেন। মা খৃষ্টান ছিলেন না।’

‘তুমি?’

‘মন খারাপ হলে মাঝে মাঝে গীর্জায় যাই স্যার।’

মিনিট দশেকের মধ্যেই এসে পৌছল তারা ‘দি ব্লু বার্ড’ অফিসের সামনে।

রাস্তার উপর গাড়ি দাঁড় করাল কার্লোস।

রাস্তার পরে ছোট্ট একটা প্রাঙ্গন। প্রাঙ্গনের পরেই তিন তলা একটা বিল্ডিং।

বিল্ডিং-এ ঢোকার গেট মুখে একটা সাইনবোর্ড। তাতে লেখা, ‘দি ব্লু বার্ড লিমিটেড’। তার নিচে লেখা একটা অভিজাত প্রাইভেট এয়ার কোম্পানী।’

ড্রাইভার কার্লোস ঘুরে এসে আহমদ মুসাকে নামার জন্যে গাড়ির দরজা খুলে ধরে বলল, ‘স্যার আমি কি অপেক্ষা করব?’

‘কিছুটা সময় দেখতে পার, দেরী হলে চলে যেয়ো।’

বলে আহমদ মুসা পঞ্চাশ বাহামা ডলারের একটা নোট তুলে দিল কার্লোসের হাতে।

কার্লোস নোটটার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘স্যার আমার কাছে তো ভাঙতি নেই।’

‘নোটটা তো তোমাকে ভাঙাবার জন্যে দেইনি কার্লোস।’

কার্লোস বিস্ময়ের সাথে বলল, ‘স্যার, ভাড়া মাত্র ২০ ডলার, আপনি দিয়েছেন ৫০ ডলার।’

‘যা ভাড়া হওয়া উচিত, তাই তোমাকে দিয়েছি।’

‘পোর্টরিকো কিংবা ফেøারিডার হিসাবে ধরলে ঠিক বলেছেন।’ বলতে বলতে লজ্জা ও সংকোচের সাথে নোটটা কার্লোস পকেটে রাখল।

আহমদ মুসা অফিসের দিকে হাঁটা শুরু করল।

অফিসের বারান্দা বেশ উঁচু। বড় বড় তিনটি সিঁড়ি পেরিয়ে বারান্দায় উঠা যায়।

অফিস বিল্ডিংটির দু'পাশের অংশ বারান্দার সিঁড়ির সমান্তরাল। আর প্রশস্ত অর্ধ চন্দ্রকার বারান্দাটি বিল্ডিং-এর পেট থেকে অনেকখানি জায়গা নিয়ে নিয়েছে।

আহমদ মুসা বারান্দায় উঠে দেখতে পেল ভেতরে ঢোকার দরজা কাঁচের। আহমদ মুসা কাঁচের দরজা টেনে ভেতরে প্রবেশ করল। দরজার পরে একটা প্রশস্ত ঘর।

ঘরের ঠিক মাঝখানে বসে আছে টেবিল-চেয়ার নিয়ে একজন। তার টেবিলে রয়েছে একটা টেলিফোন, একটা রেজিষ্টার বুক, একটা কলমদানি এবং কিছু কাগজপত্র পেপার ওয়েট দিয়ে চাপা দেয়া।

আহমদ মুসা বুঝল লোকটি রিসেপশনিষ্ট। বয়সে যুবক।

আহমদ মুসা ঢুকতেই রিসেপশনিষ্ট যুবক বলল, ‘এদিকে আসুন, কি চাই আপনার?’

আহমদ মুসা তার দিকে এগিয়ে বলল, ‘স্যাররা কেউ আছেন?’

‘চেয়ারম্যান, ডিরেক্টর সবাই আছেন। কাকে চান?’

‘চেয়ারম্যান।’

রিসেপশনিষ্ট টেলিফোন হাতে তুলে নিতে নিতে বলল, ‘কি কাজে দেখা করতে চান?’

‘এয়ার লাইন্স নিয়ে।’

রিসেপশনিষ্ট কথা বলল টেলিফোনে। টেলিফোন রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘চলুন।’

কিন্তু এক ধাপ এগিয়েই ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, ‘একটু দাঁড়ান বাইরের দরজাটা লক করি।’

বলে সে টেলিফোনের পাশ থেকে ছোট রিমোর্ট কনট্রোল টেনে নিয়ে একটা বোতামে চাপ দিল।

আহমদ মুসা বুঝল, দরজাটা রিমোর্ট কনট্রোলের অধীন। এদের সবকিছুই কি তাহলে এ ধরনের রিমোর্ট কনট্রোলের মত সর্বাধুনিক ব্যবস্থার অধীন?

রিসেপশনিষ্ট হাঁটতে শুরু করেছে।

আহমদ মুসা তার পেছনে পেছনে চলল।

দু'তলায় উত্তর-পূর্বের একেবারে প্রান্তের একটা দরজার সামনে দাঁড়াল রিসেশনিষ্ট।

নক করল সে দরজায়। তারপর প্রবেশ করল চেয়ারম্যানের পি,এ এর কক্ষে।

পি,এ এর কক্ষে পৌছে দিয়েই রিসেপশনিষ্ট ফিরে গেল।

পি,এ একজন শ্বেতাংগ তরুণী।

আহমদ মুসাকে বসতে বলেই সে ইন্টারকমে বলল, 'স্যার ভিজিটর এসেছেন।'

'আচ্ছা, পাঠিয়ে দাও।'

পি,এ তরুণীটি উঠে পাশের দরজাটা খুলে ধরে বলল, 'যান ভেতরে স্যার।'

আহমদ মুসা প্রবেশ করল।

দেখল, ঘরের প্রায় মাঝ বরাবর একটা সুদৃশ্য টেবিলের ওপাশে একটা রিভলভিং চেয়ারে গা এলিয়ে বসে আছে একজন মাঝ বয়সী শ্বেতাংগ। বলিষ্ঠ চোয়াল, তীক্ষè চোখ লোকটির। মুখ দেখেই বুঝা যায়, শরীরে একটুকুও মেদ নেই। খেলোয়াড় কিংবা সেনাবাহিনীর লোক হলে তাকে মানাতো ভাল।

লোকটি আহমদ মুসাকে দেখেই চেয়ারে সোজা হয়ে বসল। সামনে টেবিলের ওপাশে চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলল।

ধন্যবাদ জানিয়ে আহমদ মুসা বসল।

'বলুন, কি প্রয়োজন আপনার?' তীক্ষè দৃষ্টি লোকটির চোখে।

'আমি 'বাহামা এয়ার' অফিসে গিয়েছিলাম জানার জন্যে যে ওদের 'চাটার্ড সিস্টেম' আছে কিনা। তারা দুঃখ প্রকাশ করে আপনাদের কথা বলল। সে জন্যে এসেছি।'

লোকটির চোখে বিস্ময়। বলল, 'কি চাই আপনার?'

'এখান থেকে পোর্টেরিকা, এখান থেকে গ্রান্ড টার্কস, এইসব দূরত্বের ভাড়া কত? শুনলাম গতকাল আপনাদের একটা বিমান কারা যেন গ্রান্ড টার্কসে নিয়ে গিয়েছিল। ভাড়া কত ছিল?'

লোকটির প্রতিক্রিয়া জানা এবং তাকে স্বরূপে বের করে আনার জন্যেই আহমদ মুসা শেষ বাক্যটা বলল।

আহমদ মুসার শেষ কথা শোনার সংগে সংগেই লোকটির চোখ চঞ্চল হয়ে উঠল। বলল, 'গ্রান্ড টার্কস-এ যাওয়ার তথ্যও কি ওরাই দিয়েছে?'

'হ্যাঁ, আমি এয়ারপোর্ট থেকেই শুনেছি।'

'আর কি শুনেছেন? আমরা কখন কি নিয়ে ফিরলাম তা বলেনি?' লোকটির ঠোঁটে বাঁকা হাসি। তার চোখের দৃষ্টি শক্ত।

চমকে উঠল আহমদ মুসা। লোকটি তাকে সন্দেহ করেছে।

আহমদ মুসার চিন্তা আর সামনে এগুতে পারল না। পেছনে পায়ের শব্দ পেয়ে ফিরে তাকাল। দেখল উদ্যত রিভলবার হাতে দু'জন যুবক তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

সামনে তাকাল আহমদ মুসা। দেখল চেয়ারে বসা লোকটির হাতেও রিভলবার। তার বুক বরাবর তাক করা।

আহমদ মুসা ফিরে তার দিকে তাকাতেই হো হো করে হেসে উঠল লোকটি। শিকারকে জালে আটকানোর তৃপ্তির হাসি এটা।

বলল লোকটি, 'দেখ তোমার সাজানো কথা খুবই কাঁচা ধরনের হয়েছে। সত্যি তুমি বিমান বন্দরে খোঁজ নিলে এই কথা বলতে পারতে না। এয়ার পোর্টের কাউন্টার ক্রু থেকে শুরু করে দায়িত্বশীল সবাই জানে 'দি ব্লু বার্ড' শুধু প্রাইভেট নয়, একেবারে পার্সেনাল। কখনই ভাড়া খাটে না। দ্বিতীয়ত, আমাদের বিমান যে

গ্রান্ড টার্কস-এ গেছে, তা বিমান বন্দরের একজনও জানে না। সুতরাং তুমি মিথ্যা কাহিনী সাজিয়েছ।'

বলে একটু থামল। থেমেই আবার মুখ খুলল। কঠোর কণ্ঠে বলল, 'কে তুমি?'

আহমদ মুসা একটু হাসল। বলল, 'আর এ কথা জিজ্ঞাসার কি প্রয়োজন আছে? আমি কে না জেনেই কি আপনারা রিভলবার বের করেছেন?'

লোকটি টেবিলে এক প্রচন্ড মুষ্ঠাঘাত করল। বলল, 'ঠিক বলেছ।' তারপর আহমদ মুসার পেছনে দাঁড়ানো রিভলবারধারীদের একজনকে লক্ষ্য করে বলল, 'এই একে বেঁধে ফেল।'

লোকটি রিভলবারটি পকেটে পুরে প্রথমে আহমদ মুসার দু'হাত পিছমোড়া করে বাঁধল, তারপর দু'পা। আহমদ মুসা যেভাবে চেয়ারে বসেছিল, ঐভাবেই বসে থাকল।

সামনে বসা সেই মাঝ বয়সী লোকটি তার হাতের রিভলবার টেবিলে রেখে তার মোবাইল টেলিফোনটি টেনে নিল। বলল, 'মিঃ ফার্ডিন্যান্ডকে ব্যাপারটা জানাই।'

'ফার্ডিন্যান্ড কে?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'তোমার বাপ।' মুখ বাঁকা করে বলল লোকটি।

টেলিফোন সংযোগের পর বলল লোকটি, 'স্যার আমাদের অফিসে একজন লোক ধরা পড়েছে।' তারপর গোটা বিবরণ দিয়ে বলল, 'লোকটি ইহুদী বেহারার স্যার। কোন কিছুর গোপন অনুসন্ধানে এসেছে বলে মনে হয়।'

'আপনার ওখানে পাঠাব স্যার?'

'বুঝেছি স্যার। ওখানে ঝামেলা বাড়িয়ে কাজ নেই।'

'ঠিক স্যার। এসব চুনোপুঁটির দায়িত্ব আমরা নিতে পারি।'

'নিকেশ করে ফেলব?'

'ঠিক আছে। আমরা কিছু কথা বের করার চেষ্টা করি। কিছু আদায় করে আপনাকে জানিয়ে তারপর আমরা যা করার সেটা করব স্যার।'

'ধন্যবাদ স্যার।'

টেলিফোন রেখে দিল লোকটি।

আহমদ মুসা ফার্ডিন্যান্ড নামক লোকটির টেলিফোন নাম্বারটি মনে মনে বার বার আওড়িয়ে মুখস্থ করছিল। মোবাইলে লোকটির আঙুলের মুভমেন্ট দেখেই টেলিফোন নম্বারটি ঠিক করে নিয়েছিল।

আহমদ মুসা টেলিফোনের ওপারের কথা শুনতে পায়নি বটে, কিন্তু লোকটির কথাগুলো থেকে গোটা ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে আহমদ মুসা। তাকে চুনোপুঁটি বিবেচনা করে তাকে এখানেই শেষ করার দায়িত্ব ফার্ডিন্যান্ড এদের হাতে দিয়েছে। তার আগে এরা তার পরিচয় ও তার কাছ থেকে কথা আদায়ের চেষ্টা করবে।

খুশী হলো আহমদ মুসা।

বন্দী হওয়ার ক্ষতির মধ্যে বড় লাভ এই হবে যে, মার্গারেটকে ওরা কোথায় বন্দী করে রেখেছে তা জানার একটা পথ হবে। ফার্ডিন্যান্ড কে? তার টেলিফোন নম্বার পেয়েছে। কিন্তু মোবাইল টেলিফোন নম্বার থেকে ঠিকানা বের করা কঠিন। ফার্ডিন্যান্ড কি হোয়াইট ঈগলের কোন নেতা? নিশ্চয় কোন বড় নেতা হবে। না হলে তাকে 'নিকেশ' করার এত বড় সিদ্ধান্ত দিল কি করে সে? মার্গারেটকে হোয়াইট ঈগল কোথায় রেখেছে? এরা কি তা জানে? না এটা জানার জন্যে ফার্ডিন্যান্ড পর্যন্ত পৌছতে হবে?

আহমদ মুসা ভাবনার সূত্র ছিঁড়ে গেল লোকটির উচ্চ কণ্ঠে। বলছিল সে, 'একে নিয়ে যাও। ঠান্ডা করার কক্ষে রেখে দাও। আমি পরে আসছি।'

সঙ্গে সঙ্গেই দু'দিক থেকে দু'জন এসে ঘরে ঢুকল। আহমদ মুসাকে টেনে তুলে চ্যাং দোলা করে নিয়ে চলল। রিভলবারধারী দু'জন রিভলবার উঁচিয়ে তাদের পেছনে পেছনে চলল।

আহমদ মুসাকে তারা নিয়ে গেল গ্র্যান্ড ফ্লোরে। সেখান থেকে ভু-গর্ভস্থ ফ্লোরে।

আহমদ মুসাকে বহনকারী দু'জন ভু-গর্ভস্থ ফ্লোরের একটা কক্ষের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

রিভলবারধারীদের একজন এগিয়ে এসে আলফাবেটিক্যাল কম্পিউটার লক'-এর 'কী বোর্ড'-এর চারটা 'কী'তে নক করল। খুলে গেল দরজা।

যারা আহমদ মুসাকে বহন করছিল, তারা দরজায় দাঁড়িয়েই ছুড়ে দিল আহমদ মুসাকে ঘরের মধ্যে।

আহমদ মুসার দেহের মাথার অংশটা গিয়ে পড়ল লোহার খাটিয়ার উপর এবং নিচের অংশটা মেঝের উপর।

লোহার 'এল' টাইপ এ্যাংগল বার দিয়ে খাটিয়ার পায়াসহ চারধারের কাঠামো তৈরি। খাটিয়ার প্রান্তের এ্যাংগল বারের সাথে ধাক্কা খেয়ে আহমদ মুসার বাম পাশের কপালটা কেটে গেল। ঝর ঝর করে রক্ত নেমে এল মুখের উপর।

আহমদ মুসা মাথাটা তুলে খাটিয়ায় হেলান দিয়ে সোজা হয়ে বসল।

আহমদ মুসার রক্তাক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে তৃপ্তির হাসি হাসল দরজায় দাঁড়ানো ওরা।

বলল রিভলবারধারীদের একজন, 'মরতে এসেছিলে না? কেবল তো কপাল থেকে রক্ত বেরুল। বস যখন আসবেন, তখন সারা গা থেকেই রক্ত ঝরবে।'

কপালে আঘাত, রক্ত ঝরা এ সবের কোন দিকেই আহমদ মুসার খেয়াল নেই। তার গোটা চিন্তা ফার্ডিন্যান্ডকে নিয়ে আবর্তিত হচ্ছে। একটা প্রশ্ন করবার সুযোগ পেয়ে গেল ওদের কথা থেকে। বলল, 'তোমাদের বস ফার্ডিন্যান্ড আসবেন এখানে?' ইচ্ছা করেই খোঁচা দেয়ার মত প্রশ্নটা করল আহমদ মুসা।

'ছো। তোমার মত চুনোপুঁটির কাছে ফার্ডিন্যান্ড আসবে কেন? জান, সে আমাদের বসের বস।'

'ও তাহলে তো রাজধানী নাসাউতে থাকেন না?'

হাসল রিভলবারধারীটি। বলল, 'তুমি ঘোড়ার ডিম জান। এই তো কলম্বাস কমপ্লেক্সে উনার অফিস, বাড়িও তো ওখানে।'

'রসিকতা করছেন। অত বড় লোক এত ছোট জায়গায় থাকেন, বিশ্বাস হয় না।' বলল আহমদ মুসা।

'তুমি গন্ডমুর্খ দেখছি। সানসালভাদর, কলম্বাস কমপ্লেক্সকে তুমি ছোট জায়গা বলছ? জান তুমি গোটা ক্যারিবিয়ানের হোয়াইট ঈগল-এর হেড কোয়ার্টার কলম্বাস কমপ্লেক্সে।'

আহমদ মুসার মন আনন্দে নেচে উঠল। তার মন বলল, কপালে সে যে আঘাত পেয়েছে তার মত শত আঘাতের চেয়েও এই তথ্য মূল্যবান। মনে মনে সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। শেষ বিষয়টি জেনে নেয়ার চেষ্টার মতই প্রশ্ন করল আহমদ মুসা, 'ও তোমাদের বসের বস ফার্ডিন্যানড-এর অফিস এবং হোয়াইট ঈগলের হেড কোয়ার্টার তাহলে এক জায়গায়?'

'গর্দভ কোথাকার, এক জায়গায় হবে কেন, একই অফিস তো। ফার্ডিন্যান্ড তো হোয়াইট ঈগল-এর চীফ বস।'

বলেই সে দরজা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিল। আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি বলল, 'আর একটা কথা জনাব। আপনারা কয়দিন আমাকে বন্দী করে রাখবেন? ছাড়া পাব কবে?' খুব বিপদে পড়া প্রাণ ভয়ে ব্যাকুল মানুষের মতই বিনয়ের সাথে বলল আহমদ মুসা।

শুনে ওরা চারজনই মজা পাওয়ার মত হি হি করে হেসে উঠল। সেই রিভলবারধারীই বলল, 'কোন চিন্তা নেই, কোন চিন্তা নেই। আমাদের মেহমান হওয়ার পর কেউ আমাদের কখনও ছেড়ে যায়নি। তুমিও যাবে না।'

বলেই দরজা বন্ধ করে দিল সে।

দরজা বন্ধ হবার পর হাসল আহমদ মুসা। বেচারায় ওরা তাকে চুনোপুঁটি মনে করে বলার কিছুই বাকি রাখেনি। শুধু একটা বিষয়ই অস্পষ্ট থাকল তার কাছে। সেটা হলো, ডাঃ মার্গারেট কোথায় বন্দী আছে। হোয়াইট ঈগলের হেড কোয়ার্টারেই কিনা?

'তাড়াতাড়ি তাকে এখান থেকে বের হতে হবে' ভাবল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা হাত-পা নেড়ে দেখল হাত-পায়ের বাঁধন বেশ শক্ত। হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল এ্যাংগল বার খাটিয়ার কথা। আহমদ মুসা পেছন ফিরে এ্যাংগল বারের তৈরি খাটিয়ার পায়ার দিকে তাকাল। দেখে খুশী হলো। এ্যাংগল বারের প্রান্ত মরিচা পড়ে ধারালো হয়েছে। আহমদ মুসা পায়ার দিকে এগিয়ে

গেল। পায়ার দিকে পিঠ করে বাঁধা দুই হাত দিয়ে এ্যাংগলের প্রান্ত খুঁজে নিয়ে তাতে হাতের বাঁধন ঘষতে শুরু করল আহমদ মুসা। প্লাষ্টিক কর্ডের বাঁধন। প্রায় আধ ঘণ্টার চেষ্টায় আহমদ মুসার হাতের বাঁধন কেটে গেল। পায়ের বাঁধন খুলে ফেলল সে।

ঠিক এই সময়েই দরজার বাইরে পায়ের শব্দ পেল আহমদ মুসা। সেই সাথে কথাও শুনতে পেল। একজন বলছে, 'বস না এখানে রাতে আসার কথা?'

'ঠিক জানি না। বস বললেন, সাপ নিয়ে বেশিক্ষণ খেলতে নেই।'

আহমদ মুসা বুঝল। ওরা দরজা খুলতে এসেছে।

আহমদ মুসা উঠে এক দৌড়ে দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

এক পাল্লার দরজা। দরজার পাল্লা ভেতরের দিকে খোলে।

খোলার পর পাল্লা যে দিকে সরে যায়, সেদিকে থাকলে আড়ালে থাকা যায়। কিন্তু সমস্যা হলো, দরজা খুলে যাওয়ার সংগে সংগে তাকে দেখতে না পেলে ওরা সতর্ক হয়ে যাবে। এই অবস্থায় খালি হাতে তাদের মোকাবিলা করা কঠিন হবে।

এই সব চিন্তা করে আহমদ মুসা দরজার অন্যপাশে প্রায় চৌকাঠে গা ঘেঁষে দেয়াল সেঁটে দাঁড়াল। আহমদ মুসা বুঝল, ওরা দরজা খুলে বিশেষভাবে এদিকে একটু চোখ ফেললেই দেখতে পাবে তাকে। কিন্তু আহমদ মুসা চিন্তা করল, দরজা খোলার পর ওদের দৃষ্টি স্বাভাবিকভাবেই প্রথমে ছুটবে ঘরের মাঝখান বা খাটিয়ার দিকে। এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে তাদের দৃষ্টি এদিকে আসার আগেই ওদের উপর চড়াও হতে পারবে আহমদ মুসা।

গোটা দেহ মাথা দেয়ালের সাথে সেঁটে রেখে দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে চোখ রেখেছিল দরজার উপর।

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিল আহমদ মুসা।

দরজার বাইরে তাদের বস দি ব্লু বার্ডের চেয়ারম্যানের কণ্ঠ শুনতে পেল আহমদ মুসা। সেই নির্দেশ দিল, দরজা খোলার।

দরজা খুলে গেল। ঘরের মাঝ বরাবর তাক করা একটা রিভলবার এবং রিভলবার ধরা হাত আহমদ মুসার নজরে পড়ল প্রথমে।

আহমদ মুসা বাজের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল ঐ রিভলবার লক্ষ্যে।

আহমদ মুসার ডান হাত ছোঁ মেরে রিভলবারটি চেপে ধরল। কিন্তু তার দেহটি রিভলবারধারীর হাতে সামান্য বাধা পাওয়ার পর পড়ে গেল করিডোরের উপর।

আহমদ মুসা প্রস্তুত হয়েই লাফ দিয়েছিল। তার বাম হাত ও রিভলবার কেড়ে নেয়া ডান হাত প্রথমে করিডোরে গিয়ে পড়ল। এ দু'হাতের উপর দেহের ভর নিয়ে দেহটা ছুড়ে দিল মাথার উপর দিয়ে সামনে। কারও দেহকে আঘাত করেছিল শূন্য দিয়ে সামনের দিকে ছুটে যাওয়া তার দু'টি পা।

আহমদ মুসার দেহটা চিৎ হয়ে পড়ল করিডোরের উপর।

আহমদ মুসার চোখ দু'টি প্রথমেই দেখল তার মাথার কাছে দু'জনকে। সেই দু'জন রিভলবারধারী। ওদের একজনের হাতে রিভলবার নেই, তার কাছ থেকেই রিভলবার কেড়ে নিয়েছে আহমদ মুসা। আর একজনের হাতে রিভলবার। কিন্তু বিমূঢ় লোকটির রিভলবার তখনও তাকে তাক করে সারেনি।

আহমদ মুসার প্রস্তুত এবং ক্ষিপ্র হাতের রিভলবার দু'বার অগ্নি বৃষ্টি করল।

রিভলবারের দু'টি গুলী দু'জনেরই থুথনির নিচ দিয়ে ঢুকে গেল মাথায়।

আহমদ মুসা গুলী করেই তাকাল তার পায়ের দিকে। সেখানে একজন পড়ে গিয়েছিল। নিশ্চয় লোকটি হবে এদের 'বস' অর্থাৎ ব্লু বার্ডের চেয়ারম্যান, যে আসছিল আহমদ মুসার কাছ থেকে কথা আদায় করে তারপর 'নিকেশ' করে ফেলতে।

আহমদ মুসা দেখল, হ্যাঁ, সে বস লোকটিই।

সে উঠে দাঁড়িয়েছে এবং পকেট থেকে রিভলবার বের করছে। পকেট থেকে সে রিভলবার বের করেছে মাত্র।

আহমদ মুসা তৃতীয় গুলীটি ছুঁড়ল তাকে লক্ষ্য করে।

বুকে গুলী খেলে লোকটি সেখানেই ঢলে পড়ল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। রিভলবার বাগিয়ে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে একটু অপেক্ষা করল। না কেউ নেই, কোন সাড়া-শব্দ কোথাও নেই।

ছুটল এবার আহমদ মুসা উপরে ওঠার সিঁড়ির দিকে।

সিঁড়ির গোড়ায় পৌছে আহমদ মুসা দেখল, সিঁড়ির মাথায় গ্রাউন্ড ফ্লোরে উপর মুখে সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ।

আহমদ মুসা দ্রুত সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠল। আহমদ মুসা খুশী হলো। এখানে বন্দীখানার মতই কম্পিউটার লক। এ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে কী বোর্ড সাজানো।

আহমদ মুসা দেখেছিল বন্দীখানার লক খোলার জন্যে 'কী' বোর্ডের যে 'কী'গুলোতে লোকটি আঙুল ফেলেছিল তা যোগ করলে 'EGLE' শব্দ দাঁড়ায়। সুতরাং বন্দীখানার কম্পিউটার লক খোলার কোর্ড ওয়ার্ড ছিল 'EGLE' এখানেও কি তাই?

আহমদ মুসা দুরু দুরু বুকে বোর্ডের চারটি 'কী'তে তর্জ্জনি দিয়ে 'EGLE' শব্দ বানাল। শেষ 'ঊ' বর্ণে চাপ পড়ার সাথে সাথেই মাথার উপর পুরু লোহার পাত সরে গেল।

আহমদ মুসা একটু অপেক্ষা করল। না কেউ এল না। লাফ দিয়ে উপরে উঠল আহমদ মুসা।

কাউকে চোখে পড়ল না। বুঝল, ভূ-গর্ভের কোন শব্দ বাইরে না আসায় এরা কিছুই বুঝতে পারেনি।

আহমদ মুসা চুপি চুপি সরে পড়াই ঠিক মনে করল। এখানে গোলা-গুলী খুব সহজেই বাইরের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

আহমদ মুসা দেখেছে, সিঁড়ি মুখ থেকে পুব দিকে কিছুদূর এগুবার পর উত্তরে টার্ন নিলেই রিসেপশন কক্ষে প্রবেশ করা যায়।

আহমদ মুসা রিভলবার বাগিয়ে বিড়ালের মত নিঃশব্দে ছুটল পূবদিকের সেই করিডোর ধরে।

দক্ষিণমুখী একটা করিডোরের মুখ তখন অতিক্রম করছিল আহমদ মুসা।

একটা শব্দ পেয়ে তাকাল সেই করিডোরের দিকে। তাকিয়েই দেখতে পেল একজন লোক এবং তার উদ্যত রিভলবার তাকে তাক করা।

আহমদ মুসা তার রিভলবার ঘোরাবার সুযোগ পেল না। একটা গুলী এসে তার বুড়ো আঙুল সমেত রিভলবারে আঘাত করল।

হাত থেকে আহমদ মুসার রিভলবার খসে পড়ে গেল।

আহমদ মুসা রিভলবারের সাথে সাথেই আছড়ে পড়েছিল মেঝের উপর। যেন গুলী বিদ্ধ হয়ে সে ঢলে পড়েছে মাটিতে।

গুলী বর্ষণকারী লোকটিও মুহূর্তের জন্যে দ্বিধায় পড়েছিল এ নিয়ে। এই সুযোগেই আহমদ মুসার বাম হাত রিভলবার কুড়িয়ে গুলী করল লোকটিকে।

লোকটি এত তাড়াতাড়ি পাল্টা আক্রমণের শিকার হবে বুঝেনি। তারই খেসারত হিসাবে বুকে গুলী বিদ্ধ হয়ে ঢলে পড়ল মাটিতে।

আহমদ মুসা রিসেপশনের দরজায় এসে দেখল এদিকে গুলীর শব্দ শুনে রিসেপশনিষ্ট হাতে রিভলবার নিয়ে এদিকে এগুচ্ছে। আহমদ মুসাকে রিভলবার হাতে একেবারে মুখোমুখি দন্ডায়মান দেখে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল সে।

আহমদ মুসা তার দিকে রিভলবার তাক করে বলল, 'বাঁচতে চাইলে রিভলবারটি ফেলে দিয়ে ঐ টয়লেটে ঢোকো গিয়ে।'

রিসেপশনিষ্ট যুবকটি দৌড় দিয়ে গিয়ে টয়লেটে ঢুকল।

আহমদ মুসা রিভলবারটি কুড়িয়ে নিয়ে টয়লেটের সিটকিনি লাগিয়ে রিসেপশনিষ্টের টেবিলে ফিরে এসে রিমোর্ট কন্ট্রোলের বোতাম টিপে বাইরের দরজা খুলে ফেলল। তারপর দৌড় দিল বাইরে।

বাইরে রাস্তায় বেরিয়ে আহমদ মুসা চিন্তা করল কোন দিকে যাবে। আহমদ মুসার আশু দরকার হলো, আহত বুড়ো আঙুলটাকে একটু দেখা এবং মুখের রক্ত মুছে ফেলা। এসব নিয়ে মানুষের মধ্যে যাওয়া যাবে না।

ডান দিকে শহর, আর বাঁ দিকে অপেক্ষাকৃত জনবিরল, গাছপালাও প্রচুর। এ দিকে প্রয়োজনীয় আড়াল পাওয়া যাবে।

আহমদ মুসা বাঁ দিকে ছুটল।

কিছু এগিয়েই একটা ট্যাক্সি দেখতে পেল রাস্তার পাশে গাছের ছায়ায় দাঁড়ানো। পরক্ষণেই দেখল ট্যাক্সি ড্রাইভার বেরিয়ে এসেছে। একি? কার্লোস তো! বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। এতক্ষণ সে আছে।

কাছাকাছি হয়েই আহমদ মুসা বলল, ‘একি তুমি এতক্ষণ এখানে?’

আহমদ মুসার কথার দিকে কর্ণপাত না করে বিস্মিত কার্লোস বলল, ‘একি আপনার অবস্থা? হাত থেকে রক্ত পড়ছে, মুখ রক্তাক্ত। আমার সন্দেহই তাহলে ঠিক।’

‘কি সন্দেহ করেছিলে তুমি?’

‘ওসব কথা থাক। গাড়িতে উঠুন। আপনার আগে অন্তত ‘ফাষ্ট এইড’ প্রয়োজন।’

আহমদ মুসা গাড়িতে উঠে বসতে বসতে বলল, ‘একি, আমার ব্যাগ আমি তোমার গাড়িতে ফেলে গিয়েছিলাম?’

‘স্যার, এই ব্যাগ নিয়েই তো বিপদে পড়েছি। এই ব্যাগও আমার অপেক্ষা করার একটা কারণ।’

‘আরেকটা কারণ কি?’

‘স্যার, পৌনে এক ঘণ্টাতেও আপনাকে বের হতে না দেখে আমি অফিসে গিয়েছিলাম ব্যাগটা আপনাকে দেয়া যায় কিনা সে জন্যে। ওদের ব্যবহার সন্দেহজনক মনে হলো আমার কাছে। আমার ট্যাক্সিতে আপনি এসেছেন এই কথা বলে আপনার খোঁজ করতেই রিসেপশনিষ্ট বলল, ‘ও ভাড়া পাবে তো? যাও, ইহ জীবনে আর তাকে পাবে না, পরকালে নিও।’ বলে আমাকে বের করে দেয় অফিস থেকে। আমি বুঝতে পারলাম, কিছু একটা ঘটেছে। এই অবস্থায় আমি যেতে পারছিলাম না। অপেক্ষা করছিলাম কোন খোঁজ পাওয়া যায় কিনা। এই মাত্র ভাবছিলাম থানায় খবরটা দিয়ে আমি চলে যাব।’

‘থানায় খবর দিলে থানা কি করত?’

‘হয়তো খোঁজ নিত। কিন্তু যেহেতু প্রতিষ্ঠানটি শ্বেতাংগদের তাই তাদের কোন দোষ হতো না, দোষ হতো আপনার।’

‘তাহলে থানায় খবর দিতে কেন?’

‘নিয়ম স্যার, এ জন্যে। আইন আছে, এ ধরনের কোন বড় সন্দেহজনক কিছু দেখলে, গাড়িতে ঘটলে সংগে সংগেই থানায় জানাতে হবে।’

বলেই কার্লোস আবার জিজ্ঞেস করল, 'কি ঘটেছিল স্যার, আমি গুলীর শব্দ শুনলাম।'

আহমদ মুসা একটু ভাবল কার্লোসকে কতটুকু বলা যায় তা নিয়ে। তারপর বলল, 'বুঝলাম না, বিমান ভাড়া চাওয়ায় ওরা আমাকে সন্দেহ করল। বন্দী করল। শুনলাম, ওরা যাদের বন্দী করে তারা আর বাঁচে না। তাই প্রাণপণ চেষ্টা করে বেরিয়ে এলাম। কথায় কথায় ওদের কোন একজনের কাছে 'হোয়াইট ঈগল'-এর নাম শুনলাম।'

'হোয়াইট ঈগল?' বিস্মিত কণ্ঠ কার্লোসের।

'তুমি চেন 'হোয়াইট ঈগল'কে?

'চিনি না। তবে দু'জন প্যাসেঞ্জারের মধ্যে আলোচনায় এই নাম শুনেছিলাম। বুঝেছিলাম, কোন ভয়ংকর দল এটা।'

'কোথায় পেয়েছিলে প্যাসেঞ্জার দু'জনকে?'

'এয়ারপোর্টে। আর নামিয়ে দিয়েছিলাম কলম্বাস কমপ্লেক্সে। পথিমধ্যে শুনেছিলাম তাদের গল্প।'

কলম্বাস কমপ্লেক্সের নাম শুনে চমকে উঠল আহমদ মুসা। ব্লু বার্ড অফিসে তাকে বন্দী করা একজন রিভলবারধারীও কলম্বাস কমপ্লেক্সে হোয়াইট ঈগল-এর চীফ বস ফার্ডিন্যান্ডের অফিসের কথা বলেছে। কিন্তু তার কথায় কলম্বাস কমপ্লেক্স-এর কোথায় হোয়াইট ঈগল-এর অফিস তা জানা যায়নি। এটা আহমদ মুসার জন্যে খুব জরুরী। আহমদ মুসা প্রশ্ন করল, 'কলম্বাস কমপ্লেক্সে ওদের অফিস নাকি?'

'তা জানি না। তবে ওদের যে উঠানে নামিয়ে দিয়েছিলাম, সেখানে সাইনবোর্ড দেখেছি 'ক্যারিবিয়ান ওয়েলফেয়ার সিন্ডিকেট'-এর।'

কথা শেষ করেই কার্লোস বলল, 'আপনাকে ছোট-খাট ডাক্তার খানায় না ক্লিনিকে নিয়ে যাব?'

'না কার্লোস। আমার ব্যাগে 'ফাষ্ট এইড' এর সবকিছুই আছে, তোমার বোতলে ভাল পানিও আছে। এখন ভাল একটা জায়গা দেখে তোমার গাড়ি দাঁড় করাও।' বলল আহদ মুসা।

আহমদ মুসার মাথায় 'ফাষ্ট এইড' এর চিন্তা নয়, মাথা জুড়ে এখন তার হোয়াইট ঈগল-এর অফিস। মনে মনে বার বার আহমদ মুসা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছে। সে এখন নিশ্চিত কলম্বাস কমপ্লেক্সেই হোয়াইট ঈগল-এর অফিস এবং 'ক্যারিবিয়ান ওয়েল ফেয়ার সিন্ডিকেট'ই তার ছদ্মবেশী নাম।

মেইন রোড থেকে বাইরে একটু দূরে নির্জন এক সংরক্ষিত বাগানে গাড়ি দাঁড় করাল কার্লোস।

কপালের এবং বুড়ো আঙুলের ক্ষত পরিষ্কার করলো কার্লোস। কপাল বেশ গভীর হয়ে কেটে গেছে, কিন্তু ক্ষতটা ততটা মারাত্মক নয়। ডান হাতের বুড়ো আঙুলও অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে। বুলেট আঙুলের হাড় স্পর্শ করেনি।

ব্যান্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে কার্লোস বলল, 'আপনার অন্তত সপ্তাহ খানেক রেষ্ট নিতে হবে।'

'না কার্লোস, যে ঔষধ লাগিয়েছি দু'তিন দিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'স্যার, এখন কোথায় যাবেন?'

'সে চিন্তাই করছি।'

'স্যার, আমি থাকি বীচ এলাকায়। কাছাকাছি 'ট্যুরিষ্ট কটেজ' আছে। ভাড়া একটু বেশি হলেও আরামদায়ক এবং নিরাপদ।'

'ঠিক আছে। আবহাওয়াও ওখানকার ভাল হবে।'

দু'জনেই গাড়িতে উঠল। গাড়ি চলতে শুরু করল।

সন্ধ্যার আলো-আধারীতে আহমদ মুসা এসেছে ‘ক্যারিবিয়ান ওয়েলফেয়ার সিন্ডিকেট’-এর চত্বরে।

চত্বর থেকে যে রাস্তাটি পূর্বদিকে বেরিয়ে গেছে, সে রাস্তার উপরে বিখ্যাত ম্যাকডোনাল্ডের একটা ফাষ্ট ফুডের দোকান। সেখান থেকে ক্যারিবিয়ান ওয়েলফেয়ার সিন্ডিকেট অফিসের সিঁড়িসহ আশপাশের সবকিছুই দেখা যায়।

গত তিনদিন ধরেই আহমদ মুসা বিভিন্ন ছদ্মবেশে এখানে আসছে। অনেক তথ্যই সে যোগাড় করেছে। ফার্ডিন্যানেডর বাড়ি অফিসের দক্ষিণ পাশ ঘেঁষেই। দুয়ের মাঝে ফোল্ডিং করিডোরের একটি সংযোগ আছে। তিন দিনের চেষ্টায় ওদের লোকদের সাথে কথায় কথায় এটুকু জানতে পেরেছে যে, একজন মহিলা বন্দী আছে।

ফার্ডিন্যান্ডের বাড়ি ও অফিসের মধ্যে যে সংযোগ করিডোরের কথা শুনেছিল, তা হঠাৎ করে তার চোখেও পড়ে গেল।

আহমদ মুসা ম্যাগডোনাল্ডের বাইরের কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে এক গ্লাস জুস খাচ্ছিল। তার চোখটা ফার্ডিন্যান্ডের অফিস বিল্ডিং-এর দিকে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল তিন তলা বরাবর সেই সংযোগ করিডোর। করিডোরটা আলোকিত। আহমদ মুসা দেখল তিনজন লোক ফার্ডিন্যান্ডের বাড়ির দিক থেকে অফিস বিল্ডিং-এর দিকে যাচ্ছে। ফার্ডিন্যান্ড কি? না হলে এ করিডোর অন্যের জন্যে লাগবে মনে হয় না।

আহমদ মুসা জুস খাওয়া শেষ করে ধীরে ধীরে এগুলো ক্যারিবিয়ান ওয়েলফেয়ার সিন্ডিকেট নামধারী ‘হোয়াইট ঈগল’-এর অফিসের দিকে।

আজ আহমদ মুসার গায়ে রেড ইন্ডিয়ান যুবকের ছদ্মবেশ। হাতে একটা দুর্লভ ডিজাইনের সেতার। সেতারটা আসলে একটা মিনি আকারের হ্যান্ড মেশিনগান।

হাতের সেতারটা ঝুলাতে ঝুলাতে একেবারে স্বাভাবিকভাবে হেঁটে সিঁড়িতে উঠতে যাচ্ছিল আহমদ মুসা।

সিঁড়ির পুবপাশে সিঁড়ির সাথে লাগানো একটি কক্ষ। গেটম্যানের কক্ষ ওটা। আসলে ওটা অফিসের সিক্যুরিটি রুম। সেখানে দু'চারজন লোক সব সময়ই থাকে।

ওদের একজন ছুটে এল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা বলল, 'মিঃ ফার্ডিন্যান্ডের সাথে দেখা করতে এসেছি।'

'ঠিক আছে টেলিফোন করে দেখি।'

'দেখুন, দুই দিন আগে আমি তাঁর সাথে দেখা করে গেছি। তিনি আমার গানও শুনেছিলেন।'

আহমদ মুসার একথা সত্য। আহমদ মুসা নিজে দেখেছে, দু'দিন আগে একজন রেড ইন্ডিয়ান গায়ক ফার্ডিন্যান্ডের সাথে দেখা করে গেছে। তারও হাতে এ রকম সেতার ছিল। সেটা দেখেই আহমদ মুসা এ ছদ্মবেশ নিয়েছে।

প্রহরী লোকটি টেলিফোন করার জন্যে গেট রুমের দিকে কয়েক ধাপ এগিয়েও থেমে গেল। তারও মনে পড়ল একজন রেডইন্ডিয়ান যুবক দু'দিন আগে এসেছিল।

সে ফিরে দাঁড়াল। বলল, 'ঠিক আছে যাও।'

'আবার কেউ আটকাবে নাতো?' বলল আহমদ মুসা।

'না। ঠিক আছে, একটা পাশ নাও।'

বলে প্রহরীটি পকেট থেকে একটা গেট পাশ বের করে আহমদ মুসাকে দিল।

আহমদ মুসা সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল তর তর করে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই সোজা সামনে রিসেপশন কক্ষ। আর বামে তিন তলায় উঠার সিঁড়ি এবং ডান পাশে এক তলায় নামার সিঁড়ির মুখ। আজ এ সিঁড়ি মুখটি সে খোলা দেখল। কিন্তু গতকাল যখন উপরে উঠেছিল নিউজ পেপার হকারের ছদ্মবেশে, তখন এ সিঁড়িমুখ লোহার ডবল ফোল্ডিং দরজা দ্বারা বন্ধ দেখেছিল।

আহমদ মুসা সোজা চলে গেল রিসেপশন রুমে। চটপটে এক শ্বেতাংগ তরুণ বসে আছে রিসেপশন টেবিলে।

'আমি মিঃ ফার্ডিন্যান্ডের সাথে দেখা করব। দু'দিন আগে এসেছিলাম।' বলল আহমদ মুসা।

'তিনি আসতে বলেছিলেন?' বলল রিসেপশনিষ্ট ছেলেটি।

'বলেছিলেন। সুযোগ মত আসার কথা ছিল।'

'তাহলে বাইরে আপনি বসুন। উনি গ্রাউন্ড ফ্লোরে গেছেন।'

'গ্রাউন্ড ফ্লোরেও আপনাদের অফিস?'

'ঠিক অফিস নয়। ষ্টোর আছে, মেহমানখানা আছে?'

ষ্টোর এলাকায় মেহমানখানা! শুনে চমকে উঠল আহমদ মুসা। এই অসংগতিটা ছোট নয়। এই মেহমানখানা কি বন্দীখানা? তাহলে ফার্ডিন্যান্ড কি বন্দীখানাতেই গেছে!

'মেহমানের সাথে সাক্ষাত করতে গেছেন? তাহলে তো দেরী হবে।' আরও কিছু জানার লক্ষ্যে প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

রিসেপশনিষ্ট ছেলেটির মুখে যেন একটা রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'দেরী হতে পারে। ওঁর সাথে একজন 'গরিলা-মানুষ'কে যেতে দেখলাম।'

'গরিলা-মানুষ?'

'হ্যাঁ।'

'তাঁর কি কাজ?'

'একটাই তার কাজ বেয়াড়া মানুষকে সোজা করা।'

চমকে উঠল আহমদ মুসা। এ বন্দীখানায় কি মার্গারেট আছে?'

মনে মনে চমকে উঠলেও ঠোঁটে হাসি টেনে জিজ্ঞেস করল 'মেহমানখানায় বেয়াড়া কোত্থেকে পেলেন?'

'কি বলেন, কত রকমের মেহমান আছে। এবার জুটেছে একজন মহিলা মেহমান। কিন্তু পুরুষের বাপ। তাকেই ঠিক করার জন্যে গরিলা মানুষ কিনা জানি না।'

এ আলোচনায় রিসেপশনিষ্ট যেন আনন্দ পাচ্ছে। তার মুখে রসাত্মক হাসি। কিন্তু আহমদ মুসারও মন তখন উদ্বেগে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

'তাহলে স্যার, ওদিকে বসি।' বলে আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল।

'কিন্তু আমাকে একদিন গান শুনাতে হবে।'

'আচ্ছা।' বলে আহমদ মুসা চলে এল রিসেপশন রুম থেকে।

আহমদ মুসার মুখ শক্ত হয়ে উঠেছে। সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, তাকে গ্রাউন্ড ফ্লোরে নামতে হবে এবং তা এখনই।

আহমদ মুসা দেখল, গ্রাউন্ড ফ্লোরে নামার সিঁড়ি মুখে একজন প্রহরী। খালি হাত। কিন্তু তার পকেটে রিভলবার আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ফোল্ডিং দরজাটা আধা পরিমাণ খোলা। খোলা অংশেরই এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রহরী।

আহমদ মুসা রিসেপশন রুম থেকে বেরিয়ে দ্রুত গিয়ে দাঁড়াল প্রহরীটির কাছে। তাকে দ্রুত কণ্ঠে বলল, 'আমি ফার্ডিন্যান্ডের কাছে এসেছি। তাকে জরুরী একটা খবর পৌছাতে হবে। রিসেপশনে বলে এসেছি। আমি তার কাছে যাচ্ছি।'

বলে আহমদ মুসা দরজা পার হয়ে গেল।

প্রহরীটি দেখেছিল আহমদ মুসাকে রিসেপশন রুম থেকে বের হয়ে আসতে।

প্রহরীটি বিশ্বাস করল আহমদ মুসা রিসেপশনে বলেছে। টেলিফোনে হয়তো অনুমতিও নিয়েছে। তাছাড়া আহমদ মুসার দ্বিধাহীন কথাবার্তা ও ভেতরে প্রবেশ দেখেও মনে করল অনুমতি সে অবশ্যই পেয়েছে।

প্রহরী আহমদ মুসাকে বাধা দিল না।

আহমদ মুসা ভেতরে প্রবেশের প্রধান দু'টি বাধা বিনা বাধায় অতিক্রম করতে পারায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। গেটেই গোলা-গুলী হলে তার কাজ কঠিন হয়ে যেত।

আহমদ মুসা দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল নিচে। কিন্তু করিডোরে নেমে বিপদে পড়ে গেল আহমদ মুসা। এখন কোন দিকে যাবে সে।

সিঁড়ি থেকে নেমে ডানদিকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে বড় একটা ষ্টিলের দরজা। দেখেই বুঝল এটাই একদিন এ অফিস থেকে বাইরে বেরুবার প্রধান গেট ছিল। পরে গেটটি ষ্টিল চৌকাঠের সাথে ওয়েল্ডিং করে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং দোতলায় উঠার বাইরের সিঁড়িটা পরে তৈরি করা হয়েছে।

আহমদ মুসা পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম দিকে চেয়ে দেখল তিনদিকেই তিনটা করিডোর এগিয়ে গেছে। কোনদিকে যাবে সে?

আহমদ মুসা মুহূর্তের জন্যে চোখ বন্ধ করে অফিস বিল্ডিংটার অবয়ব সামনে নিয়ে এল। দেখল সে অফিসের বৃহত্তর অংশ সিঁড়ি থেকে পশ্চিম দিকে। সিঁড়ি থেকে পূর্ব ও উত্তর দিকে বড় জোর দু'তিনটি কক্ষ পাওয়া যাবে।

সুতরাং আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিল পশ্চিমের করিডোর ধরে এগুবার জন্যে।

আহমদ মুসা তার হাতের সেতার বন্দুকের মত ধরে বিড়ালের মত নিঃশব্দে, কিন্তু স্বাভাবিক হেঁটে সামনে এগুলো।

তিনটা কক্ষের দরজা পার হতেই সে দেখল সামনেই উত্তর-দক্ষিণ একটা করিডোর। আহমদ মুসা অনুমান করলো এই এলাকাটা অফিস বিল্ডিং-এর মাঝামাঝি স্থান হবে।

আর দু'পা এগুতেই আহমদ মুসা দু'জন প্রহরীর মুখোমুখি হয়ে গেল। তারা দক্ষিণ করিডোর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

দু'পক্ষই চমকে উঠল।

আহমদ মুসার ডান হাতের তর্জনি ছেতারের মাঝ বরাবরে গর্ত দিয়ে সাইলেন্সার লাগানো মিনি ষ্টেনগানের ট্রিগার স্পর্শ করেছে। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে সে সেতারের তার স্পর্শ করেছে। এখনি বাজানো সে শুরু করবে।

চমকে ওঠা অবস্থা দূর হওয়ার পর ষ্টেনগান ধারী প্রহরী দু'জনের একজন বলল, 'কি হে, এখানে তুমি কি করছ? এটা কি গানের জায়গা? এলে কি করে?'

'ফার্ডিন্যান্ড এখানে, তাই এখানেই দেখা করতে এলাম। কোথায় সে?'

ঠিক এই সময়েই নারী কণ্ঠের কাকুতি-মিনতি ও ক্ষীণ চিৎকার ভেসে আসতে লাগল।

আহমদ মুসার কথা শুনে ওরা কপাল কুঞ্চিত করেছিল। তাদের ষ্টেনগানের নল উপরে তুলেছিল আহমদ মুসার লক্ষ্যে। তাদের একজন কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল।

কিন্তু আহমদ মুসা তাদেরকে সময় দিল না।

আহমদ মুসার তর্জনি অস্থিরভাবে চেপে ধরল ট্রিগারে। নিঃশব্দে এক ঝাক গুলী বেরিয়ে গেল সেতার রূপী মিনি ষ্টেনগান থেকে।

শব্দ করারও সময় পেল না প্রহরী দু'জন। ঝাঁঝরা দেহ নিয়ে ঢলে পড়ে গেল করিডোরের উপর।

নারী কণ্ঠের চিৎকার কোন দিক থেকে আসছে তা ঠিক করার জন্যে একটু উৎকর্ণ হয়েই আহমদ মুসা ছুটল দক্ষিণ দিকে। তার আগে দু'জনের দু'টি ষ্টেনগান আহমদ মুসা কাঁধে তুলে নিয়েছে।

দক্ষিণ করিডোরের পশ্চিম পাশে প্রথম ঘরটি থেকেই আসছিল শব্দ।

আহমদ মুসা দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

এখানে কম্পুটারাইজড এ্যালফাবেটিক্যাল লক।

খুশী হলো আহমদ মুসা। নিশ্চয় লক খোলার কোডও ঐ একই হবে।

আহমদ মুসা ডান হাতে ষ্টেনগান বাগিয়ে বাম হাতে 'EGLE' কম্পিউট করল।

ঠিক এই সময়ই মার্গারেট চিৎকার করছিল, 'আল্লাহ আমাকে রক্ষা কর,' আল্লাহ আমাকে রক্ষা কর' বলে।

আর তার জবাবে আরেকটি লোক হো হো করে হেসে উঠল, 'তোমার আল্লাহ যেখানেই থাক, এখানে আসতে পারবে না। এখনও বল, এশীয় লোকটি কোথায়, তার কি পরিচয়, তাহলে তোমাকে ছেড়ে দিতে বলি।'

'না আমি বলব না। কিছুতেই বলব না। আমাকে মেরে ফেল।' চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলল মার্গারেট।

'না, সুন্দরী, তোমাকে মারলে তো তুমি বেঁচে যাবে। তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেই এভাবে তোমাকে প্রতিদিন মারতে চাই।'

কথা শেষ করেই চিৎকার করে উঠল লোকটি, ‘শয়তানি শুনবে না। তোমার কাজ শুরু কর।’

সংগে সংগেই ‘আল্লাহ তুমি কোথায়’ বলে বুক ফাটা চিৎকার করে উঠল মার্গারেট।

আহমদ মুসার ‘EGLE’ কম্পিউট শেষ হয়েছে। শেষ করেই সে রিভলবার তুলে নিয়েছে বাম হাতে। আর ডান হাতে ষ্টেনগান।

‘EGLE’ কম্পিউট শেষ হবার সাথে সাথে চোখের পলকে দরজার পাল্লা দেয়ালে ঢুকে গেল।

আহমদ মুসার চোখ ছুটে গেল ঘরের ভেতর। প্রায় নগ্ন মার্গারেট মাটিতে পড়ে আছে। দৈত্যাকার একজন লোক মার্গারেটের বুকে পা দিয়ে তাকে চেপে রেখে কাপড় খুলছে। আর পাশেই দাঁড়িয়ে আরেকজন শ্বেতাংগ আমেরিকান।

ষ্টেনগানের ট্রিগারে হাত ছিলই আহমদ মুসার। তর্জনি চাপল ট্রিগারে। দৈত্যাকার লোকটিকে ঝাঁঝরা করল এক ঝাঁক বুলেট গিয়ে।

আহমদ মুসার এইভাবে উপস্থিতি এবং দৈত্যসদৃশ তার পাহলোয়ানের উপর ব্রাশ ফায়ারে মুহূর্তের জন্যে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল ফার্ডিন্যান্ড। সম্বিত ফিরে পেয়ে যখন সে পকেট থেকে রিভলবার বের করল, তখন তা দিয়ে আর কোন কাজ হলো না। আহমদ মুসার বাম হাতের রিভলবারের একটা গুলী তার রিভলবার ধরা হাতকে চৌচির করে দিয়ে গেল। তার হাত থেকে বেশ দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ল রিভলবার।

‘বাঁচতে চাইলে দু’হাত তুলে দেয়ালের দিক মুখ করে দাঁড়াও।’ নির্দেশ দিল ফার্ডিন্যান্ডকে আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা প্রথমে এক ঝলক মাত্র তাকিয়েছিল মার্গারেটের দিকে। তারপর তার দৃষ্টি ভিন্ন দিকে সরিয়ে রেখেছিল।

ফার্ডিন্যান্ড গিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে আহমদ মুসা ষ্টেনগানগুলো রেখে নিজের জ্যাকেট খুলে মার্গারেটকে দিয়ে ওদিকে না তাকিয়েই তা ছুড়ে দিল মার্গারেটকে। বলল, ‘পরে নাও।’

মার্গারেটকে ধরে আনার সময় তার গায়ে ছিল নাইট গাউন। সেটাই আজ পর্যন্ত তার পরেনে ছিল। কিন্তু সেটা আজ শত ছিন্ন হয়েছে ওদের হাতে। মার্গারেট জ্যাকেট কুড়িয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি পরে নিল।

তারপর আহমদ মুসা এগুলো ফার্ডিন্যান্ডের দিকে। পায়ে একটি লাথি মেরে ফার্ডিন্যান্ডকে ফেলে দিল মাটিতে। বলল, 'প্যান্টটা খুলে দাও ফার্ডিন্যান্ড।'

বলেই মার্গারেটকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'তুমি ভিন্ন দিকে ঘুরে দাঁড়াও মার্গারেট।'

আন্ডার ওয়্যার পরা ফার্ডিন্যান্ড সংগে সংগেই প্যান্ট খুলে হুকুম তামিল করেছে।

আহমদ মুসা প্যান্টটা মার্গারেটের দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল, 'তাড়াতাড়ি পরে নাও।'

আহমদ মুসা তার সেতার ষ্টেনগানটি কাঁধে ঝুলিয়ে দু'হাতে দুই ষ্টেনগান নিয়ে বলল, 'চল মার্গারেট।'

দরজায় এসে আহমদ মুসা ফার্ডিন্যান্ডকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'কাপুরুষ ফার্ডিন্যান্ড, এশীয়টির গায়ে হাত দিতে না পেরে একজন মহিলাকে ধরে আনার বীরত্ব দেখিয়েছিলে। তোমাকে হত্যা করলাম না। আরও প্রায়শ্চিত্য করার জন্যে বাঁচিয়ে রাখলাম।'

বলে আহমদ মুসা বাইরে থেকে দরজার ছিটকিনি এঁটে বন্ধ করে দিল। ভিন্ন কোডে কম্পুটার লক বন্ধ করা যাবে কিনা এই ভেবে সেটা ব্যবহার করল না আহমদ মুসা।

সিঁড়ির কাছাকাছি এসে আহমদ মুসা মার্গারেটকে বলল, 'অফিসের সবার জানার ও প্রস্তুত হওয়ার আগেই আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে। গেটে মাত্র ছয় সাত জন প্রহরী আছে, অসুবিধা হবে না। তুমি আমার পেছনে থাকবে সব সময়। ভয় নেই।'

মার্গারেট কোন কথা বলল না। তার দু'চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় গড়িয়ে পড়েছে অশ্রু। কিন্তু মন তার বলল, আপনার পাশে থেকে এখন আমার মৃত্যু, আমার সবচেয়ে বড় কাম্য বস্তু।

সিঁড়ির গোড়ায় পৌছে আহমদ মুসা দেখল, সিঁড়ি মুখের দরজার বাইরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে প্রহরী, তার হাতে ষ্টেনগান ঝুলছে।

আহমদ মুসা দ্রুত উঠতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। পায়েল শব্দে ঘুরে দাঁড়াল প্রহরী গেটম্যান। আহমদ মুসাকে ঐভাবে দেখে তার চক্ষু চড়ক গাছ। আহমদ মুসার বাম হাতের ষ্টেনগান এক পশলা গুলী ছাড়ল। গেটের উপরই ঢলে পড়ল প্রহরীর দেহ।

একজনকে মারার জন্যে এত গুলীর প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আহমদ মুসা তা ছুড়ল এই কারণে যে, ব্রাশ ফায়ারের শব্দ শুনে নিচের গেট রুম থেকে সবাই ছুটে আসবে উপরে। তাদের সবাইকে আহমদ মুসা এক সাথে পেতে চায়।

আহমদ মুসা দু'তলার সিঁড়ি মুখ পার হয়েই দেখল, রিসেপশন রুম থেকে দু'জন বেরিয়ে এসেছে।

আহমদ মুসার ডান হাতের ষ্টেনগান আবার এক ঝাঁক গুলী বৃষ্টি করল রিসেপশন রুম লক্ষ্যে।

গুলী করেই আহমদ মুসা দু'ধাপ এগিয়ে অফিস থেকে নিচে লনে নামার সিঁড়ির দিকে তাকাল। দেখল ছয় সাত জন ছুটে আসছে ষ্টেনগান বাগিয়ে উপরের দিকে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে।

আহমদ মুসা আরও দু'ধাপ এগুলো সামনে। ওরাও তখন দেখতে পেয়েছে রেডইন্ডিয়ান যুবকবেশী আহমদ মুসাকে।

ওরাও ষ্টেনগান ঘুরাচ্ছে আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু ওদের লক্ষ্যে উদ্যত আহমদ মুসার দু'তর্জনি ছিল দু'ষ্টেনগানের ট্রিগারে প্রস্তুত। তার দুই হাতের দু ষ্টেনগান এক সাথে গুলী বৃষ্টি করল ওদের উপর। ওরা সাতজনই ঢলে পড়ল সিঁড়ির উপর।

গুলী বৃষ্টি করতে করতেই 'মার্গারেট এসো' বলে ছুটল আহমদ মুসা সিঁড়ি দিয়ে নিচের দিকে।

ডা: মার্গারেট নির্দেশ মত আহমদ মুসার পেছনেই দাঁড়িয়েছিল। সেও ছুটল আহমদ মুসার পেছনে পেছনে তার ছায়ার মত।

আহমদ মুসা প্রায় সিঁড়ির গোড়ায় নেমে এসেছে। এমন সময় সে দেখল সিঁড়ির গোড়ায় গড়িয়ে পড়া রক্তাক্ত একজন রিভলবার তাক করেছে আহমদ মুসার লক্ষ্যে।

আহমদ মুসা দ্রুত মাথা নিচু করে ডান পাশে সরে গেল। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। রিভলবারের নিক্ষিপ্ত গুলীটা এসে বিদ্ধ হলো আহমদ মুসার বাম কাঁধ সংলগ্ন বাহুর পেশিতে।

আহমদ মুসার বাম হাত থেকে ষ্টেনগান পড়ে গেল।

আহমদ মুসা তার ডান হাতের ষ্টেনগানটা ঘুরিয়ে লোকটির দিকে গুলী করে আবার ছুটল লন ধরে। তার পেছনে পেছনে মার্গারেট। আহমদ মুসার আহত হাত থেকে পড়ে যাওয়া ষ্টেনগানটা তুলে নিয়েছিল ডা: মার্গারেট।

আহমদ মুসার গুলী বিদ্ধ হওয়া দেখে আতংকিত হয়ে পড়েছিল মার্গারেট। কিন্তু আতংকের মধ্যেও সে আশ্বস্ত হলো এই ভেবে যে, গুলীটা বিপজ্জনক জায়গায় লাগেনি।

আহমদ মুসা লন থেকে রাস্তায় উঠে পেছনে তাকাল। দেখল, পেছন থেকে এখনও কেউ তাড়া করে আসেনি।

আহমদ মুসা রাস্তার দিকে তাকাল। দেখল, রাস্তা ফাঁকা। আতংকিত মানুষ বিভিন্ন দিকে সরে গেছে।

আবার দু'জন ছুটল রাস্তা ধরে।

এ সময় আহমদ মুসার মনে হলো কার্লোসের কথা। কার্লোস গাড়ি নিয়ে থাকলে কতই না ভালো হতো। কিন্তু কার্লোসকে গতকাল হঠাৎ করে যেতে হয়েছে প্রায় সোয়া শ' কিলোমিটার পশ্চিমে আর্থার টাউনে। গতকালই ফেরার কথা ছিল। কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ায় আসতে পারেনি।

একটা সুদৃশ্য নতুন টয়োটা কার আসছিল সামনের দিক থেকে।

আহমদ মুসার মাথায় একটা চিন্তা এসে গেল। সংগে সংগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল সে।

রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ষ্টেনগান উচিয়ে গাড়িটা থামিয়ে দিল সে।

গাড়ি থামার সংগে সংগেই আহমদ মুসা গাড়ির ড্রাইভিং সিটের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ড্রাইভিং সিটে একজন তরুণী।

আহমদ মুসা তার দিকে ষ্টেনগান তাক করে বলল, 'দরজা খুলে দাও, না হলে ভেঙ্গে ফেলব।'

সংগে সংগে তরুণীটি গাড়ির দরজা খুলে দিল। তরুণীটির চোখে-মুখে বিস্ময় এবং ভয় দুইই।

আহমদ মুসা খোলা দরজা পথে পেছনের দরজা আনলক করে দরজাটা খুলে দিয়ে বলল, 'ডা: মার্গারেট তাড়াতাড়ি উঠে বস।'

বলার সাথে সাথেই মার্গারেট গাড়িতে উঠে বসল।

আহমদ মুসা তরুণীটির দিকে ষ্টেনগান তাক করে বলল, 'পাশের সিটে গিয়ে বসুন।'

ভয়ে পাংশু হয়ে উঠেছিল তরুণীটির মুখ। বিনাবাক্যব্যয়ে মেয়েটি ড্রাইভিং সিট ছেড়ে পাশের সিটে সরে গেল।

আহমদ মুসা ড্রাইভিং সিটে উঠে বসতে যাচ্ছে এ সময় লনের দিক থেকে গোলমাল ও ষ্টেনগানের শব্দ ভেসে এল। দু'একটা গুলী এসে আশপাশে পড়ল।

আহমদ মুসা গাড়িতে উঠে চোখের পলকে গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটল সামনের দিকে।

গাড়ির তরুণীটি শিলা সুসান। ফার্ডিন্যান্ডের মেয়ে। একজন বান্ধবীকে বিদায় দিয়ে সে এয়ারপোর্ট থেকে ফিরছিল।

প্রথমে সে আহমদ মুসাদেরকে হাইজ্যাকার, কিডন্যাপারে ভেবেছিল। কিন্তু আহমদ মুসার গুলী বিদ্ধ বাম বাহু থেকে অব্যাহত রক্তপাত এবং মার্গারেটের বিধ্বস্ত ও রক্তাক্ত অবস্থা দেখে বুঝল কোন বিপদ ও সংঘাত থেকে এরা ফিরছে। পরে যখন হোয়াইট ঈগল-এর অফিসের দিক থেকে হৈ চৈ ও ষ্টেনগানের গুলীর ঝাঁক ছুটে এল, তখন বুঝতে পারল এরা হোয়াইট ঈগল-এর অফিস থেকে মারামারি করে ফিরছে এবং তার গাড়ির সাহায্য নিয়ে এরা পালাবার চেষ্টা করছে।

এসব চিন্তা করার পর শিলা সুসানের ভয় অনেকটা কেটে গেল। তার জায়গায় তার মনে প্রশ্ন জাগল, এরা কারা? মেয়েটির পরনে অদ্ভুত পোশাক কেন? বুঝাই যাচ্ছে তার গায়ের জ্যাকেটটি তার নয়, কোন ছেলের। আর তার পরনের একদম বেঢম প্যান্টটি কোন পুরুষের। কোন মেয়ের এমন পোশাক জীবনে সে এই প্রথম দেখল।

বেশ কিছুটা পথ চলে এসেছে।

আহমদ মুসা পাশের তরুণীটির দিকে মুহূর্তের জন্যে চোখ তুলে বলল, 'আমাদের এই ব্যবহার ও আপনার অসুবিধা হওয়ার জন্যে আমি দু:খিত।'

আহমদ মুসার এ কথায় শিলা সুসান আহমদ মুসার দিকে তাকাল। আহমদ মুসার নরম ও ভদ্র সুর শুনে গম্ভীরভাবে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। বলল, 'আপনারা কারা?'

'হঠাৎ করে এ প্রশ্নের জবাব দেয়া মুস্কিল। এটাই এখন আমাদের বড় পরিচয় যে আমরা জুলুমের শিকার।'

'জালেম কে? মনে হচ্ছে আপনারা লড়াই করে এসেছেন।'

'জালেমদের পরিচয়ও হঠাৎ দেয়া মুস্কিল। লড়াই করতে আমরা যাইনি। ডা: মার্গারেট বন্দী ছিলেন, ওকে উদ্ধার করতে যেয়ে লড়াই হয়েছে।'

আহমদ মুসা পরিচয় না দিলেও শিলা সুসান বুঝল হোয়াইট ঈগলকেই জালেম বলা হচ্ছে। তাহলে এ মেয়েটি 'হোয়াইট ঈগল'-এর কাছে বন্দী ছিল। কেন বন্দী ছিল? বিষয়টা তার মনে কষ্ট দিলেও সে জানে 'হোয়াইট ঈগল' শ্বেতাংগ স্বার্থের একটি সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু মেয়েটি তো নিরেট শ্বেতাংগ, তাহলে এভাবে বন্দী হলো কেন? আর একজন অশ্বেতাংগ তাকে মুক্ত করে নিয়ে যাচ্ছে কেন? এসব প্রশ্ন মাথায় নিয়ে শিলা সুসান প্রশ্ন করল, 'কোথায় বাড়ি আপনাদের?'

'ডা: মার্গারেটের বাড়ি গ্র্যান্ড টার্কস-এ।'

গ্রান্ডস টার্কস-এর নাম শুনে চমকে উঠলে শিলা সুসান। তার আব্বাদের আলোচনায় সে জেনেছে হোয়াইট ঈগলের কয়েকটা অভিযান সেখানে মার খেয়েছে। হোয়াইট ঈগল-এর দেড়শ' থেকে দু'শ লোক সেখানে নিহত হয়েছে।

এসব ঘটনার কার্যকরণ থেকেই কি মেয়েটিকে বন্দী করা হয়েছিল? আর ড্রাইভ করছে এ লোকটি কে? ডা: মার্গারেটের বাড়ি বলল গ্রান্ড টার্কস-এ, কিন্তু এঁর বাড়ি কোথায় তা তো বলল না! এ তো অশ্বেতাংগ। এশিয়ান কি? এ প্রশ্ন মনে জাগতেই তার পিতাদের আলোচনা থেকে শোনা জনৈক এশিয়ানের কথা তার মনে পড়ল। তার পিতাদের সেই এশিয়ানই নাকি 'হোয়াইট ঈগল' এর সব বিপর্যয়ের হোতা। এই এশিয়ানই কি সেই এশিয়ান?

এই শেষ প্রশ্নটা মনে উদয় হতেই একটা ভয়ার্ত শিহরণ এসে তাকে ঘিরে ধরল। সে নিশ্চিত হলো, এ সেই এশিয়ানই হবে। হোয়াইট ঈগল ঘাটি থেকে একজন বন্দী উদ্ধার এইভাবে আর কে করতে পারে!

হঠাৎ আহমদ মুসা তার গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল। তরুণীটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ম্যাডাম, ওরা পিছু নিয়েছে।'

এ খবরে শিলা সুসান আনন্দিত হবার বদলে উৎকণ্ঠিত হলো। সানসালভাদরের এ কলম্বাস দ্বীপটা খুব বড় নয়। লুকানোর জায়গা তেমন নেই। চারদিক থেকে হোয়াইট ঈগলরা আসলে এ গাড়ি পালাবার জায়গা পাবে না। তার গাড়ি ওখানকার সবাই চেনে। সুতরাং নম্বার এতক্ষণ তারা পুলিশকে বা হোয়াইট ঈগলকে দিয়ে দিয়েছে। সুতরাং যে দিক দিয়েই পালাবার চেষ্টা করা হোক, তাদের খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে না। কিন্তু সুসানের মনে এই বিষয়টাই অস্বস্তির সৃষ্টি করেছে। তার মন বলছে, এই মেয়েটির হোয়াইট ঈগল-এর বন্দীখানায় ফেরা আর ঠিক নয়।

'কয়টি গাড়ি পিছু নিয়েছে?' বলল শিলা সুসান।

'একটা গাড়ি দেখতে পাচ্ছি। মনে হয় একটাই।' আহমদ মুসা বলল।

'তাহলে আরও গাড়ি অন্য দিক দিয়ে আসছে।'

'কি করে বুঝলেন?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা শিলা সুসানের দিকে তাকিয়ে।

'যেখান থেকে আপনারা এলেন, সেটা আমাদের বাড়ির পাশেই। ওদের জানি আমি। পিছু যখন নিতে পেরেছে, তখন একটি নয় অনেকগুলো গাড়ি পিছু নেবার কথা। তাই আমার মনে হচ্ছে, একটি যখন পেছন দিক থেকে পিছু নিয়েছে

তখন আরও গাড়ি অন্যদিক দিয়ে আসছে। কলম্বাস কমপ্লেক্স একটা গ্রন্থি। ওখান থেকে অনেক রাস্তা বিভিন্ন দিকে গেছে।’

‘তাহলে এটা আপনার জন্যে খুশীর, আর আমাদের জন্যে খুব দু:খের খবর।’ বলল কথাগুলো আহমদ মুসা হাসি মুখে।

তারপর আহমদ মুসা তার গাড়ির গতি স্লো করে দিল।

গাড়ি তখন সবে বন্দর শহর থেকে বেরিয়ে এসেছে। চলছিল তখন এক এবড়ো-থেবড়ো জংলা এলাকার মধ্যে দিয়ে।

বিস্মিত হলো শিলা সুসান। বলল, ‘কি ব্যাপার গাড়ি থামিয়ে দিলেন যে?’

‘সব গাড়ির মাঝে পড়ে লড়াই করার চেয়ে শুরুতে একটার সাথে লড়াই করে দেখি।’ বলল আহমদ মুসা নির্বিকার কণ্ঠে। তার ঠোঁটে হাসি।

আরও বিস্মিত হলো শিলা সুসান আহমদ মুসার এই হাসি দেখে। এমন বিপদে পড়ে কেউ হাসতে পারে জীবনে সে এই প্রথম দেখল। পাগল হয়ে গেল নাকি লোকটা বিপদে পড়ে? দ্রুত কণ্ঠে শিলা সুসান বলল, ‘দেখুন আমার খুশী-অখুশী আমার ব্যাপার। কিন্তু আমি চাই না এই মেয়েটি আবার ওদের হাতে বন্দী হোক।’

আহমদ মুসা গভীর দৃষ্টিতে তাকাল শিলা সুসানের দিকে। বলল, ‘ধন্যবাদ, তাহলে কি আমি ডাঃ মার্গারেটকে আপনার হেফাজতে দিতে পারি? আপনি তাকে নিরাপদে বাড়ি পৌছানোর ব্যবস্থা করবেন।’

‘হ্যাঁ পারেন।’ বলল দৃঢ় কণ্ঠে শিলা সুসান।

‘তাহলে এখনি আপনি মার্গারেটকে নিয়ে পাশের ঝোপে নেমে যান। একটু পর তাকে নিরাপদ কোথাও পৌছানোর ব্যবস্থা করবেন।’

‘আর আপনি?’

‘পেছনে মানে উত্তর দিকে চেয়ে দেখুন, একটি নয় দু’টি গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ওরা অপেক্ষা করছে সামনের গাড়ির। দেখুন দক্ষিণ দিক থেকে চারটা হেডলাইট এদিকে এগিয়ে আসছে। আর পূর্ব দিক থেকে যে হেড লাইট এগিয়ে আসতে দেখছি, ওটাও ওদেরই গাড়ি মনে করছি। সবারই লক্ষ্য এই গাড়ি। আমার মনে হচ্ছে, আপনার গাড়ির কোথাও ট্রান্সমিটার লাগানো আছে।

যে ট্রান্সমিটারের মেসেজ অনুসরণ করে ওরা নিখুঁতভাবে ঘিরে ফেলতে আসছে এ গাড়িকে। আপনারা এখানে নামুন। আমি গাড়ি নিয়ে চলে যাই। ওদের লক্ষ্য আমার দিকে চলে যাবে। পরে আপনি ওকে নিয়ে সরে পড়বেন।'

'কিন্তু আপনার কি হবে?' বলল ভারী কণ্ঠে ডাঃ মার্গারেট।

'আমি ওদের ফাঁদ থেকে বেরুতে পারলে বেঁচে যাব।'

'বেরুতে না পারলে?' বলল শিলা সুসান।

'বেরুতে না পারলে ধরা পড়ব। তাতে অন্তত একজন রক্ষা পাবে। আপনিও জানেন মার্গারেট ধরা পড়া ঠিক নয়।'

বলে আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে বেরিয়ে ওপাশে গিয়ে শিলা সুসান ও মার্গারেটের দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'তাড়াতাড়ি নেমে পড়–ন।'

'আপনাকে এভাবে ফেলে আমি যাব না।' বলে মার্গারেট ফুফিয়ে কেঁদে উঠল।

আহমদ মুসা মার্গারেটকে লক্ষ্য করে বলল, 'মার্গারেট এটা আমার নির্দেশ। নেমে এসো।'

কাঁদতে কাঁদতে মার্গারেট নেমে এল গাড়ি থেকে।

গাড়ি থেকে নেমে এসেছে শিলা সুসানও। অনেক বিস্ময়, অনেক প্রশ্নের ভীড়ে সে নির্বাক। তার সামনের এশীয়টিকে মনে হচ্ছে বিশ্ববিখ্যাত কোন সিনেমার নায়ক। আর তার সামনে নায়ক-নায়িকার মধ্যে অকল্পনীয় এক ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে।

আহমদ মুসা গাড়ির দুই দরজা বন্ধ করে দিয়ে পকেট থেকে একটা ইনভেলাপ বের করে শিলা সুসানের হাতে তুল দিয়ে বলল, 'এতে কিছু ডলার আছে। ওঁর প্রয়োজন হতে পারে।'

একটু দম নিয়েই আহমদ মুসা বলল আবার সুসানকে, 'আপনার নাম জানতে পারি এবং ঠিকানা?'

'আমি শিলা সুসান। আমার টেলিফোন 'নব্বই হাজার নয়'।

'ধন্যবাদ' বলে আহমদ মুসা মার্গারেটের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখা হবে।'

আহমদ মুসা গাড়িতে উঠে তীব্র বেগে গাড়ি ছাড়ল সামনের দিকে।

আহমদ মুসার গাড়ি ষ্টার্ট দেবার সঙ্গে সঙ্গে পেছনের গাড়ি দু'টিও ষ্টার্ট নিল।

শিলা সুসান ডাঃ মার্গারেটকে টেনে নিয়ে একটা গাছের আড়ালে গিয়ে বসল। সামনে ঝোপ থাকায় রাস্তা থেকে তাদের দেখা যাবে না। কিন্তু তারা উত্তর-দক্ষিণে বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে।

আহমদ মুসার গাড়িকে অনুসরণ করে পেছনের গাড়িটা শিলা সুসানদের পাশ দিয়ে ছুটে গেল সামনে।

আহমদ মুসার সামনে থেকে যে গাড়ি দু'টি আসছিল, আহমদ মুসার গাড়িকে তীব্র গতিতে ছুটতে দেখে তা থেমে গেছে। তাদের চারটি হেড লাইট পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ তারা আহমদ মুসার চারদিক থেকে ঘিরে ফেলার অপেক্ষা করছে।

পূর্ব দিকে যে গাড়িটা আসছিল, সেটাও গতি পরিবর্তন করে ছুটছে আহমদ মুসার গাড়ির দিকে।

আর পেছন থেকে দু'টি গাড়ি।

আহমদ মুসার গাড়ির রিয়ার লাইট জ্বালানো নেই। মাঝে মাঝে তার গাড়ির হেড লাইটের আলো দেখা যাওয়ায় বুঝা যাচ্ছিল তার গাড়ির লোকেশান।

কিন্তু আহমদ মুসার উপর সামনের দু'টি গাড়ির হেড লাইটের আলো পড়ার পর তার গাড়ির অবয়ব পরিষ্কার হয়ে উঠল

আহমদ মুসার গাড়ি এগুচ্ছে ঐ দু'গাড়ির দিকে পাগলের মত।

প্রায় মুখোমুখি হয়ে পড়েছে আহমদ মুসার গাড়ি এবং ঐ দু'গাড়ি।

ডাঃ মার্গারেটের উদ্বেগ ও আর্তকে তখন শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। আর শিলা সুসানের চোখে-মুখে অবাক বিস্ময়।

এ সময় ঐ গাড়িগুলোর দিক থেকে ব্রাশ ফায়ারের আওয়াজ ভেসে এল। এক সাথে দু'টি ষ্টেনগানের।

ডাঃ মার্গারেট এবং শিলা সুসানের বিস্ফোরিত চোখ সেদিকে চেয়ে আছে। দু'জনের চোখেই প্রশ্ন, গুলী কোন গাড়ি থেকে হলো। সব গাড়ীর হেড

লাইট তখন নিভানো। সব একাকার হয়ে যাওয়ায় কিছুই বুঝা যাচ্ছে না সেখানকার অবস্থা।

হঠাৎ সেখানে দু'টি বিস্ফোরণের শব্দ এবং পরক্ষণেই সেখানে দেখা গেল আগুনের কুন্ডলী।

ডাঃ মার্গারেট আর্তনাদ করে শিলা সুসানের একটা হাত চেপে ধরল। শিলা সুসানেরও দু'টি উদ্বিগ্ন চোখ সেদিকে নিবদ্ধ। বলল, 'ডাঃ মার্গারেট দেখেছেন, আগুনের আলোয় একটা গাড়িকে সচল এবং দক্ষিণ দিকে যেতে দেখা গেল।'

'কিন্তু গাড়িটি কার, কোন পক্ষের কেমন করে বলা যাবে?' ভাঙা কণ্ঠে বলল ডাঃ মার্গারেট।

'তা বলা মুস্কিল।' বলল শিলা সুসান হতাশভাবে।

দেখা গেল উত্তর দিকে যাওয়া ও পুবদিক থেকে আসা গাড়ি তিনটিও তাদের সব লাইট নিভিয়ে দিয়েছে। লাইট নিভিয়ে তারা এগুচ্ছে। সুতরাং ওদিকের কোন কিছুই এখন আর বোঝা যাচ্ছে না।

'ডাঃ মার্গারেট চলুন, আর অপেক্ষা করা কি হবে না। অনেকখানি হাঁটতে হবে আমাদের।' বলল শিলা সুসান।

'কিন্তু ওঁর কোন খবর?' সেই ভাঙ্গা কান্না ভেজা কণ্ঠে বলল ডাঃ মার্গারেট।

'ঘটনাস্থলে যাওয়া কি সম্ভব আমাদের?' বলল শিলা সুসান।

'তা সম্ভব নয়, কিন্তু......।' কথা শেষ করতে পারলো না ডাঃ মার্গারেট। কান্নায় বুজে গেল তার কথা। একটা কথা বার বারই তার বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে, সে জীবন বিপন্ন করে আমাকে উদ্ধার করল, আমি তো ওঁর বিপদে কিছুই করতে পারছি না।

'কিন্তু কি ডাঃ মার্গারেট?'

'অতবড় একজন মানুষ কি অসহায়ভাবে শেষ হয়ে যাবে?' বলতে বলতে আবার কেঁদে ফেলল ডাঃ মার্গারেট।

শিলা সুসান ডাঃ মার্গারেটের পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, 'ওঁর বিপদ হয়েছে তা আমরা জানি না, বিপদ হয়নি তাও আমরা জানি না। তাঁর উপর বড় কিছু ঘটেছে আমরা বলতে পারছি না, ঘটেনি তাও বলতে পারছি না। সুতরাং আসুন সব ব্যাপার ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দেই। তাঁকে যতটুকু আমি দেখেছি, তাতে তিনি পরোপকারী এবং সুবিবেচক। ঈশ্বর এমন লোকদের সাহায্য করেন।'

ডাঃ মার্গারেট চোখ মুছে বলল, 'আপনার কথা সত্য হোক।'

'আসুন, চলি।' বলে হাঁটতে শুরু করল শিলা সুসান।

ডাঃ মার্গারেটও হাঁটতে শুরু করেছে।

হাঁটতে গিয়ে পিঠে কিছু চেপে আছে মনে হলো ডাঃ মার্গারেটের। না শুধু পিঠে কেন? কাঁধ থেকে পিঠ পর্যন্ত। হাত দিয়ে দেখল আহমদ মুসার ব্যাগ।

চমকে উঠল ডাঃ মার্গারেট। কখন দিল আহমদ মুসা এ ব্যাগ তাকে! নিশ্চয় যাবার সময় কথা বলার ফাঁকে সে ব্যাগটি মার্গারেটের পিঠে ঝুলিয়ে দিয়েছে। মনের অবস্থার কারণে সে খেয়াল করেনি।

ব্যাগটা তার কাছে আসায় একটা অশুভ চিন্তায় মনটা কেঁপে উঠল মার্গারেটের। সব সময় এ ব্যাগটি আহমদ মুসার কাছে থাকে। এ ব্যাগটি মার্গারেটের কাছে রেখে যাবার অর্থ কি এটাই যে আহমদ মুসা নিজের ব্যাপারে খুবই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল! অশুভ চিন্তায় আবার কেঁপে উঠল মার্গারেটের মন।

দু'জন পাশাপাশি চলছে।

হাঁটতে হাঁটতে শিলা সুসান বলল, 'তিনি অন্যের ব্যাপারে যত সতর্ক দেখলাম, এমন লোক নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে অবশ্যই সতর্ক হবেন। তিনি তো অবশ্যই সাধারণ কেউ নন।'

হাঁটতে শুরু করে ডাঃ মার্গারেটের মনে নতুন চিন্তার উদয় হয়েছিল, 'কোথায় যাচ্ছে সে? মেয়েটাকে কিছুই জিজ্ঞেস করা হয়নি।'

শিলা সুসানের কথা শেষ হলে ডাঃ মার্গারেট বলল, 'মিস সুসান, উনি মনে করেন ওঁর জীবনটা পরের জন্যে। তাই নিজের ব্যাপারে খুব একটা চিন্তা করেন না।' ভারী গলায় কথা শেষ করেই একটা ঢোক গিলে ডাঃ মার্গারেট আবার বলল, 'আমরা কতদূরে কোথায় যাচ্ছি মিস সুসান?'

শিলা সুসান সঙ্গে সঙ্গেই বলল, 'ঠিক বিষয়টা আপনাকে বলা হয়নি।' বলে একটু থেমে আবার সে শুরু করল। বলল, 'যেখান থেকে আপনারা গাড়িতে চড়েছেন, তার কয়েক গজ সামনেই আমার বাড়ি। আমার বাড়িতে আপনাকে নিচ্ছি না। অসুবিধার কথা আমি পরে বলব। আমরা যাচ্ছি আমার খালার বাড়িতে। খালা ও এক খালাতো বোন ছাড়া বাড়িতে এমন কেউ নেই। সেখানে আপনি ভাল থাকবেন এবং নিরাপদে থাকবেন।'

'সত্যি লজ্জা করছে এই পোশাকে।' বলল ডাঃ মার্গারেট।

'না, এই পোশাকে যাবেন কেন? সামনেই মার্কেট আছে কাপড় কিনে নেব। উনি তো টাকা দিয়েই গেছেন।'

বলে থামল। কিন্তু থেমেই আবার বলল, 'সত্যি উনি বোধ হয় সবজান্তা।' আমার পকেটের খবর পেয়েই বোধ হয় উনি তার মানিব্যাগটা দিয়ে গেছেন। সত্যি এমন কোনদিন হয়নি। বিমান বন্দরে যাবার সময় আমার পার্স নিতে আমি ভুলে গেছি। আমার কাছে এখন একটা পয়সাও নেই।'

'সব জান্তা উনি অবশ্যই নন। কিন্তু সব দিকে নজর তাঁর থাকে। বিশেষ করে অন্যের অসুবিধা দূর করার দিকে।' ভারি কণ্ঠস্বর ডাঃ মার্গারেটের।

'ডাঃ মার্গারেট, ওঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যেও অশরীরী মনে হয় কিছু আছে। ক'মিনিটের দেখা ওঁর সাথে। কিন্তু মনে হচ্ছে জানেন, উনি যেন পর কেউ নন। উনি যখন আপনাকে আমার হেফাজতে দিতে চাইলেন তখন আমার কি মনে হয়েছিল জানেন, আমার ঘনিষ্ঠ কেউ যেন আমাকে কথাটা বলছেন যা আমি অস্বীকার করতে পারি না। আমি অবাক হয়েছি দেখে, ওঁর গুলীবিদ্ধ বাহু থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। কিন্তু কোন সময়ই তাকে একবারও ওদিকে তাকাতে পর্যন্ত দেখিনি।'

'এটাই ওঁর প্রকৃত রূপ মিস সুসান। সবার প্রয়োজন শেষেই শুধু তিনি নিজের প্রয়োজন নিয়ে ভাবেন।' বলল ডাঃ মার্গারেট উদাস কণ্ঠে।

'ওঁরা দুর্লভ। কিন্তু এরা আছেন বলেই দুনিয়া আছে।' বলল প্রায় স্বগত কণ্ঠে শিলা সুসান।

কথা তাদের চলছে। হাঁটছেও তারা অবিরাম।

শিলা সুসানের খালা আম্মার বাড়িটা একটা সুন্দর বাংলো। ছবির মত। মানুষ থাকেন মাত্র দু'জন। সুসানের খালাম্মা এবং তার খালাতো বোন। তাও খুব কম সময়ই তারা এ বাড়িতে থাকেন। সুসানের খালু বাহামা সরকারের একজন কূটনৈতিক অফিসার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাহামা দূতাবাসের নিউইয়র্ক শাখায় তিনি কর্মরত। সুসানের খালা, খালাতো বোন সেখানেই অধিকাংশ সময় থাকেন।

সুসানের খালা ও খালাতো বোন মার্কেটিং-এ গেছে। ডাঃ মার্গারেট একাই বাসায়। ডাঃ মার্গারেট কোন সময়ই বাইরে বের হয় না। খালা ও খালাতো বোনকে মার্গারেটের বিপদের কথা বলে তাকে বাইরে বেরুতে দিতে নিষেধ করে গেছে শিলা সুসান। তাই তারাও কখনও তাকে বাইরে নিতে চায় না।

ডাঃ মার্গারেট ড্রইং রুমে বসে গালে হাত দিয়ে আহমদ মুসার কথাই ভাবছিল। ঘটনার পর দু'দিন পার হয়েছে, আহমদ মুসার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। পরদিনই ঘটনাস্থলে শিলা সুসান গিয়েছিল, কিন্তু তার গাড়ির কোন ধ্বংসাবশেষ সে পায়নি। তার মানে আহমদ মুসা প্রতিপক্ষের গাড়ি দু'টি ধ্বংস করে অবশেষে সরে পড়তে পেরেছিল। বুলেটে ঝাঁঝরা হওয়া সুসানের গাড়ি পরে এক জায়গায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু আহমদ মুসার কোন সন্ধান নেই। তিনি ভাল আছেন? অন্য কোথাও আছেন? থাকলে যোগাযোগ করবেন না কেন? না শিলা সুসানের উপর মার্গারেটকে বাড়িতে পৌছানোর দায়িত্ব দিয়ে উনি দায়িত্ব মুক্ত হয়ে গেছেন। কিন্তু এ রকম তিনি নন। কিন্তু তাঁর এ নীরবতার ব্যাখ্যা কি?

কলিংবেলের শব্দ হলো। বাইরে কেউ কলিংবেল বাজাচ্ছে? ওরা মার্কেটিং করে ফিরে এল এত তাড়াতাড়ি? না, তাতো হয় না।

দরজার আইহোল দিয়ে বাইরে তাকিয়ে শিলা সুসানকে দেখতে পেল ডাঃ মার্গারেট।

ডাঃ মার্গারেট তাড়াতাড়ি খুলে দিল দরজা। শিলা সুসান প্রবেশ করল ভেতরে। তার মুখ ম্লান।

সদাহাস্যোজ্জ্বল সুসানকে গম্ভীর ও ম্লান মুখে দেখে উদ্বিগ্ন হলো ডাঃ মার্গারেট। বলল, 'কি ব্যাপার সুসান কিছু ঘটেছে? তোমাকে বিষণœ দেখাচ্ছে।'

শিলা সুসান ম্লান হেসে বলল, 'খালারা নেই ভালই হলো, চলুন কথা আছে।'

বসল দু'জন গিয়ে সোফায় পাশাপাশি। বসেই ডাঃ মার্গারেট বলল, 'প্রোগ্রাম ঠিক আছে? তোমার ওয়াশিংটন আর আমার গ্রান্ড টার্কস-এ যাওয়ার?'

'বিশ্ববিদ্যালয় কাল খুলছে। যেতেই হবে। তবে আপনি দু'একদিন থেকে যেতে পারেন। জর্জ আপনাকে এসে নিয়ে যাবে, সেটাই বরং ভাল।' বলল শিলা সুসান।

'তুমি চলে গেলে আমার থাকার কোন অর্থ নেই।'

'ঠিক আছে, এটা দেখা যাবে। বলে একটু থেমে শিলা সুসান বলল, 'একটা প্রশ্ন আপনি বার বার পাশ কাটিয়ে গেছেন। বলুন, ঐ এশীয় আপনার কে?'

ম্লান হলো ডাঃ মার্গারেটের মুখ। একটু চুপ করে থাকল। তারপর হেসে বলল, 'আমার কেউ নন। আবার মাঝে মাঝে মনে হয়, তিনি আমার সব। কোনটা ঠিক আমি ভেবে দেখিনি। তবে এ কথায় সন্দেহ নেই, আমি তাঁর কেউ নই।'

'তিনি কে, আপনি জানেন?'

চমকে উঠল ডাঃ মার্গারেট। উত্তর দিল না।

'বুঝেছি, তিনি কে আপনি তাহলে জানেন।'

'তুমি জান?'

'আমি জানতাম না, আব্বার কাছে শুনলাম।'

'তোমার আব্বা মানে মিঃ ফার্ডিন্যান্ড?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি নিশ্চয় আমাদের এসব কাহিনী তাঁকে বলনি। তাহলে কেন তিনি বলতে এলেন তাঁর সম্পর্কে তোমাকে?'

সংগে সংগেই উত্তর দিল না সুসান। তাঁর চোখে মুখে দ্বিধাগ্রস্থতা ও বিষণœ ভাব। একটু সময় নিয়ে ধীর কণ্ঠে বলল সুসান, 'আপা তিনি ধরা পড়েছেন।'

'ধরা পড়েছেন?'

বিদ্যুত স্পৃষ্ট হওয়ার মত কেঁপে উঠল ডাঃ মার্গারেট। তারপর হঠাৎ যেন পাথরের মত হয়ে গেল সে।

'হ্যাঁ। ধরা পড়েছেন। আবার কাঁধে গুলী বিদ্ধ হয়েছিলেন তিনি। রক্তক্ষরণে তিনি দুর্বল হয়ে নিশ্চয় পড়েছিলেন। দু'জন পথচারী হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঐ হাসপাতালে হোয়াইট ঈগল-এর আহত কয়েকজনের চিকিৎসা হচ্ছিল। আহমদ মুসাকে দেখে তারা চিনতে পারে। খবর পেয়ে আব্বা ছুটে যান এবং তাকে আটক করে নিয়ে আসেন।'

'কোথায় আছেন তিনি?' ক্ষীণ কণ্ঠে বলল ডাঃ মার্গারেট।

'সেটা আমি অনুসন্ধান করেছি। খবরটা আব্বার কাছ থেকে জানার পরেই হোয়াইট ঈগল-এর কলম্বাস কমপ্লেক্সের বন্দীখানা এবং ককবার্ন দ্বীপের মূল বন্দীখানায় সন্ধান করি গোপনে। তাঁকে এসব বন্দী খানায় রাখা হয়নি। পরে আব্বাকে জিজ্ঞেস করেই জানতে পারি, তাঁকে আমেরিকায় হোয়াইট ঈগল-এর হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'হোয়াইট ঈগল-এর হেডকোয়ার্টার কোথায়?'

'হয়তো ওয়াশিংটনে। আমি ঠিক জানি না। তবে জেনে নেব।'

বলে একটু থামল শিলা সুসান। তারপর শুকনো কণ্ঠে বলল, 'ভয়াবহ সব কথা শুনলাম আব্বার কাছে। তিনি জানালেন, দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান মানুষ এখন আহমদ মুসা। তাকে যদি হোয়াইট ঈগল ক্লু-ক্ল্যাক্স-ক্ল্যান-এর হাতে তুলে দেয়, তাহলে তারা কয়েক বিলিয়ন ডলার দেয়া হবে বলে তাদের নেতা ফেজাসিস জানিয়েছেন। আবার 'ডব্লিউ আর এফ' নামের একটি বামপন্থী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনও নাকি তাঁকে এর চেয়ে বেশি মূল্যে কিনতে চাচ্ছে।'

আনমনা হয়ে পড়েছিল ডাঃ মার্গারেট। শিলা সুসান-এর কোন কথাই ডাঃ মার্গারেটের কানে যাচ্ছিল না।

এটা লক্ষ্য করে সুসান বলল, 'কি ভাবছেন আপা?'

'ভাবছি, আমার দুর্ভাগ্যের কথা। আমাকে উদ্ধার করতে আসার ফলেই এতবড় সর্বনাশ ঘটে গেছে। আমার কি মূল্য? আমার মত শত শত মার্গারেট মারা গেলে দুনিয়ার কারো কোন ক্ষতি হতো না। কিন্তু তিনি না থাকলে পৃথিবীর সারা দিগন্ত জুড়ে যে অশ্রু ঝরবে, রক্ত ঝরবে!'

'আপনি জানেন আপা, ফার্ডিন্যান্ড আমার আব্বা, কিন্তু হোয়াইট ঈগল-এর রাজনীতি আমার ভাল লাগে না। আহমদ মুসা বাহামায় থাকলে তাকে উদ্ধার করার জন্যে আমি সব কিছু করতাম। আমেরিকায় কিছু করতে পারলে করব। আহমদ মুসার মত এমন মানুষ আমি দেখিনি। জানেন আরেকটা মজার ঘটনা ঘটেছে। আমার গাড়ি উদ্ধারের পর গাড়ির ব্লু বুকের মধ্যে দু'হাজার আমেরিকান ডলার পাওয়া গেছে। টাকার সাথে একটা স্লিপে লেখা, 'গাড়ির ক্ষতি হওয়ার জন্যে দুঃখিত। আমার কাছে যা ছিল গাড়ি রিপিয়ারের জন্যে রেখে দিলাম।'

'টাকা পাওয়ার পর আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। আব্বাকে বলেছিলাম, এই ধরনের লোককে কষ্ট দেয়া ঈশ্বর অবশ্যই পছন্দ করবেন না।'

আব্বা বলেছিলেন, 'সে কেমন মানুষ সেটা আমাদের দেখার বিষয় নয়, সে কি করেছে, করছে সেটাই বিবেচ্য। তাকে সহস্রবার হত্যা করলেও আমাদের ক্ষতিপূরণ হবে না। সেই জন্যে হত্যা নয়, তাকে আমরা বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের কয়েক বছরের বাজেটের টাকা এর থেকে আমরা পেয়ে যাব।' থামল সুসান।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডাঃ মার্গারেট। বলল, 'সুসান, জর্জকে টেলিফোন করতে চাই।'

ডাঃ মার্গারেট আহমদ মুসার খবর জর্জকে জানালে জর্জ ও জেনিফার দু'জনেই কেঁদে ফেলে। তারা টেলিফোনে আর কথা বলতেই পারেনি।

কয়েক মিনিট পরেই টেলিফোন এল জর্জের। জর্জ এবং জেনিফার দু'জনেই জানাল, তারা আমেরিকা যেতে চায়।

টেলিফোনে কথা বলার পর ডঃ মার্গারেট শিলা সুসানের সাথে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করল। বলল, 'আমিও ওদের সাথে আমেরিকা যেতে চাই।'

শিলা সুসান বলল, 'যাওয়ার এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসংগত। তবে গেলেই কোন লাভ হবে তা নয়। হোয়াইট ঈগলকে আমি জানি। আপনাদেরকে ওরা পেলে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। আহমদ মুসাকে ওরা বাঁচিয়ে রেখেছে টাকার লোভে, কিন্তু আপনাদেরকে এক মুহূর্তও বাঁচতে দেবে না। সুতরাং বিচার বিবেচনা না করে আপনারা বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়লে কোন লাভ হবে না। আমাকে আপনারা বিশ্বাস করুন, জে.জি ফার্ডিন্যান্ড আমার আব্বা, কিন্তু আব্বার অন্যায়ের ভার লাঘবের জন্যেই আমি আহমদ মুসাকে সাহায্য করব। কিভাবে করব আমি জানি না। যদি জানতে পারি, আপনাদের জানাব। ততদিন আপনাদের অপেক্ষা করা উচিত।'

'তাহলে জর্জের সাথে আমি আলোচনা করি, ফিরে যাই গ্রান্ড টার্কস-এ। আমরা তোমার অপেক্ষা করব, যদি অপেক্ষা করার জন্যে বেঁচে থাকি।'

'এ কথা বলছেন কেন? কেন বেঁচে থাকবেন না?'

'আহমদ মুসা আমাদের জন্যে বাঁচার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি এখন নেই, মাথার উপর আমাদের ঢালও নেই।' ভারী কণ্ঠ মার্গারেটের।

শিলা সুসান একটু চুপ থাকল। তারপর বলল, 'কিন্তু যতটুকু জানি, ক্যারিবিয়ান দ্বীপাঞ্চল, বিশেষ করে টার্কস দ্বীপপুঞ্জের বিপদ কেটে গেছে। জাতিসংঘ ও বিশ্বের মানবাধিকার সংস্থাগুলো অনুসন্ধান ও চাপের ফলে বৃটিশ সরকার সাংঘাতিক তৎপর হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণাংগ তথা মুসলমানদের সামান্য অভিযোগও আজ সংবাদ মাধ্যমে চলে যাচ্ছে এবং বৃটিশ সরকার এবং ক্যারিবিয়ান সরকারগুলো তার প্রতিকারে দ্রুত এগিয়ে আসছে। এই পরিস্থিতিতে হোয়াইট ঈগল ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে তার সকল কার্যক্রম স্থগিত করেছে। তারা বিব্রত হয়ে পড়েছে যে, ভিন্ন কোন কারণে ভিন্ন কারও দ্বারা একজন মুসলমান বা কৃষ্ণাংগ মারা গেলে দায়ী করা হচ্ছে হোয়াইট ঈগলকে। টার্কস দ্বীপপুঞ্জ সহ ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের পরিস্থিতি ভাল হোক এটা হোয়াইট ঈগলও চাচ্ছে। সুতরাং যে ভয় করছেন সে ভয়ের কোন কারণ নেই। আহমদ মুসা সেখানে নেই বটে কিন্তু যা তিনি করেছেন তা ফসল দিয়ে চলবে বহু বছর।'

'কিন্তু ওদের সমস্ত রাগ আজ গিয়ে পড়েছে আহমদ মুসার উপর এবং তিনি ওদের হাতে বন্দী।' কান্নায় ভারী হয়ে উঠল ডাঃ মার্গারেটের কণ্ঠ।

শিলা সুসানের মুখও মলিন হয়ে উঠেছে। তারও চোখে মুখে বেদনার চিহ্ন। ধীরে ধীরে বলল সে, ‘এটা ট্রাজেডি এবং সকলের জন্যে। তিনি মুক্ত হোন চাই। কিন্তু কিভাবে আপনি জানেন না, আমিও জানি না।’ ভারী কণ্ঠস্বর শিলা সুসানের।

ডাঃ মার্গারেটের দু’চোখ থেকে দু’ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল তার দুগন্ড দিয়ে।

সকালে নাস্তার পর শিলা সুসান তার হল ফ্ল্যাটের ষ্ট্যাডি রুমের ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে আহমদ মুসার ব্যাপারটা নিয়ে আকাশ-পাতল চিন্তা করছিল। আমেরিকান হোয়াইট ঈগল-এর হেড কোয়ার্টার কোথায়? হোয়াইট ঈগল-এর প্রধঅন গোল্ড ওয়াটারের সাথে তার পরিচয় আছে। কিন্তু বিনা কারণে তার কাছে যাওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনি তার কাছ থেকে হেড কোয়ার্টারের অবস্থান সম্পর্কে কিছু জানাও অসম্ভব। তাহলে কি করবে সে? কোন পথে এগুবে?

এ সময় কলিংবেল বেজে উঠল।

ভাবনায় ছেদ পড়ল।

উঠে দাঁড়াল সুসান। হোষ্টেস মার্কেটিং-এ গেছে। তাকেই খুলে দিতে হবে দরজা।

জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আবাসিক হল এলাকার বিশেষ হল-ফ্ল্যাট এগুলো। এ হল-ফ্ল্যাটগুলোর প্রত্যেকটিতে একটি বেড রুম, একটি ষ্ট্যাডি, একটি ড্রইং, একটি কিচেন ও টয়লেট রয়েছে। এ ফ্ল্যাটগুলো সাধারণ হল-কক্ষের তুলনায় অনেক ব্যয়বহুল। উচ্চবিত্তরা যাদের উড়াবার মত টাকা রয়েছে তাদের ছেলেমেয়েরা এসব ফ্ল্যাট নেয়।

শিলা সুসানের ফ্ল্যাটটিও এ ধরনেরই একটা ফ্ল্যাট। রান্না-বান্না ও ঘর-দোরের তত্ত্বাবধানের জন্যে একজন হোষ্টেস রয়েছে। মেয়েটিকে সানসালভাদর থেকে আনা হয়েছে।

দরজা খুলে দিতেই সহপাঠিনী জিনা ক্রিষ্টোফার ঘরে প্রবেশ করে জড়িয়ে ধরলো সুসানকে। বলল, ‘কোন খোঁজ নেই, এত বড় ছুটিটা বাড়িতে কাটিয়ে এলি?’

‘কেন, তুই কবে এসেছিস? আমি কাল এসেছি।’

‘ছুটির অর্ধেকটা থাকতেই চলে এসেছি।’

‘বিশ্ববিদ্যালয়টা আমার দেশে হলে আমিও নিশ্চয় তাই করতাম।’

‘এ কথা ঠিক। কিন্তু আবার এটাও ঠিক যে, বাইরের অনেকে ছুটিতে দেশেই যায়নি।’

‘ঠিক আছে। বল এবার এদিকের কথা। কেমন ছিলি?’

‘ভাল। বেশ আনন্দেই কেটেছে সময়। কিন্তু শেষ রক্ষা বোধ হয় হলো না।’

‘কেমন?’

‘তুমি জান, বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে একটা নাটক অনুষ্ঠানের কথা ছিল। সে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরাই যেহেতু নাটক করবে, তাই ছাত্র-ছাত্রীদের কারও লেখা নাটক বেছে নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। বেছে নেয়া হয়েছে মাষ্টার্স শেষ বর্ষের ছাত্রী মেরী রোজ আলেকজান্ডারের নাটক ‘দি নেশন’কে। রিহার্সেলের আয়োজন সব শেষ। শেষ মুহূর্তে গন্ডগোল বাধিয়েছে মেরী রোজ।’

‘মেরী রোজ গন্ডগোল বাধিয়েছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘কি গন্ডগোল?’

‘তার অনুমতি নেয়া হয়নি, তাই আপত্তি তুলেছে তার লেখা নাটকের অভিনয়ে।’

‘যেখানে খুশী হবার কথা সেখানে আপত্তি? কিন্তু মেরী রোজ তো এমন নয়। তার কাছ থেকে কোন অবিবেচক কথা আসতে পারে না।’

‘আসল ব্যাপার হলো, নাটকে রেডইন্ডিয়ান ছাত্রের একটা চরিত্র রয়েছে। তাকে এ্যান্টি নেশন, এ্যান্টি সিভিলাইজেশন এবং সংকীর্ণ দৃষ্টি কম্যুনাল হিসেবে দেখানো হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, মেরী রোজ এই চরিত্রকে আর এভাবে দেখতে চায় না। কিন্তু এ কথা সে সরাসরি বলছেও না।’

জিনা ক্রিষ্টোফারের এ কথা শোনার সাথে সাথে শিলা সুসানের চোখের সামনে একটা মুখ ভেসে উঠল। মুখটি রেড ইন্ডিয়ান ছাত্র ‘ঈগল সান ওয়াকার’-এর। আকস্মিকভাবেই হৃদয়ের কোথঅও যেন একটা আঘাত লাগল সুসানের। একটা ব্যথা যেন চিন চিন করে উঠল মন জুড়ে। সুসানের মত মেরী রোজও সান

ওয়াকারকে নিয়ে ভাবছে না তো? পরক্ষণেই আবার ভাবল, ঈগল সান ওয়াকার ও মেরী রোজ আলেকজান্ডার দু'জনেই অসাধারণ ছাত্র। কিন্তু শুরু থেকেই তো মেরী রোজ সান ওয়াকারকে কিছুটা বৈরী দৃষ্টিতে দেখে আসছে! এসব চিন্তাকে চাপা দিয়ে শিলা সুসান বলল, 'যে কথা মেরী রোজ নিজে বলছে না, সেটা তুই বলছিস কি করে?'

'সবাই বলছে।'

'কিন্তু কারণ কি?'

'কিছু একটা ঘটেছে। সেদিন বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে জর্জ ওয়াশিংটন দিবসের নাচ অনুষ্ঠানে সান ওয়াকারকে ঢুকতে দেয়া না হলে মেরী রোজ আলেকজান্ডার বেরিয়ে যায়।'

চমকে উঠল শিলা সুসান। তার মুখ মলিন হয়ে গেল। কিন্তু সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'এর দ্বারা কি বলতে চাচ্ছিস?'

'সবাই বলছে সান ওয়াকারের সাথে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠার কারণেই মেরী রোজ তার নিজের লেখা নাটক সম্পর্কেও আজ ভিন্ন মত পোষণ করছে।'

সঙ্গে সঙ্গে কথা বলতে পারলো না শিলা সুসান। হৃদয়কে মুচড়ে দেয়ার মত ব্যথা অনুভব করল সে। সান ওয়াকার এবং মেরী রোজ দু'জনেই শিলা সুসানের ক্লাসমেট। মেয়ে বান্ধবীদের মধ্যে মেরী রোজ শিলা সুসানের সবেেচয় ঘনিষ্ঠ। আর ছেলেদের মধ্যে সান ওয়াকারকে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ চোখে দেখে সুসান। সান ওয়াকারকে ভাল লাগে তার। বর্ণ বৈষম্যকে কোন সময় আমল দেয় না বলেই শিলা সুসান সান ওয়াকারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছে। মনের অজান্তেই স্বপ্ন দেখেছে তাকে নিয়ে। কিন্তু সান ওয়াকার কি ভাবে, আদৌ ভাবে কিনা তা জানতে চেষ্টা করেনি সুসান কখনই। মেরী রোজ তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ হওয়ার পরেও মেরী রোজ ও সান ওয়াকারের ঘনিষ্ঠতা বিষয়ক কিছুই তো সে দেখেনি! আজ আকস্মিক এ সংবাদে শিলা সুসান সত্যিই কষ্টবোধ করছে। তবু তাদের সম্পর্কের বিষয়টা অস্বীকার করার জন্যেই বলল, 'মেরী রোজ-এর বিরুদ্ধে এই অভিযোগের মূলে ঐটুকু একটা ঘটনা ছাড়া আসলেই কোন সত্য আছে?'

‘মেরী রোজ খুব চাপা মেয়ে। তার ব্যক্তি জীবন সম্পর্কে জানা খুব মুষ্কিল। তবু দু’একটা এমন ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়েছে, তা ঐ অভিযোগ প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট। মনে আছে তোর, গত পিকনিকে একটা নাশতার প্যাকেট কম পড়েছিল। সান ওয়াকার সবশেষে ছিল বলে সে নাশতা পায়নি। কেউ কিছু বলার আগে সান ওয়াকার হেসে বলেছিল, তার ক্ষুধা নেই, তাছাড়া এ সময় রেডইন্ডিয়ানরা নাশ্তা খায় না। পরে দেখা গেছে মেরী রোজ নাশ্তা খায়নি এই প্রতিবাদে যে, রেডইন্ডিয়ান বলে তাকে অপমান করার জন্যেই ইচ্ছা করে তার নাশতা কম ফেলানো হয়েছে।’

চমকে উঠলো শিলা সুসান। এ ঘটনা সেও জানে। কিন্তু এ ঘটনাকে তখন তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ হিসেবেই দেখেছিল। কিন্তু আজ জিনা ক্রিষ্টোফার ঘটনাটাকে ভিন্ন দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করায় একেই সত্য বলে তার মনে হচ্ছে। মন আরও দূর্বল হয়ে পড়ল শিলা সুসানের। তবু বলল, ‘কিন্তু জিনা সান ওয়াকারকে অপমান ও ছোট করার জন্যে মেরী রোজ যা করেছে, সেটা দেখছিস না?’

‘সেটা অতীতের কথা সুসান। দুই প্রতিভার মধ্যে দ্বন্দ থাকে। মনে হয় মেরী রোজ প্রথম দিকে সান ওয়াকারকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবেই ছোট করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সবাই যখন রেড ইন্ডিয়ান হওয়ার কারণে সান ওয়াকারকে নানাভাবে অপমান ও ছোট করতে লাগল, তখন থেকেই মেরী রোজ সান ওয়াকারের পক্ষ নিতে শুরু করেছে।’

জিনা ক্রিষ্টোফারের কথার জবাবে শিলা সুসান কোন যুক্তি দাঁড় করাবার আর শক্তি পেল না। কোন কিছু হারাবার মত এক ধরনের বেদনা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

জিনা ক্রিষ্টোফারই আবার বলল, ‘যাই বল সুসান, মেরী রোজ ভুল করছে। সবাই একমত, নাটক মঞ্চস্থ হবেই। মেরী রোজ জেদ করলে তার ক্ষতি হবে, বেশি ক্ষতি হবে সান ওয়াকারের। এমনিতেই সান ওয়াকারের শত্রু সৃষ্টি হয়েছে প্রচুর। রেডইন্ডিয়ানদের মধ্যে এত বড় বিজ্ঞান প্রতিভা জন্মাক অনেকেই

তা চাচ্ছে না। তার উপর যদি মেরী রোজও সান ওয়াকারের সম্পর্কের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাহলে সান ওয়াকারের বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধ বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।'

মনে মনে কেঁপে উঠল শিলা সুসান। জিনার কথার প্রতিটি অক্ষর যে সত্য, সুসানের চেয়ে বেশি তা আর কে জানে? বলল সে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে, 'মেরী রোজ কি সত্যিই ঐ রকম জেদ করছে?'

'করছে মানে? মেরী রোজ এমনকি একথা পর্যন্ত বলেছে, যদি নাটকের রিহার্সেল বন্ধ না হয়, যদি তার নাটক মঞ্চস্থই করতে চায়, তাহলে সে আদালতের আশ্রয় নেবে।'

'ঠিকই তো আদালতের আশ্রয় সে নিতে পারে। কি করার থাকবে তখন?'

'কিন্তু তার আগেই অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে। ছাত্ররা একা নয় সুসান, ছাত্রদের বুদ্ধি দেবার লোক জুটেছে প্রচুর।'

'কেমন?'

'আমিও সব জানি না সুসান। কিন্তু চারদিক দেখে-শুনে আন্দাজ করি, ভয়ংকর কিছু ঘটে যাবে।'

একদিকে মনটা সুসানের খারাপ হয়ে গেছে। তার উপর জিনার দেয়া এই ভয়ংকর খবরে উদ্বেগ-আতংকে মনটা পূর্ণ হয়ে উঠল। কোন উত্তর সে দিল না।

জিনাই বলল, 'সুসান, মেরী রোজ তোর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তুই একটু চেষ্টা করে দেখ তাকে বিপজ্জনক পথ থেকে ফিরাতে পারিস কিনা। এটা শুধু আমার কথা নয়, ওরা সবাই আমাকে তোর কাছে পাঠিয়েছে শেষ চেষ্টা করার জন্যে।'

'স্যাররা তো বলতে পারেন মেরী রোজকে।'

'বিজ্ঞান বিভাগের ডীন ও পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যানকে বলা হয়েছিল। তারা বলেছেন, 'ছাত্রদের ব্যাপার ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখ। আমাদেরকে কোন পক্ষ হতে বলো না।'

'একটু ভাবল শিলা সুসান। কি বলবে সে মেরী রোজকে? মেরী রোজ যা ভাবছে, সেটা সুসানেরও ভাবনা। তবে একটা যুক্তি আছে, বিপদ থেকে বাঁচাতে হবে মেরী রোজ ও সান ওয়াকার দু'জনকেই।

সান ওয়াকারের কথা মনে হতেই মনটা তার বেদনায় টন টন করে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবল, সান ওয়াকারকে সে জয় করতে পারেনি। মেরী রোজ যদি তাকে জয় করে থাকে, তাহলে তাদের পথে তার দাঁড়ানো ঠিক নয়।

মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠল সুসানের। বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

জিনা চমকে উঠল। বলল, 'তোর কি হলো সুসান?'

সুসান নিজেকে সামলে নিল।

মুখে হাসি টানার চেষ্টা করে বলল, 'ঠিক আছে, আমি তাকে বলে দেখব। কিন্তু এ বর্ণবাদ আমারও ভাল লাগে না জিনা।'

'বর্ণবাদ কোথায় পেলি? এটা সত্য ও স্বচ্ছতার ব্যাপার। কোন বিশেষ সম্পর্ক সত্য প্রকাশে বাধা দেবে, তা হওয়া ঠিক নয়।'

'সত্য বলছিস কাকে জিনা?'

'যা মেরী রোজ নিজে লিখেছে।'

'কেউ কিছু লিখলেই তা সত্য হয়ে যায় না। মেরী রোজ এখন বলতে পারে সে এক সময় যা লিখেছিল, তা সত্য নয়।'

জিনা হাসল। বলল, 'একজন রেডইন্ডিয়ানের সাথে তার অবৈধ সম্পর্ক হবার পর তার এ বক্তব্য এখন আর গ্রহণযোগ্য নয়।'

'সম্পর্কটাকে অবৈধ বলছিস কেন?'

'আমি বলছি না সবাই বলছে। অবৈধ বলা হচ্ছে কারণ রেডইন্ডিয়ানের ঘরে শ্বেতাংগ তরুণী যাবে তা আজকের সমাজ স্বীকার করবে না।'

'কেন বিয়ে, প্রেম এসব তো পার্সোন রাইট-এর ব্যাপার।'

'কোন পার্সোনাল সিদ্ধান্ত সমাজ স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলে সে পার্সোনাল রাইট সমাজ মানতে পারে না।'

'তোর এ কথা কিন্তু মার্কিন আইনের কথা নয়।'

'আইন বড়, কিন্তু সমাজ তার চেয়ে ছোট নয়। বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতিতে।'

'বর্তমান পরিস্থিতি কি?'

'আজ পশ্চিমী স্বার্থ, শ্বেতাংগ স্বার্থ এবং দেশের স্বার্থ এক।'

'একেই তো বর্ণবাদ বলেছিলাম জিনা।'

'বলতে পারিস। কিন্তু আসলে এটা জাতি প্রেম।'

হাসল শিলা সুসান। বলল, 'তুই বর্ণবাদী সংস্থা 'হোয়াইট ঈগল' এর মত কথা বলছিস।'

চমকে উঠল জিনা। বলল, 'হোয়াইট ঈগল'কে তুই জিনিস?'

শিলা সুসান বিষয়টাকে চেপে গিয়ে বলল, 'শুনেছি কিছু কিছু। তুই জানিস নাকি?'

'তোর ধারণা কি এদের সম্পর্কে?'

'যতটুকু শুনেছি তাতে ভাল ধারণা হয়নি। বর্ণবাদী সংগঠন ওটা।'

'ভাল বলার দরকার নেই। কিন্তু এভাবে খারাপ বলিস না। ঝামেলা বাড়িয়ে কি লাভ?'

'ঝামেলা বাড়বে কেন?'

'পড়া শুনার বাইরে তো কোন খবর রাখিস না। ভেতরে ভেতরে সমাজটা পাল্টে যাচ্ছে। হোয়াইট ঈগল আজ এক পরিবর্তনের প্রতীক। তাকে ভাল বলতে না পারিস, খারাপ বলার প্রয়োজন নেই।'

'খারাপ হলে খারাপ বলবো না কেন?'

'সান ওয়াকার ও মেরী রোজ যে বিপদে পড়েছে, সে ধরনের কোন বিপদ আনিস না। কথা কম বলা ভাল।'

'ওদের বিপদের সাথে কি হোয়াইট ঈগল জড়িত আছে?'

'আজ আর কোন কথা নয়।' বলে জিনা ক্রিষ্টোফার উঠে দাঁড়াল। বলল, 'তুই এদিকটা একটু দেখ।'

বেরিয়ে গেল জিনা ক্রিষ্টোফার।

জিনা জবাব না দিলেও শিলা সুসান বুঝল, সান ওয়াকার ও মেরী রোজকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট পরিস্থিতির সাথে হোয়াইট ঈগল জড়িত আছে। জিনা ক্রিষ্টোফারসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ষ্টুডেন্ট বডিটা কি হোয়াইট ঈগল এর প্রভাবাধীনে চলে গেছে?

এই অবগতির বিষয়টা শিলা সুসানকে উদ্বিগ্ন করে তুলল। সেই সাথে আনন্দিত হলো এই ভেবে যে, জিনারা যদি হোয়াইট ঈগলের সাথে জড়িত থাকে, তাহলে হোয়াইট ঈগল এর হেডকোয়ার্টারের সন্ধান তার জন্যে সহজ হবে।

কলিংবেল বেজে উঠল আবার। উঠে দরজা খুলে দিল শিলা সুসান। বাজার নিয়ে প্রবেশ করল পরিচারিকা।

শিলা সুসান মেরী রোজ-এর কলিংবেল চাপ দিতে গিয়ে লক্ষ্য করল, দরজা খোলা, ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে।

অবাক হলো শিলা সুসান। ধীরে ধীরে দরজা খুলল সে। প্রবেশ করল যে ঘরে সেটা সুসানের ফ্ল্যাটের মতই ড্রইং রুম।

মেরী রোজ এর এ ফ্ল্যাটটি শিলা সুসানের ফ্ল্যাট যে বিল্ডিং-এ, তার পাশের বিল্ডিং-এ। সব ফ্ল্যাট একই সাইজের, একই ডিজাইনের।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ধনীর দুলালী যে কয়জন রয়েছে, মেরী রোজ রয়েছে তাদের শীর্ষে। মেরী রোজ মার্কিন ফেডারেল কোর্টের চীফ জাষ্টিস জর্জ ওয়ারেন আলেকজান্ডারের একমাত্র মেয়ে। শিলা সুসান ও সান ওয়াকারের মতই পদার্থ বিজ্ঞানের মাষ্টার্স শেষ বর্ষের ছাত্রী মেরী রোজ।

সুসান ড্রইং রুম-এর বাইরের দরজা লক করে সামনে এগুলো।

ড্রইং ও ষ্টাডি রুমের মাঝে কাঁচের স্থানান্তর যোগ্য দেয়াল। দেয়ালটি পর্দায় ঢাকা।

দেয়ালের কিছু অংশ সরানো। পর্দাও টেনে উন্মুক্ত করা।

শিলা সুসান বুঝল, কেউ একজন বাইরে থেকে মেরী রোজ এর কাছে এসেছে।

আস্তে আস্তে এগিয়ে ভেতরে উঁকি দিল সুসান। দেখে চমকে উঠল সে।

ভেতরে মুখ নিচু করে একাই বসে আছে ঈগল সান ওয়াকার।

সান ওয়াকার এখানে?

কোনদিন তো সে মেরী রোজ-এর ফ্ল্যাটে আসেনি।

কোন মেয়ের ফ্ল্যাট কেন বন্ধু-বান্ধবদের কক্ষেও সে যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস, লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী, তার নিজের হল কক্ষ এবং রাস্তা এই হলো তার ঠিকানা।

সান ওয়াকারের মুখ শুকনো দেখল শিলা সুসান।

শিলা সুসানের চোখে সান ওয়াকার অপরূপ চেহারার একটি ছেলে। রেডইন্ডিয়ান, তুর্কি ও চীনা এই তিন অবয়বকে একত্রিত করলে সবটার ভালো নিয়ে চতুর্থ যে চেহারা দাঁড়ায় সে হলো সান ওয়াকার। কালো চুল, নীল চোখ, সোনালী রং এবং তার সাথে শিল্পীর আঁকা নিখুঁত এক মুখাবয়ব।

চেহারার মতই উজ্জ্বল শিক্ষা জীবন তার। ইউরোপীয় বিজ্ঞান পুরস্কার, আমেরিকান কন্টিনেন্টাল বিজ্ঞান পুরস্কার এবং ষ্টুডেন্ট নোবল প্রাইজ পাওয়ার পর সে পৃথিবীর শীর্ষ উদীয়মান বিজ্ঞান প্রতিভায় পরিণত হয়েছে। অবশ্য এই কৃতিত্ব তার জন্যে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্ণবাদীদের ক্রোধ গিয়ে তার উপর আছড়ে পড়েছে। মেরী রোজ এর নাটক এবং মেরী রোজ এর সাথে তার সম্পর্ককে কেন্দ্র করে তাদের সেই ক্রোধ বিস্ফোরনোন্মুখ অবস্থা এসে পৌঁছেছে।

এই সময়ে সান ওয়াকার মেরী রোজ এর ফ্ল্যাটে!

মেরী রোজ মাথায় চিরুণি করতে করতে তার ষ্ট্যাডি রুমে এসে প্রবেশ করল।

গোসল করে এল মেরী রোজ।

একদম ফ্রেশ।

যেন একটা ফুল এই মাত্র পাপড়ীর বাধনে পেরিয়ে নিজেকে মেলে ধরল।

পরনে তার গোলাপী স্কার্টের সাথে সাদা শার্ট।

শিলা সুসান নিজে সুন্দরী, কিন্তু মেরী রোজকে কাছে পেলেই জড়িয়ে ধরে সে বলে ছেলে হলে অবশ্যই তোর প্রেমে পড়তাম। চোখ ফেরানো যায় না এমন একটি সাদা গোলাপ মেরী রোজ।

মেরী রোজ এর একাডেমিক কৃতিত্বও তার মতই অপরূপ। এ পর্যন্ত সকল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে এসেছে। অনার্সেও সে প্রথম হয়েছে।

মেরী রোজ ষ্টাডি রুমে ঢুকতে ঢুকতে বলল, ‘স্যরি সান। তোমাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। স্যরি।’

মেরী রোজকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়েছে সান ওয়াকার।

‘ধন্যবাদ রোজ। অসময়ে বিনা নোটিশে এসে তোমাকে বিপদে ফেলেছি। স্যরি।’ বলল সান ওয়াকার।

সান ওয়াকারের পাশে বসতে বসতে মেরী রোজ বলল, ‘কোন ‘স্যরি’ নয়। তোমাকে ওয়েলকাম সান। তুমি যে আমার ফ্ল্যাটটা চিনতে পেরেছ এ জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।’

‘ঠিক, ধন্যবাদ ঈশ্বরেরই প্রাপ্য। তিনিই তোমার বাসা চেনার পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন।’

‘কি পরিস্থিতি তিনি সৃষ্টি করেছেন?’ গম্ভীর হয়ে উঠেছে মেরী রোজের মুখ।

গম্ভীর হয়ে উঠেছে সান ওয়াকারের মুখও। সঙ্গে সঙ্গে সে উত্তর দিল না মেরী রোজ এর প্রশ্নের।

একটু সময় নিয়ে বলল, ‘সেটা রোজ আমার চেয়ে তুমিই ভাল জান।’

সান ওয়াকারের মুখে নিবদ্ধ ছিল মেরী রোজ এর চোখ।

সান ওয়াকারের কথার পর মুখ নিচু করল রোজ। মুখ নিচু রেখেই সে বলল, ‘আমার নাটক ‘The Nation’-এর মঞ্চায়ন নিয়ে যা ঘটছে, তার কথাই তুমি বলছ?’

‘হ্যাঁ।’

একটু হাসল মেরী রোজ। বলল, ‘কিন্তু এ ব্যাপারটা তোমার পর্যন্ত গেল কি করে? এটা নিয়ে কি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে?’ মেরী রোজের কণ্ঠে উদ্বেগ প্রকাশ পেল। তার চোখে-মুখে চিন্তার একটা ছায়া।

সান ওয়াকার মেরী রোজ এর মুখ থেকে তার চোখ সরিয়ে নিল। সোজা হয়ে বসল। বলল, ‘ক’দিন আগে বিশ্ববিদ্যালয় ষ্টুডেন্টস ইউনিয়নের কালচারাল সেক্রেটারী উইলিয়াম আমার কক্ষে গিয়েছিল। বলেছিল, আমার কারণেই নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিকী অনুষ্ঠানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় নাট্যানুষ্ঠানে বাধা

পড়েছে। তোমার ‘The Nation’ নাটকে রেড ইন্ডিয়ানদের ছোট করে দেখানো হয়েছে। এই কারণেই নাটকটির মঞ্চায়ন যাতে হতে না পারে সে জন্যে আমি তোমাকে প্রভাবিত করেছি। যখন আমি বলি, বিষয়টি নিয়ে কোনদিন তোমার সাথে আমার কোন আলোচনাই হয়নি, তখন সে বলে অত কিছু বুঝি না, তোমার কারণেই আমরা একটা সংকটে পড়েছি। তারপর বলে যে, আমি যেন তোমাকে বলি নাটক মঞ্চায়নে বাধা না দেয়ার জন্যে। বলে সে চলে যায়। গতকাল আমার কক্ষে গিয়ে হাজির বিশ্ববিদ্যালয় ষ্টুডেন্টস ইউনিয়নের সভাপতি ম্যাক আর্থার। গিয়ে সোজাসুজি আমাকে বলে, সান ওয়াকার তুমি এ বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দাও। তুমি ভাল ছাত্র। দুনিয়ার যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তুমি ভর্তি হতে পারবে।’ আমি কিছু বলতে চাইলে সে বাধা দিয়ে বলে, আমি বলতে এসেছি, শুনতে আসিনি। আমরা চাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিকী অনুষ্ঠানের আগেই বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ছ।’ বলে সে চলে যায়।’ থামল সান ওয়াকার।

সান ওয়াকারের দিকে তাকিয়ে এক মনে কথাগুলো শুনছে মেরী রোজ। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। চোখে-মুখে ভীষণ ক্রোধ ও অপমানিত হওয়ার চিহ্ন।

সান ওয়াকার থামার সঙ্গে সঙ্গে সে বলল, ‘ষ্টুডেন্টস ইউনিয়নের এই দু’চার নেতা কি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিক? বিশ্ববিদ্যালয়কে তুমি কিছু জানাওনি?’

‘না রোজ।’

‘কেন?’

‘ঘটনা আর আমি বাড়াতে চাই না।’

‘ওদের ভয় পেয়েছ?’

‘তুমি কি তাই মনে কর?’

‘মনে করি না বলেই প্রশ্ন করছি।’

‘ভয় নয় রোজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবাই একদিকে দাঁড়ালেও সবার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস আমার আছে। কারণ জীবন ছাড়া আমাদের মত রেডইন্ডিয়ানদের আর কিছু হারাবার নেই। কিন্তু আমি চাই রোজ........।’

কথা শেষ করতে পারল না সান ওয়াকার। হঠাৎ যেন কথা আটকে গেল গলায়।

রোজের ভারি দৃষ্টি আছড়ে পড়ে আছে সান ওয়াকারের মুখের উপর। সান ওয়াকার থামতেই বলল, 'বল সান।' ঈষৎ কাঁপছিল মেরী রোজ-এর ফুলের মত দু'টি ঠোট।

সান ওয়াকারের মুখ নিচু।

তারও মুখ লাল হয়ে উঠেছে অবরুদ্ধ এক আবেগের উত্তাপে। বলল, 'তোমার 'The Nation' নাটক মঞ্চায়ন করতে না দেয়ার কারণ যদি আমি হই, তাহলে বলব তুমি তোমার আপত্তি তুলে নাও রোজ। আমি চাই তুমি সকল বিতর্কের উর্ধ্বে থাক। বিশেষ করে বর্ণবাদের জঘন্য রাজনীতি থেকে।'

ঠোঁট দু'টি থর থর করে কেঁপে উঠল মেরী রোজ-এর। তার দু'চোখ ফেঁটে দু'ফোটা অশ্রু নেমে এল। দু'হাতে মুখ ঢাকল মেরী রোজ। কান্না আটকাবার চেষ্টা করতে গিয়ে কান্নায় সে ভেঙে পড়ল।

সোফায় হাতলের উপর মুখ গুজেছে মেরী রোজ।

সান ওয়াকার মেরী রোজ এর কাধে হাত রেখে বলল, 'রোজ একটা নাটকে রেডইন্ডিয়ানদের কয়েকটা গালি বললেই তারা ছোট হয়ে যাবে না, আবার না বললে তারা বড় হয়ে উঠবে না। সুতরাং এটাকে এত বড় করে দেখো না।'

মেরী রোজ সান ওয়াকারের হাতটি টেনে নিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে তাতে মুখ গুজে বলল, 'না সান, এটা বড় করা কিংবা ছোট করার ব্যাপার নয়। নীতির ব্যাপার এটা। যে নাটক আমি পরিত্যাগ করেছি, তা আমি অভিনীত হতে দেব না'।

'কিন্তু রোজ তুমি যা পরিত্যাগ করেছ, অন্যেরা তা পরিত্যাগ নাও করতে পারে। একজন লেখকের লেখা প্রকাশ হবার পর তা জনগণের প্রোপার্টি হয়ে দাঁড়ায়।'

'হ্যাঁ, অন্যেরা তা পরিত্যাগ না করতে পারে, কিন্তু আমার নাটক যখন মঞ্চস্থ হতে যাবে, তখন আমার অনুমতি নিতে হবে।'

সান ওয়াকার তার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে মেরী রোজকে সোজা করে বসিয়ে চোখ মোছার জন্যে টিস্যু তার হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'তোমার কথা ঠিক রোজ। কিন্তু তারা একটা আয়োজন করে ফেলেছে।'

‘এক. তারা আমার অনুমতি নেয়নি। দুই. এ আয়োজনটা তারা করেছে তোমার আমার বিরুদ্ধে নয়, একটা কম্যুনিটির বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবেই। আমি তাদের এ বদনিয়তকে স্বীকৃতি দেব না।’

একটু থামল মেরী রোজ। থেমেই আবার শুরু করল, ‘তার উপর তোমাকে যে হুমকি দিয়েছে, তারপর এটা আর মেনে নেয়া যায় না। মেনে নেয়ার অর্থ হবে সন্ত্রাসের কাছে নতী স্বীকার করা। আমি এটা পারবো না।’

‘তুমি যে নীতির কথা বলছ তা ঠিক আছে। কিন্তু তারা তা স্বীকার করছে না। তারা বলছে অন্য কথা।’

‘তারা তো বলছে যে, তোমার সাথে আমার সম্পর্কের কারণেই এই নাটক মঞ্চায়নে বাধা দিচ্ছি। তাদের এ কথাও কি ঠিক। কাউকে ভালোবাসা আমার পার্সোনাল রাইট এবং তার বিরুদ্ধে আমাকে ব্যবহার করতে না দেয়াও আমার ব্যক্তিগত অধিকার।’

‘রোজ, আমাদের সম্পর্ক কি এ ধরনের শত নাটকের শত কথার উর্ধ্বে নয়? একটা মূল্যহীন, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কেন তুমি বিরাট বিতর্ক ও বৈরিতার মধ্যে জড়িয়ে পড়বে?’

‘আমার বোধ হয় এটা প্রাপ্য সান। ভাল ছাত্রী হবার, অপ্রতিদ্বন্দ্বী হবার অহমিকা নিয়ে আমি তোমার উপর অনেক অবিচার করেছি, সবার সামনে বারবার তোমাকে আমি অপমান করেছি। সবার শেষে তোমাকে নিয়ে নাটকও লিখেছি। এখন আমি তোমাকে ভালবেসে যদি অপমানিত হই, লাঞ্চিত হই, এটা হবে আমার যোগ্য প্রাপ্য। আমি এটা মাথা পেতে গ্রহণ করবো।’ মেরী রোজ কান্না জড়িত ভারি কণ্ঠে কথাগুলো বলল।

কথা শেষ করে দু’চোখে রুমাল চেপে মুখ নিচু করল রোজ।

সান ওয়াকার মেরী রোজ এর দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে তার কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, ‘তুমি অযথা নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ রোজ। তোমার কোন আঘাতই আমার কাছে আঘাত ছিল না, তোমার কোন অপমানই আমার কাছে অপমান মনে হয়নি। আমি জানতাম, মেঘের আড়ালে সূর্য আছে।’ সান ওয়াকারের ঠোঁটে হাসি।

মেরী রোজ তার কাঁধে রাখা সান ওয়াকারের হাত জড়িয়ে ধরে তাতে মুখ গুজে বলল, 'কেন তাহলে তখন তুমি আমার ভুল ভেঙে দাওনি, কেন তুমি আমার পাগলামীকে সহ্য করে গেছ অমন করে? কেন? কেন?'

মেরী রোজ এর অশ্রুতে সান ওয়াকারের হাত ভিজে গেল।

সান ওয়াকার নিজের হাত টেনে নিয়ে মেরী রোজের চোখ মুছে দিয়ে বলল, 'ফুলের গন্ধের জন্যে তাকে প্রস্ফুটিত হবার সুযোগ দেয়া দরকার।'

মেরী রোজ এর রাঙা হয়ে ওঠা মুখে হাসি ফুটে উঠল। সোফার হাতলে রাখা সান ওয়াকারের হাতে একটা কিল দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, ফুল ফোটাবার জন্যে যেমন তোমাকে মূল্য দিতে হয়েছে, তেমনি আমাকেও প্রায়শ্চিত্য করতে দাও।'

'তাহলে এটা তোমার শেষ কথা?'

'অবশ্যই। আমি ঐ সন্ত্রাসীদের কোন কথাই শুনব না। দেখি কি শক্তি আছে তাদের তোমাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের করে দেবার।'

'আমি ওদের ভয় করি না। কিন্তু আমি কোন গন্ডগোল চাই না।'

'আমরা তো গন্ডগোল করছি না, তাদের অন্যায় ও বেআইনী দাবী গন্ডগোলের সৃষ্টি করছে।'

'তাহলে আমি উঠি রোজ।'

'না বস। তোমার প্রথম আগমন। মিষ্টি মুখ না করে তোমাকে ছাড়তে পারি না।'

কাঁচের দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের সব কথাই শিলা সুসান শুনল। তাদের কথা যেখানে এসে শেষ হলো, তাতে কেঁপে উঠল সুসান। তাহলে সান ওয়াকার ও মেরী রোজ সংঘাতে যাচ্ছে ষ্টুডেন্টস ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ তথা হোয়াইট ঈগল এর সাথে। তারা কি জানে হোয়াইট ঈগল কি? কি পরিণতি হতে পারে এর?

ভাবল শিলা সুসান, ওদের এই বিপজ্জনক পথ থেকে ফেরানো দরকার। এই ভাবনার পাশেই হৃদয়ের কোন অন্তরলোক থেকে অভিমান ক্ষুব্ধ একটা কণ্ঠ

ভেসে এল, বঞ্চিত ও পরাজিত হৃদয় নিয়ে কেমন করে তুমি ওদের সামনে যাবে? কেন যাবে? কে তোমার ওরা?

মনটা মুষড়ে পড়ল শিলা সুসানের। কিন্তু আবার ভাবল সে, তার এই অভিমান, তার এই ক্ষোভ কার বিরুদ্ধে? কি দোষ সান ওয়াকারের কি দোষ মেরী রোজ এর? সান ওয়াকারের কাছে সুসান কোনদিনই নিজেকে প্রকাশ করেনি। মেরী রোজ সুসানের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু, কিন্তু তার কাছেও সান ওয়াকার সম্পর্কে তার মনের কথা খুলে বলেনি সুসান। আর সবচেয়ে বড় কথা, আজ সুসান নিজ চোখে সান ও রোজ এর মধ্যকার যে গভীর প্রেম প্রত্যক্ষ করল, তা প্রশংসনীয়। সত্যিই সান ওয়াকারকে রোজ যেভাবে চেয়েছে, সুসান সেভাবে চাইতে পারেনি। সুতরাং সান ও রোজকে সে দোষী করতে পারে কেমন করে?

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল শিলা সুসান। সান ও রোজকে হোয়াইট ঈগলের সাথে সংঘাতে কিছুতেই যেতে দেয়া যাবে না। তাদেরকে ফেরাতে হবে এ পথ থেকে।

তবে আজ এই মুহূর্তে ওদের সাথে দেখা করা এবং এসব বিষয়ে কিছু বলা ঠিক হবে না। ওদের একান্ত অন্তরঙ্গ এই বৈঠকে তার অনুপ্রবেশ বেমানান। সুযোগ করে সান ও রোজকে একত্রিত করে সুসান তাদেরকে এ কথাগুলো বলবে।

সুসান মেরী রোজ এর ড্রইং রুমের দরজা আনলক করে অতিসন্তর্পনে বেরিয়ে এল বাইরে।

৭

সেদিন সকাল আটটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে ঢুকছিল শিলা সুসান। পেছন থেকে জিনা ক্রিষ্টোফারের ডাক শুনে ঘুরে দাঁড়াল সে।

অপেক্ষা করল জিনা ক্রিষ্টোফারের জন্যে।

জিনা ক্রিষ্টোফার কাছাকাছি হয়েই দ্রুত কণ্ঠে বলে উঠল, 'শুনেছিস?'

'কি?'

'সান ওয়াকারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'কি বলছিস তুই? খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না?'

'হ্যাঁ, গতকাল দুপুর থেকে তার কোন সন্ধান নেই। দুপুরে খেতে সে হলে যায় নি। রাতেও হলে ফেরেনি।'

মনটা ধক করে উঠল শিলা সুসানের। হার্টবিট বেড়ে গেল তার উদ্বেগে। তবু সে বলার চেষ্টা করল, তাঁকে খুঁজে না পাওয়ার প্রশ্ন উঠছে কেন? হঠাৎ কোথাও তো সে যেতেও পারে?'

'সে রকম মনে হচ্ছে না। লাইব্রেরীতে যেখানে বসে সে গতকাল দুপুরের আগে পড়ছিল, সেখানে তার নোট ফাইল খোলা অবস্থায় পাওয়া গেছে। তার কলমও খোলা সেখানে ছিল। তার হ্যান্ড ব্যাগটাও ছিল টেবিলে। টয়লেটে কিংবা কারো সাথে কথা বলতে পাশে কোথাও গেলে যেমন থাকে, সে অবস্থায় তার সবকিছু পাওয়া গেছে। এই অবস্থায় তাকে খুঁজে না পাওয়া অস্বাভাবিক।'

উদ্বেগের ছায়া নামল এবার শিলা সুসানের চোখে-মুখে। বলল, 'মেরী রোজ কিছু জানে?'

'মেরী রোজও নাকি কিছু বলতে পারছে না। সে খুব ভেঙে পড়েছে। খুব কাঁদছে। খুব খারাপ লাগছে বলে আমি দেখা করতে যাইনি। লাইব্রেরীতে একটা কাজ সেরে আমি যাব মনে করছি।'

শিলা সুসান তৎক্ষণাৎ নিজের হাতের ফাইলটা জিনাকে দিয়ে বলল, ‘তুই এটা রাখ। আমি মেরী রোজ এর ওখান থেকে একটু ঘুরে আসি।’

বলে জিনার হাতে ফাইলটা গুজে দিয়েই ছুটল সুসান প্রায় পাগলের মত।

শিলা সুসান ফ্ল্যাটেই পেল মেরী রোজকে। সেই তাকে দরজা খুলে দিয়েছিল।

শুকনো, বিধ্বস্ত চেহারা মেরী রোজের।

ঘরে প্রবেশ করেই শিলা সুসান জড়িয়ে ধরল মেরী রোজকে। বলল, ‘এই মাত্র আমি জিনা ক্রিষ্টোফারের কাছে শুনলাম ঘটনাটা। শুনেই ছুটে এসেছি তোর কাছে।’

কেঁদে উঠল মেরী রোজ। বলল, ‘আমি আজ সকালে জানতে পেরেছি। নিশ্চয় বড় কিছু ঘটেছে সুসান। নোট, ব্যাগ, কলম ইত্যাদি ফেলে লাইব্রেরীর বাইরে কোথাও সে যেতে পারে না।’

‘আমিও তাই মনে করি।’

বলে সুসান মেরী রোজকে টেনে এনে বসাল সোফায়। বলল সুসান, ‘পুলিশকে জানানো হয়েছে?’

‘হল কর্তৃপক্ষ পুলিশকে জানিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টও টেলিফোন করেছেন পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে।

শিলা সুসান মেরী রোজ এর একটি হাত নিজের দু’হাতের মুঠোয় নিয়ে বলল, ‘তোর কথা ঠিক রোজ, একটা খুব বড় ঘটনা ঘটেছে।’

চোখ মুছে রোজ বলল, ‘কি ঘটনা সেটা তুই জানিস? ষ্টুডেন্ট ইউনিয়নের নেতারাই কি এটা ঘটিয়েছে?’

‘আমার মনে হয় তারা আছে এবং তার সাথে আরও বড় কোন চক্রান্ত রয়েছে।’

‘কে তারা? সান ওয়াকার লেখাপড়া ছাড়া সক্রিয় কোন রাজনীতিতে ছিল না।’

‘সক্রিয় রাজনীতিতে না থাকলেও রেডইন্ডিয়ানদের জাতীয় রাজনীতি থেকে সে বিচ্ছিন্ন অবশ্যই নয়। এর সাথে রয়েছে তোর সাথে সম্পর্কের ব্যাপার।

আমার মনে হয় তার সবচেয়ে বড় অপরাধ একজন রেডইন্ডিয়ান হয়েও দেশের শীর্ষ বিজ্ঞান প্রতিভা হতে যাচ্ছে।'

'ঠিক বলেছিস। সব মিলিয়েই তার উপর বিপদ এসেছে। এখন কি হবে?' বলে দুহাত দিয়ে কান্না রোধের জন্যে মুখ ঢাকল সে।

শিলা সুসান তাকে কাছে টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'আমি তোর পাশে আছি রোজ। আমি কিছুই না, কিন্তু এই চক্রকে আমি চিনি। সব কথা আজ তোকে আমি বলব না। তবে এটুকু জেনে রাখ, ঈশ্বর সহায় হলে সান ওয়াকারের কিছু হবে না। কিন্তু এই ঘটনা আমেরিকায় বড় ঘটনার জন্ম দেবে।'

'ধন্যবাদ সুসান। তুই যদি চক্রটিকে চিনিস। তাহলে আমরা প্রাইভেট ডিটেকটিভ লাগিয়ে কাজ করতে পারি।'

'এদিকটাও আমি চিন্তা করছি। তবে ভাবছি, প্রাইভেট ডিটেকটিভরা ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস পাবে কিনা? তবে কথা দিচ্ছি কিছু করার একটা সুযোগ আছে। আমি দেখব।'

'ধন্যবাদ সুসান। তোর সাথে কথা বলে আমার শক্তি ফিরে আসছে। সানকে উদ্ধারের জন্যে যা করা দরকার তাই করব।'

থামল রোজ। থেমেই আবার বলল, 'আমেরিকায় বড় ঘটনা ঘটার কথা বললি, সেটা কি?'

'আমেরিকায় ইন্ডিয়ানদের মুভমেন্ট এখন খুবই সংহত। তার সাথে যুক্ত হয়েছে আমেরিকার মুসলিম ও ব্ল্যাকদের শক্তি। হোয়াইট ঈগল-এর বর্ণবাদী আচরণের কারণে এই শক্তি আরও সংহত ও শক্তিশালী হবে। সানকে কিডন্যাপ করার ঘটনা এই সংঘাতকে একটা সিদ্ধান্তকারী দিকে নিয়ে যেতে পারে।'

'হোয়াইট ঈগল' এর নাম শুনেছি। ওরা তো অত্যন্ত শক্তিশালী ও বিপজ্জনক সংস্থা। ওরা কি এসবের সাথে যুক্ত আছে?'

একটু ভাবল সুসান। তারপর বলল, 'দ্বিতীয় কাউকে বলবি না এই শর্তে বলছি, আমার বিশ্বাস ওরাই কিডন্যাপ করেছে সানকে।'

'কি বলছিস তুই?' আর্তনাদ করে উঠল মেরী রোজ এর কণ্ঠ। উদ্বেগ-আতংকে টকটকে লাল হয়ে উঠেছে মেরী রোজ এর চোখ-মুখ।

শিলা সুসান মেরী রোজের পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, 'ভয় করিস না রোজ। ঈশ্বর বড় এবং ঈশ্বরের সাহায্যও বড়।' বলে উঠে দাঁড়াল সুসান।

'এখনি যাবি?' বলল রোজ হতাশ কণ্ঠে।

শিলা সুসান বলল, 'আমাকে অনেক খোঁজ-খবর নিতে হবে রোজ, আমি যাই। ভাবিস না, এটাই আমার এখন প্রধান কাজ।'

বলে সুসান বেরিয়ে এল রোজ এর ঘর থেকে।

ছুটল আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর দিকে। অনেক কথা বলতে হবে তাকে জিনা ক্রিষ্টোফারের সাথে। তার মাধ্যমে পৌছতে হবে হোয়াইট ঈগল'দের কাছে, জানতে হবে হোয়াইট ঈগল এর প্রধান আস্তানার খবর।

যখন জ্ঞান ফিরল আহমদ দেখল সে নরম একটি সুন্দর বিছানায় শুয়ে।

চোখ মেলে দেখল সে তার চারদিক।

ঠিক জেলখানার সেল জাতীয় নয়, তার চেয়ে বেশ বড় ঘর। এখানে আসার আগে আরও দু'জায়গায় সে থেকেছে। সে সব থেকে এ ঘরটা বেশ আলাদা।

বাহামার এক হাসপাতালে প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বন্দী হবার পর এ পর্যন্ত তার তিনবার সংজ্ঞা ফিরেছে। দু'বার ভিন্ন দু'টি সেলে তার সংজ্ঞা ফিরেছে। সে দু'টি সেলই এর চেয়ে অনেক ছোট। তখন হাত পা বাঁধা অবস্থায় মেঝের কার্পেটের উপর তাকে পড়ে থাকতে হয়েছে।

ঐ দু'জায়গাতেই যখনই তার সংজ্ঞা ফিরেছে, তখনি তাকে আবার ইনজেকশন দিয়ে সংজ্ঞাহীন করে ফেলা হয়েছে।

আজ নরম বিছানা এবং গায়ে কম্বল দেখে অবাক হলো আহমদ মুসা। প্রথম অনুভুতির সময়ই তার মন খুশী হয়েছিল, সেকি কোন নিরাপদ আশ্রয়ে? মুক্ত করেছে কি কেউ তাকে কোন প্রকারে?

কিন্তু চারদিকে চাওয়ার পর তার ভুল ভেঙে যায়। বিছানা সুন্দর বটে, কিন্তু ঘরটা নিরেট বন্দীখানা। একটা মাত্র দরজা। জানালা একটিও নেই। অনেক উঁচুতে ছাদ। ঘরটি এয়ারকন্ডিশনড। কিন্তু এয়ারকন্ডিশনের যন্ত্রের কোথাও দেখতে পেল না। ভাবল আহমদ মুসা, গোটা বিল্ডিংটা হয়তো সেন্ট্রালী এয়ারকন্ডিশনড।

ঘরে তার শোবার ষ্টিলের খাট ছাড়া দ্বিতীয় কোন আসবাবপত্র নেই।

ঘরের সাথে এ্যাটাচট একটা টয়লেট আছে। টয়লেটে দরজা নেই। শুয়ে থেকেই আহমদ মুসা দেখতে পাচ্ছে টয়লেটে একটা বেসিন, একটা পানির টেপ এবং প্লাষ্টিকের একটা মগ ছাড়া আর কিছু নেই।

আহমদ মুসা ভাবল, নিশ্চয় এ ঘরের সাথে অডিও ও ভিডিও সংযুক্ত আছে। তার অর্থ আহমদ মুসার প্রতিটি মুভমেন্ট এবং কথাবার্তা মনিটর করা হচ্ছে। এই যে সে সংজ্ঞা ফিরে পেয়েছে, এটাও এতক্ষণে তাদের জানা হয়ে গেছে।

আবার কি তাকে ইনজেকশন দিয়ে সংজ্ঞাহীন করে রাখা হবে? তবে যাই হোক, বর্তমান শত্রু ভদ্রবেশী ভয়ানক কেউ হবে। ভদ্র আয়োজন দেখে তা বুঝা যাচ্ছে।

আহমদ মুসা বুঝতে পারল না কোথায় সে এখন। দু'বার স্থান পরিবর্তন করে সে তৃতীয় স্থানে এসেছে। এ জায়গাটা কোথায়?

বাইরে পায়ের শব্দে তার চিন্তায় ছেদ পড়ল। পায়ের শব্দ দরজার বাইরে এসে স্থির হলো। দরজা খুলবে কি?

কারা ওরা?

আহমদ মুসা উঠে বসল।

সাইমুম সিরিজের পরবর্তী বই

মিসিসিপির তীরে

কৃতজ্ঞতায়ঃ Mahfuzur Rahman